অতিক্রমণ

রিচার্ড ডকিন্স

অনুবাদঃ কাজী মাহবুব হাসান

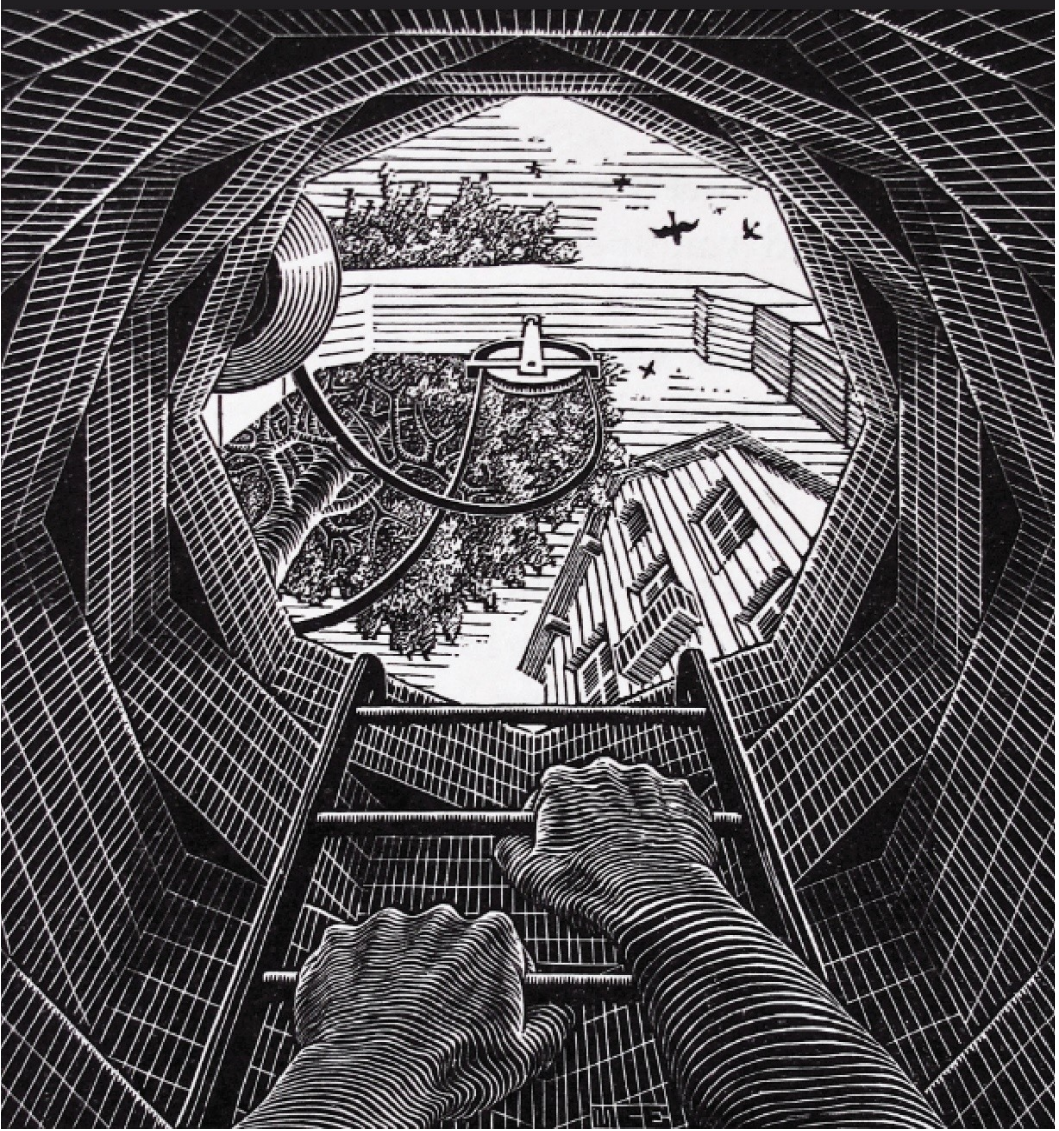

Outgrowing God:

A Beginner's Guide

Richard Dawkins

Translated by Kazi Mahboob Hassan

অতিক্রমণ

রিচার্ড ডকিন্স

অনুবাদ
কাজী মাহবুব হাসান

সুপ্রজ্ঞা অনুবাদ উদ্যোগ, ২০২৪

সুপ্রজ্ঞা
অনুবাদ উদ্যোগ

উৎসর্গ

উইলিয়াম
এবং সব নবীনদের জন্য
নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবার মতো যখন তারা যথেষ্ট বড় হবে

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব: বিদায় ঈশ্বর

০১ এত বেশি ঈশ্বর/দেব-দেবী!
০২ কিন্তু এটি কী সত্য?
০৩ পুরাণ এবং কীভাবে সেগুলো শুরু হয়
০৪ ‘ভালো’ বই?
০৫ ভালো হবার জন্য কী আমাদের ঈশ্বরের দরকার?
০৬ কীভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেই কোনটা ভালো?

দ্বিতীয় পর্ব: বিবর্তন এবং তারপর

০৭ নিশ্চয়ই একজন ডিজাইনার আছেন?
০৮ ধাপে ধাপে অসম্ভাব্যতা অভিমূখে
০৯ স্ফটিক এবং জিগস ধাঁধা
১০ বটম-আপ নাকি টপ-ডাউন?
১১ আমরা কী ধার্মিক হবার জন্য বিবর্তিত হয়েছি? আমরা কী ‘ভালো’ হবার জন্য বিবর্তিত হয়েছি?
১২ বিজ্ঞান থেকে সাহস নেয়া

ছবির অ্যালবাম

প্রথম পর্ব
বিদায় ঈশ্বর

১ এত বেশি ঈশ্বর/দেব-দেবী!

আপনি কী ঈশ্বর (বা দেব-দেবী) বিশ্বাস করেন?

কোন ঈশ্বর (দেব-দেবী)?

ইতিহাসব্যাপী বহু সহস্র ঈশ্বরকে (দেব ও দেবী) উপাসনা করা হয়েছে। বহু-ঈশ্বরবাদীরা (বহু-দেবতাবাদ) (পলিথেইস্ট) একই সাথে বহু সংখ্যক ঈশ্বর/দেবতায় বিশ্বাস করেন ('থিওস' শব্দটি গ্রিক, যার অর্থ 'ঈশ্বর' বা 'দেবতা' আর গ্রিক 'পলি' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বহু')। ভাইকিংদের প্রধান দেবতা ছিলেন ওটান (বা ওডিন)। অন্য ভাইকিং দেবতাও ছিলেন, যেমন বলডর (সৌন্দর্যের দেবতা), থর (বজ্রপাতের দেবতা তার শক্তিশালী হাতুড়ীসহ) এবং তার মেয়ে থ্রড। দেবীরাও ছিলেন, যেমন স্নোটরা (জ্ঞানের দেবী), ফ্রিগ (মাতৃত্বের দেবী) এবং রান (সমুদ্রের দেবী)।

প্রাচীন গ্রিক আর রোমানরাও বহুঈশ্বরবাদী ছিলেন। তাদের দেবতারাও ভাইকিং দেবতাদের মত অনেকটাই মানুষের মতো ছিলেন, যাদের শক্তিশালী মানবিক আবেগ আর লালসা ছিল। বারো জন গ্রিক দেব-দেবীকে প্রায়শই রোমানদের সমরুপ দেব-দেবীদের সাথে জোড় বেধে বর্ণনা করা হয়, যারা একই ধরনের কাজ করেন বলে মনে করা হতো, যেমন, জিউস (রোমান জুপিটার), দেবতাদের রাজা, যার ছিল বজ্রপাত। হেরা, তার স্ত্রী (জুনো), পসাইডন (নেপচুন), সমুদ্রের দেবতা, আফ্রোডাইটি (ভিনাস), ভালোবাসার দেবতা, হারমিস (মার্কারি) দেবতাদের বার্তাবাহক, যিনি ডানাসহ একটি স্যান্ডেল ব্যবহার করে উড়তে পারতেন, ডাওনাইসস (বাক্কাস), মদের দেবতা। প্রধান যে ধর্মগুলো বর্তমানে টিকে আছে, সেগুলোর মধ্যে হিন্দু ধর্মও বহুঈশ্বরবাদী, যেখানে বহু সহস্র দেব-দেবী আছেন।

অগণিত গ্রিক আর রোমানরা ভেবেছিলেন যে, তাদের দেব-দেবীরা বাস্তব, আসলেই যাদের অস্তিত্ব আছে, যাদের উদ্দেশ্য তারা প্রার্থনা করতেন, পশু বিসর্জন দিতেন, সৌভাগ্যের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাতেন, আর খারাপ কিছু হলে তাদের দায়ী করতেন। কিন্তু কীভাবে আমরা জানি যে ঐসব প্রাচীন মানুষদের এই সব ভাবনা সঠিক ছিল না? কেন আজ আর কেউ দেবরাজ জিউসে বিশ্বাস করেন না? নিশ্চিতভাবে আমরা জানতে পারবো না ঠিকই, কিন্তু আমরা অধিকাংশই এমন কিছু বলতে এখন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী: ঐসব প্রাচীন ঈশ্বর, দেব-দেবী সম্পর্কে আমরা হচ্ছি নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক (একজন আস্তিক বা থেইস্ট হচ্ছে এমন কেউ যিনি ঈশ্বর [দেব-দেবীদের[বিশ্বাস করেন এবং একজন নাস্তিক বা অ্যাথেইস্ট, এখানে থেইস্ট শব্দটির আগে যুক্ত হয়েছে একটি

‘এ’, যার অর্থ ‘না’, অর্থাৎ এমন কেউ যিনি ঈশ্বর [বা দেব-দেবীদের] বিশ্বাস করেন না)। একসময় রোমানরা আদি খ্রিস্টানদের ‘নাস্তিক’ বলে সম্বোধন করতেন, কারণ তারা জুপিটার অথবা নেপচুন অথবা তাদের বহু দেব-দেবীদের কাউকে বিশ্বাস করতেন না। ইদানীং আমরা এই শব্দটি ব্যবহার করি সেই মানুষগুলোকে চিহ্নিত করতে যারা আদৌ কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।

আশা করছি, আপনার মতো, আমিও পসাইডন অথবা থর অথবা ভিনাস অথবা কিউপিড অথবা স্নোটরা অথবা মার্স অথবা অডিন অথবা অ্যাপোলোকে বিশ্বাস করি না। আমি প্রাচীন মিশরীয় দেব-দেবী, যেমন, ওসাইরিস, থথ, নুট, আনুবিস অথবা তার ভাই হোরাসের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করি না, যিনি যিশু এবং পৃথিবীব্যাপী আরো বহু সংখ্যক দেবতার মত কুমারী মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন বলে দাবী করা হয়। আমি হাদাদ অথবা এনলিল অথবা আনু অথবা ডাগন অথবা মারডুক অথবা প্রাচীন ব্যবিলনের কোনো দেবতাকে বিশ্বাস করি না।

আমি আনইয়ানউ, মইউ, এনগাই অথবা আফ্রিকার কোনো সূর্য দেবতায় বিশ্বাস করি না। এছাড়াও বিলা, নোউই, ওয়ালা, উরিউপ্রানিলি অথবা কারাউর অথবা অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী গোত্রগুলোর কোনো সুর্য-দেবীদের আমি বিশ্বাস করি না। আমি কেল্টিক বহু দেব-দেবীদের মধ্যে কাউকেই বিশ্বাস করি না, যেমন, এডাইন, আইরিশ সূর্য-দেবী অথবা এলাথা, চন্দ্র দেবতা। আমি চীনের পানির দেবী মাজু অথবা ফিজির হাঙ্গর দেবতা ডাকুওয়াকাকেও অথবা, হিট্টাইটদের সমুদ্র ড্রাগন ইলুয়াঙ্কাকে বিশ্বাস করি না। আমি সেই বহু শত আকাশ দেবতা, নদী দেবতা, সমুদ্র দেবতা, সূর্য দেবতা, নক্ষত্র দেবতা, চন্দ্র দেবতা, আবহাওয়া দেবতা, অগ্নি দেবতা, বন দেবতায় বিশ্বাস করি না.... বিশ্বাস না করার মত অগণিত দেব-দেবী আছেন।

এবং আমি ইয়াওয়েকে বিশ্বাস করি না, যিনি ইহুদীদের দেবতা। তবে খুব সম্ভত আপনি হয়তো তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, যদি আপনি একজন ইহুদী, খ্রিস্টান অথবা মসুলমান হিসাবে প্রতিপালিত হয়ে থাকেন। ইহুদীদের দেবতাকে গ্রহন করে নিয়েছিল খ্রিস্টান এবং (আরবী ‘আল্লাহ’ নামে) মসুলমানরা। খ্রিস্ট ধর্ম আর ইসলাম হচ্ছে প্রাচীন ইহুদী ধর্মের দুটি প্রশাখা। খ্রিস্টান বাইবেলের প্রথমাংশ বিশুদ্ধভাবে ইহুদী ধর্মীয় এর উৎসে, এবং মসুলমানদের পবিত্র বই, কুর’আন, আংশিকভাবে ইহুদী ধর্মশাস্ত্র থেকেই উদ্ভুত। এই তিনটি ধর্ম, ইহুদীবাদ, খ্রিস্ট ধর্ম আর ইসলামকে একসাথে বলা হয় ‘আব্রাহামিক’ ধর্ম, কারণ এই তিনটি ধর্মই সেই পৌরাণিক গোত্রপিতা আব্রাহাম অবধি তাদের উৎস

অনুসরণ করতে পারে, আব্রাহামকে ইহুদী জনগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা পিতা হিসাবেও শ্রদ্ধা করা হয়। পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে আমাদের আবার আব্রাহামের সাথে দেখা হবে।

ঐ তিনটি ধর্মকে একেশ্বরবাদী (মনোথেইস্টিক) ধর্ম বলা হয়, কারণ এই ধর্মগুলোর অনুসারীরা একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন বলে দাবী করে থাকেন। আমি বিবিধ কারণেই 'দাবী করে থাকেন' বলেছি। বর্তমানে সবচেয়ে প্রভাবশালী ঈশ্বর 'ইয়াওয়ে', এরপর থেকে 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করে যাকে আমি প্রকাশ করবো) শুরু করেছিলেন বেশ সীমিত আকারে প্রাচীন ইজরায়েলাইটদের গোত্রীয় ঈশ্বর হিসাবে (ইজরায়েলাইটস- বনি ইজরা'য়েলরা - হচ্ছে প্রাচীন নিকট-প্রাচ্য কানানে - বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইজরায়েল - লৌহ যুগীয় সেমিটিক-ভাষাভাষী একটি গোত্র-গোষ্ঠী)। ইজরায়েলাইটরা বিশ্বাস করতেন 'ইয়াওয়ে' তার 'নির্বাচিত জনগোষ্ঠী' হিসাবে তাদেরকে বিশেষভাবে দেখাশোনা করেন। (এটি একটি ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা - ৩১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্টান্টিন কর্তৃক খ্রিস্ট ধর্মকে রোম সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক ধর্ম হিসাবে গ্রহন ও স্বীকৃতি দেবার পরিণতিতেই এখন পৃথিবীব্যাপী ইয়াওয়েকে উপাসনা করা হয়)। সেই সময় তাদের প্রতিবেশী গোত্রগুলোরও নিজস্ব 'দেবতা' ছিল, যারা বিশ্বাস করতেন সে দেবতারা তাদের নিজদের গোত্রকেও বিশেষভাবে 'সুরক্ষা' করছেন। এবং যদিও ইজরায়েলাইটরা তাদের নিজস্ব গোত্র ঈশ্বর ইয়াওয়েকে উপাসনা করতেন, তারা কিন্তু আবশ্যিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলোর দেবতাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করতেন না, যেমন বা'ল, কানান এলাকার অধিবাসীদের উপাস্য উর্বরতার দেবতা। তারা শুধু ভাবতেন, তাদের ঈশ্বর 'ইয়াওয়ে' হচ্ছেন আরো বেশি শক্তিশালী - এছাড়াও অতিমাত্রায় হিংসুটে (পরে আমরা দেখবো কেন এমন বলছি): 'দুর্দশায় নিমজ্জিত হবে তুমি, যদি তিনি ধরে ফেলেন, তুমি অন্য দেবতাদের সান্নিধ্য কামনা করছো'।

আধুনিক খ্রিস্টান এবং মসুলমানদের একেশ্বরবাদও খানিকটা সংশয়পূর্ণ। যেমন, তারা একটি 'ডেভিল' বা স্যাটান (খ্রিস্টান) অথবা শয়তান (ইসলাম) নামক একটি অশুভ সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এছাড়াও এই অনিষ্টকর সত্তাটির নানা ধরনের নাম আছে, যেমন, বিলজেবাব, ওল্ড নিক, দ্য ইভিল ওয়ান, দ্য আডভেরসারি, বেলিয়াল, লুসিফার ইত্যাদি। তারা এই সত্তাকে 'ঈশ্বর' বা দেবতা বলে সম্বোধন করেন না, কিন্তু তারা তাকে ঈশ্বর-সদৃশ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবেই বিবেচনা করে থাকেন, এবং ধারণা করা হয়, তিনি তার অশুভ অনিষ্টকারী শক্তি নিয়ে ঈশ্বরের শুভ মঙ্গলময় শক্তির বিরুদ্ধে

‘মহাজাগতিক’ একটি যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। সাধারণত ধর্মগুলো প্রায়শই অপেক্ষাকৃত আরো প্রাচীন ধর্মগুলো থেকে বেশ কিছু ধারণা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে। মহাজাগতিক ভালো আর খারাপ - শুভ আর অশুভ শক্তির মধ্যকার মহাজাগতিক একটি যুদ্ধের ধারণাটি সম্ভবত এসেছিল জরাথুস্ত্রবাদ থেকে, যে আদি ধর্মটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পারস্যের নবী জরাথুস্ত্র, যা আব্রাহামিক ধর্মগুলোকে প্রভাবিত করেছিল। জরাথুস্ত্রবাদ দুই ঈশ্বরের ধর্ম, একজন ভালো ঈশ্বর (আহুরা মাজদা), যিনি অশুভ ঈশ্বরের (আংরা মাইনইউ) সাথে যুদ্ধ করছেন। এখনো অল্প কিছু জরাথুস্ত্রবাদী আছেন, বিশেষ করে ভারতে। এটিও আরো একটি ধর্ম, যা আমি বিশ্বাস করি না এবং সম্ভবত আপনিও বিশ্বাস করেন না।

বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসলাম প্রধান দেশগুলোয় নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আনীত অদ্ভুত অভিযোগগুলোর একটি হচ্ছে, তারা নাকি শয়তানকে উপাসনা করেন। নাস্তিকরা অবশ্যই অশুভ কোনো ঈশ্বর বা দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, ঠিক যেভাবে তারা কোনো শুভ ঈশ্বর বা দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তারা অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুর অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না। শুধুমাত্র ধার্মিকরাই শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন।

অন্য কিছু উপায়েও খ্রিস্টধর্ম বহুঈশ্বরবাদের প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। ‘ফাদার, সন অ্যান্ড হলি স্পিরিট’ (পিতা,পুত্র ও পবিত্র আত্মা) - এদের বর্ণনা করা হয়েছে ‘একের মধ্যে তিন আর তিনের মধ্যে এক’ হিসাবে। আসলেই এটি ঠিক কী বোঝাচ্ছে তা নিয়ে বহু শতাব্দীব্যাপী এবং প্রায়শই সহিংসতার সাথে বিতর্ক করা হয়েছে। এটিকে একেশ্বরবাদের মাঝে বহু-ঈশ্বরবাদকে চেপে ঢোকানোর একটি সূত্র মনে হতে পারে। এটিকে ত্রি-ঈশ্বরবাদ (ট্রাই-থেইজম) বলার জন্য আপনি ক্ষমা পেতে পারেন। খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাসে প্রাচ্যের অর্থোডক্স আর পাশ্চাত্যের ক্যাথলিক চার্চের মধ্যকার সবচেয়ে আদি বিভাজনটি মূলত একটি প্রশ্ন সংক্রান্ত বিতর্কের কারণে সূত্রপাত হয়েছিল, আর সেই প্রশ্নটি ছিল: ‘পবিত্র আত্মা’ কী ‘পিতা’ এবং ‘পুত্র’ থেকে ‘উদ্ভুত’ (এর অর্থ যা-ই হোক না কেন), নাকি শুধুমাত্র ‘পিতা’ থেকে ‘উদ্ভুত’? আসলেই সেই সময়ে ধর্মতাত্ত্বিকরা এই সব চিন্তা করেই তাদের সময় কাটাতেন।

এবং এরপর আছেন যিশুর মা, মেরি। রোমান ক্যাথলিকদের জন্য মেরি কার্যত হচ্ছেন একজন দেবী (শুধু নামেই নয়)। তিনি একজন দেবী এটি অবশ্য তারা অস্বীকার করেন, কিন্তু তারপরও তারা তার উদ্দেশ্য এখনো প্রার্থনা করেন। তারা বিশ্বাস করেন, তিনি ‘ইমম্যাকিউলেট কনসেপশন’ বা নিষ্কলঙ্ক গর্ভধারণের

মাধ্যমে জন্মগ্রহন করেছিলেন। আর এই শব্দটির অর্থ কী? বেশ, ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করেন যে, আমরা সবাই 'পাপী' হয়েই জন্ম নেই (অর্থাৎ আজন্ম পাপী) । এমনকি কেবলই জন্ম নেয়া কোনো শিশুও পাপী, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, পাপ করার জন্য সদ্যজাত একটি শিশুটি সময় পেল কীভাবে? যা-ই হোক না কেন, ক্যাথিলকরা বিশ্বাস করেন, মেরি (যিশুর মতো) এর একটি ব্যতিক্রম। আমরা বাকি সবাই প্রথম মানব, স্বর্গোদ্যান থেকে বিতাড়িত আদমের 'পাপ' উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। বাস্তবিকভাবে আদমের আসলেই কখনো অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং তার পক্ষে কোনো পাপ করাও অসম্ভব একটি ব্যাপার। কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা এইসব খুঁটিনাটি সমস্যাগুলো নিয়ে আদৌ বিচলিত হননি। ক্যাথলিকরা আরো বিশ্বাস করেন, মেরি, আমাদের বাকি সবার মত মৃত্যুবরণ করার বদলে সশরীরে উপরে স্বর্গে আরোহন করেছিলেন। তার মাথার উপর ছোটো একটি রাজমুকুট বসিয়ে দিয়ে চিত্রকর্মে তাকে 'স্বর্গের রানি' হিসাবে (কখনো এমনকি 'মহাবিশ্বের রানি'!) উপস্থাপন করা হয়। অন্তত পক্ষে এই সব কিছু দেখে মনে হতে পারে যেন এটি তাকে বহু সহস্র হিন্দু দেবীদের যে-কোনো একজনের মত করে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা (অবশ্য তাদের দেব-দেবীদের সম্বন্ধে হিন্দুরা নিজেরাই বলেন, তারা আসলে একই ঈশ্বরের ভিন্ন সংস্করণ মাত্র)। যদি গ্রিক, রোমান আর ভাইকিংরা বহু-ঈশ্বরবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে রোমান ক্যাথলিকরাও তাই।

রোমান ক্যাথলিকরা আলাদা আলাদাভাবে বেশ কিছু সেইন্টের (সাধু বা সন্ত) উদ্দেশ্যেও প্রার্থনা করে থাকেন: সেই মৃত ব্যক্তিরা যাদেরকে বিশেষভাবে পবিত্র গণ্য করা হয়, এবং একজন পোপ যাদের 'ক্যানোনাইজ' বা সেইন্ট হিসাবে ঘোষণা করেন। পোপ দ্বিতীয় জন পল ৪৮৩ জন নতুন সেইন্ট বা সাধুকে ক্যানোনাইজ করেছিলেন। এবং ফ্রান্সিস, যিনি বর্তমান পোপ, তিনি কমপক্ষে ৮১৩ জনকে খ্রিস্টীয় সেইন্ট হিসাবে একদিনেই ক্যানোনাইজ করেছিলেন। মনে করা হয় এই সব সাধুদের অনেকেরই বিশেষ কিছু দক্ষতা আছে, আর সেকারণে সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো সেইন্টের প্রতি প্রার্থনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়। সেইন্ট অ্যান্ড্রুজ হলেন মাছ বিক্রেতাদের পৃষ্ঠপোষক সাধু, সেইন্ট বার্নওয়ার্ড হচ্ছে স্হপতিদের, সেইন্ড ড্রোগো হচ্ছে কফির দোকান মালিকদের, সেইন্ট গামারুস হচ্ছেন যারা লাম্বারজ্যাক, বা জঙ্গল থেকে গাছ কাটেন, সেটি বহন করেন, করাত দিয়ে চেরাই করেন, সেইন্ট লিডভিনা হচ্ছে যারা আইস-স্কেটিং করেন তাদের পৃষ্ঠপোষক সাধু। আপনি যদি ধৈর্য্যশীল হতে প্রার্থনা করেন, কোনো ক্যাথলিকের কাছ থেকে আপনি সেইন্ট রিটা কাসকিয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনার করার উপদেশ পেতে পারেন। যদি আপনার বিশ্বাস নড়বড়ে

হয়, সেইন্ট জন অব দ্য ক্রসের শরণাপন্ন হতে পারেন। যদি মানসিক দুশ্চিন্তা বা হতাশায় থাকেন তাহলে সেইন্ট ডিস্ফনার কাছে প্রার্থনার করা আপনার জন্যে সবচেয়ে ভালো উপদেশ হতে পারে। ক্যানসারের রোগীরা সেন্ট পেরেগ্রিনের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন। যদি আপনি আপনার চাবি হারিয়ে ফেলেন, সেন্ট অ্যান্থনি হচ্ছে আপনার একমাত্র ভরসা। এছাড়াও ফেরেশতারাও (অ্যাঞ্জেল বা দেবদূত) আছেন, যারা বিভিন্ন পদমর্যাদার স্তর থেকে আসেন, উপরে সেরাফ থেকে নিচে আর্ক-অ্যাঞ্জেল থেকে আপনার ব্যক্তিগত অভিভাবক, গার্ডিয়ান এঞ্জেল অবধি। আবারো, রোমান ক্যাথলিকরা অস্বীকার করবেন, ফেরেশতারা অবশ্যই দেবতা বা উপদেবতা কোনোটাই নন, এবং তারা প্রতিবাদ করবেন যে আসলে তারা এমনকি সেইন্টদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন না, শুধুমাত্র তারা যেন তাদের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে একটু তদ্বির করেন। মসুলমানরা ফেরেশতায় বিশ্বাস করেন, এমনকি দানবদেরও, যাদের তারা 'জিন' নামে সম্বোধন করেন।

মেরি আর সেন্ট আর আর্ক এন্জেলরা কী দেবতা বা উপদেবতা কিংবা এর কোনোটাই নয়। আর আমার মনে হয় তাতে কিছু যায় আসে না। ফেরেশতারা উপ-দেবতা কিনা সেটি নিয়ে তর্ক করা অনেকটাই বরং পরীরা পিক্সিদের মত একই কিনা সেটি নিয়ে ঝগড়া করার মত।

যদিও আপনি সম্ভবত পরী আর পিক্সিদের বিশ্বাস করেন না, কিন্তু খুবই সম্ভাবনা আছে আপনি হয়তো তিনটি আব্রাহামিক ধর্মবিশ্বাসের - ইহুদীবাদ, খ্রিস্টধর্ম অথবা ইসলাম - কোনো একটির মধ্যেই প্রতিপালিত হয়েছেন। বাস্তবিকভাবে আমি নিজেও একজন খ্রিস্টান হিসাবে প্রতিপালিত হয়েছি। আমি খ্রিস্টীয় স্কুলগুলোয় পড়েছি এবং তেরো বছর বয়সে চার্চ অব ইংল্যান্ডে আমার 'কনফার্মেশন' হয়েছে (কনফার্মেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো খ্রিস্টান ব্যক্তি তার ব্যাপ্টিজম বা ধর্ম দীক্ষার সপক্ষে করা প্রতিজ্ঞাগুলো দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেন, খ্রিস্টীয় সমাজে পূর্ণ সদস্য হবার প্রতীক)। আমি চূড়ান্তভাবে খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগ করেছি যখন আমার বয়স পনেরো। কেন আমি এটি পরিত্যাগ করেছি সেই কারণগুলোর একটি ছিল এই রকম: যখন আমার বয়স নয়, ততদিনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যদি ভাইকিং কোনো পিতামাতার ঘরে আমার জন্ম হতো, আমি খুব দৃঢ়ভাবেই ওডিন আর থরকে বিশ্বাস করতাম। যদি প্রাচীন গ্রিসে আমার জন্ম হতো, আমি জিউস আর আফ্রোডাইটির উপাসনা করতাম। আধুনিক সময়ে, যদি পাকিস্তান কিংবা মিশরে আমি জন্মগ্রহন করতাম, তাহলে যিশুকে খ্রিস্টান যাজকদের শেখানো 'ঈশ্বরের পুত্র' ভাবার বদলে শুধু ঈশ্বরের বার্তাবাহক বা নবী হিসাবেই ভাবতাম। যদি ইহুদী পিতামাতার পরিবারে আমার

জন্ম হতো, আমার খ্রিস্টীয় স্কুলগুলোয় শেখানো যিশুকে দীর্ঘ-প্রতিশ্রুত পরিত্রাতা অর্থাৎ 'মেসাইয়া' ভাবার পরিবর্তে আমি এখনো সেই মেসাইয়ার অপেক্ষায় থাকতাম। বিভিন্ন দেশে বেড়ে ওঠা মানুষগুলো তাদের পিতামাতাকে অনুকরণ করেন, এবং তারা তাদের সেই দেশের ঈশ্বর বা দেব-দেবীদের বিশ্বাস করেন। তাদের এই সব বিশ্বাসগুলো পরস্পরবিরোধী, সুতরাং অবশ্যই তারা সবাই সঠিক হতে পারেন না।

যদি সেই বিশ্বাসগুলোর কোনো একটি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে সেটিকে কেন সেই বিশ্বাসটি হতে হবে, যা ঘটনাচক্রে সেই দেশে জন্মগ্রহন করার কারণে আপনি উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছেন? এমন কিছু চিন্তা করতে আপনাকে খুব বেশি শ্লেষাত্মক হতে হবে না: 'আসলেই কী বিষয়টি লক্ষণীয় নয় যে, প্রায় প্রতিটি শিশুই তাদের পিতামাতার ধর্মই অনুসরণ করে, আর ঘটনাচক্রে সেটাই সবসময় সঠিক ধর্ম'! পিতামাতার ধর্ম দিয়ে শিশুদের চিহ্নিত করা অভ্যাসটি আমাকে প্রায়শই খুব উত্ত্যক্ত করে: 'ক্যাথলিক শিশু', 'প্রটেস্টান্ট শিশু', 'মসুলমান শিশু'। শিশুদের বর্ণনা করতে এই ধরনের শব্দগুলো ব্যবহৃত হতে শোনা যেতে পারে, যে শিশুরা এমনকি এখনো কথা বলতেই শেখেনি, ধর্ম সংক্রান্ত কোনো মতামত ধারণ করা তো বহু দূরের ব্যাপার। কোনো শিশুকে 'সমাজতন্ত্রবাদী শিশু' অথবা 'রক্ষণশীল শিশু' হিসাবে বর্ণনা করার মত আমার কাছে এটিকে অদ্ভুতভাবেই অর্থহীন মনে হয় এবং কেউই কখনো এই ধরনের শব্দগুলো উচ্চারণ করেন না। একই ভাবে 'নাস্তিক শিশু' নিয়েও আমাদের কিছু বলা উচিত নয়।

আসুন এবার 'অবিশ্বাসী' ব্যক্তিদের বর্ণনা করা হয় এমন কিছু নাম নিয়ে আলোচনা করা যাক। বহু মানুষই আছেন যারা 'নাস্তিক' (বা নিরীশ্বরবাদী) শব্দটি এড়িয়ে চলতে চান, এমনকি যদিও তারা কোনো নামসহ ঈশ্বর বা দেব-দেবী বিশ্বাস করেন না। কেউ কেউ শুধু বলেন, 'আমি জানি না, আমরা পক্ষ জানা সম্ভব নয়'। এই মানুষগুলো তাদের নিজেদেরকে 'অ্যাগনস্টিক' বা 'অজ্ঞেয়বাদী' বলেন। এই শব্দটি (শব্দটির মূল একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ 'অজ্ঞাত') উদ্ভাবন করেছিলেন টমাস হেনরি হাক্সলি, ডারউইনের এই বন্ধুকে 'ডারউইনস বুলডগ' হিসাবে সম্বোধন করা হতো, কারণ বেশি লাজুক, অথবা ব্যস্ত বা অসুস্থ ডারউইন যা করতে পারেননি জন্মসম্মুখে, তিনি তার পক্ষে সেই লড়াইটি লড়েছিলেন। যারা নিজেদের অজ্ঞেয়বাদী বলেন তারা কেউ কেউ ভাবেন, 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকা এবং না থাকার সমপরিমান সম্ভাবনা আছে। আমার মনে হয় তাদের এই যুক্তিটি খানিকটা দুর্বল, এবং হাক্সলিও আমার সাথে

একমত হতেন। আমরা প্রমাণ করতে পারবো না যে ফেয়ারী (বা পরী) বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, কিন্তু এর মানে এই না যে পরীদের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা আধাআধি অর্থাৎ ৫০:৫০। আরো খানিকটা বেশি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন অজ্ঞেয়বাদীরা বলেন, যদিও তারা নিশ্চিতভাবে জানেন না কিন্তু মনে করেন কোনো ধরনের ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অন্য কিছু অজ্ঞেয়বাদীরা হয়তো বলেন, এটি অসম্ভাবনীয় নয়, তবে আমরা তা জানি না।

এমন মানুষও আছেন যারা নামসহ কোনো ঈশ্বর (দেব-দেবীদের) বিশ্বাস করেন না ঠিকই কিন্তু তারপরও 'কোনো এক ধরনের উচ্চতর শক্তির' অস্তিত্ব নিয়ে তাদের একটি লালসা আছে - একটি 'শুদ্ধ আত্মা', একটি সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তা, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পক ও সৃষ্টিকর্তা, এ ছাড়া তার সম্বন্ধে আর কিছুই আমরা জানি না। তারা হয়তো এমন কিছু বলতে পারেন: 'বেশ, আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি না' - সম্ভবত যার অর্থ 'আব্রাহামিক ঈশ্বর' – 'কিন্তু এছাড়া আর কিছুই সেখানে নেই সেটি আমি বিশ্বাস করতে পারি না। অবশ্যই সেখানে আরো কিছু নিশ্চয়ই আছে, সীমাতিক্রমী কিছু'।

এই সব ব্যক্তিদের কেউ কেউ নিজেদের 'সর্বেশ্বরবাদী' (প্যানথেইস্ট) বলেন। সর্বেশ্বরবাদীরা আসলে কী বিশ্বাস করেন সে বিষয়ে তারা বেশ অস্পষ্ট। তারা এমন কিছু বলে থাকেন, যেমন 'আমার ঈশ্বর হচ্ছে সবকিছু', বা 'আমার ঈশ্বর হচ্ছে প্রকৃতি' অথবা 'আমার ঈশ্বর হচ্ছে এই মহাবিশ্ব' অথবা 'আমার ঈশ্বর হচ্ছে সব কিছুর সেই গভীর রহস্য যা আমাদের বোধগম্য নয়'। মহান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন 'গড' (ঈশ্বর) শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন মূলত আগের বাক্যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থে। সেটি খুব ভিন্ন সেই ঈশ্বর থেকে, যিনি কিনা আপনার প্রার্থনা শোনেন, আপনার গভীরতম অন্তরের সব চিন্তা পড়তে পারেন, এবং আপনার পাপগুলো ক্ষমা করেন (অথবা শাস্তি দেন) - আর এই সব কিছুই আব্রাহামিক ঈশ্বর সাধারণত করে থাকেন বলে দাবী করা হয়। আইনস্টাইন খুবই দৃঢ় ছিলেন তার দাবীতে যে, তিনি কোনো 'ব্যক্তিগত' ঈশ্বরের ধারণায় বিশ্বাস করেন না, যিনি কিনা এসব কোনো কিছু করে থাকেন।

অন্যরা নিজেদের 'ডেইস্ট' বা একাত্মবাদী হিসাবে চিহ্নিত করেন। একাত্মবাদীরা ইতিহাসে অসংখ্য নামধারী দেব-দেবী কিংবা ঈশ্বরদের বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তারা সর্বেশ্বরবাদীদের চেয়ে খানিকটা বেশি নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস করেন। তারা একজন সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন যিনি মহাবিশ্বের সূত্রগুলো আবিষ্কার করেছেন, এবং সময় আর স্থানের সূচনালগ্নে তিনি এ সবকিছু গতিশীল করে তুলেছিলেন, এবং তারপর তিনি এসব কিছু

থেকে নিজেকে অপসারিত করেছেন, পরবর্তীতে আর কিছুই তিনি করেননি: সবকিছুই 'তার' (এটির?) বেধে দেয়া সূত্র মোতাবেক ঘটতে দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতারা, যেমন, টমাস জেফারসন আর জেমস ম্যাডিসন একাত্মবাদী ছিলেন। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, যদি তারা অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিবর্তে চার্লস ডারউইনের পরের কোনো একটি সময়ে জন্মগ্রহন করতেন, তারা সবাই নাস্তিকই হতেন, কিন্তু আমি সেটি প্রমাণ করতে পারবো না।

যখন কেউ বলেন তারা নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী, এমন কিছু তারা কিন্তু বোঝাতে চান না যে, কোনো ঈশ্বর (দেব-দেবীর) অস্তিত্ব যে নেই সেটি তারা প্রমাণ করে দেখাতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে, কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই - এমন কিছু প্রমাণ করা অসম্ভব। কোনো ঈশ্বরের (দেব-দেবীদের) অস্তিত্ব আছে কিনা সেটি আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না, ঠিক যেভাবে আমরা পরী বা পিক্সি বা এলভ বা হবগোবলিন বা লেপরেকন বা পিঙ্ক ইউনিকর্নের যে অস্তিত্ব নেই সেটিও প্রমাণ করতে পারবো না। ঠিক যেভাবে আমরা সান্টা ক্লস অথবা ইস্টার বানি অথবা টুথ ফেয়ারীর যে অস্তিত্ব নেই সেটিও প্রমাণ করতে পারবো না । আপনি সহস্র কোটি জিনিস কল্পনা করতে পারবেন যা কেউ অপ্রমাণ করতে পারবে না। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল এই বিষয়টি বোঝাতে চমৎকার একটি শব্দ আর চিন্তার দৃশ্যকল্প প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি আমি আপনাকে বলি একটি চিনামাটির চায়ের পট সুর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে, আপনি আমার দাবী অপ্রমাণ করতে পারবেন না। কিন্তু কোনো কিছু অপ্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়া সেটির অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্য ভালো কোনো কারণ হতে পারে না। একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে আমদের সবারই আসলে সেই 'চায়ের পট অজ্ঞেয়বাদী' হওয়া উচিত - ব্যবহারিক অর্থে 'চায়ের-পট-অবিশ্বাসী'। আপনি একজন নাস্তিক হতে পারেন সেই ভাবে (কারিগরীভাবে অজ্ঞেয়বাদী) যেমন, আপনি চায়ের-পট-অবিশ্বাসী, পিক্সি-অবিশ্বাসী, ইউনিকর্ন-অবিশ্বাসী, অথবা আপনার-পক্ষে-কল্পনা-করা-সম্ভব-এমন-যে-কোনো-বিষয়ে অবিশ্বাসী।

নিয়মসিদ্ধ অর্থে যদি বলা হয়, আমাদের সবারই ঐসব বহু সহস্র জিনিস যা আমরা কল্পনা করতে পারি, এবং যেগুলো কেউ অপ্রমাণ করতে পারবেন না সেই সব বিষয়ে অজ্ঞেয়বাদী হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা সেগুলো 'বিশ্বাস' করি না। এবং যতক্ষণ না সেগুলো বিশ্বাস করার মত কোনো কারণ কেউ উপস্থাপন করছেন, তেমনকিছু করার প্রচেষ্টা আমাদের সময়ের অপচয় মাত্র। আর এটাই সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি যা আমরা থর আর অ্যাপোলো আর রা আর মারডুক আর মিথরাস আর পর্বতেচুড়াবাসী গ্রেট জুজর ক্ষেত্রে গ্রহন করে নিয়েছি। আমরা কী

আরো খানিকটা অগ্রসর হতে পারি না, আর ইয়াওয়ে বা আল্লাহকে নিয়ে এভাবে ভাবতে পারি না?

আমি বলেছি 'যতক্ষণ না কেউ কারণ দেখাতে পারেন'। বেশ, অনেকেই সেই কারণগুলো উপস্থাপন করেছেন, যেগুলো একজন ঈশ্বর বা কোনো দেব-দেবীদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার কারণ হিসাবে তারা ভেবে থাকেন। অথবা যেগুলো কোনো ধরনের অজ্ঞাতনামা 'উচ্চতর শক্তি' বা সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তাকে বিশ্বাস করার কারণ হতে পারে। সুতরাং সেই সব কারণগুলো পর্যালোচনা, এবং এগুলো সত্যিকারভাবে ভালো কারণ কিনা, আমাদের সেটি প্রথমে যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। এই বইটির পরবর্তী অধ্যায়গুলোয় আমরা সেই কারণগুলো কয়েকটি দেখবো। বিশেষ করে দ্বিতীয় পর্বে, যে অংশটি বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছে।

সে সুবিশাল বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তে আমার আমি যা বলা প্রয়োজন মনে করছি তা হচ্ছে, বিবর্তন একটি সুস্পষ্ট বাস্তব সত্য: আমরা শিম্পাঞ্জিদের জ্ঞাতিভাই, বানরদের থেকে খানিকটা দূরের আত্মীয়, মাছ থেকে আরো অনেক বেশি দূরের আত্মীয়.. ইত্যাদি।

বহু মানুষই তাদের ঈশ্বর (দেব-দেবীদের) বিশ্বাস করেন ধর্মশাস্ত্রের কারণে: বাইবেল, কুর'আন অথবা কোনো পবিত্র বই। এই অধ্যায় হয়তো ইতোমধ্যেই বিশ্বাসের সেই কারণটি নিয়ে সন্দেহ করতে আপনাকে প্রস্তুত করে তুলেছে। বহু বিচিত্র ধরনের ধর্মবিশ্বাস আছে। আপনি কীভাবে জানেন, যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের দ্বারা আপনি প্রতিপালিত হয়েছেন সেটি একমাত্র সত্য আর সঠিক গ্রন্থ? আর যদি বাকি সব ধর্মগ্রন্থগুলো মিথ্যা আর ভুল হয়ে থাকে, তাহলে আপনার ধর্মগ্রন্থটি যে ভুল নয়, আপনার এমন ভাবনার কারণগুলো আসলে কী? পশ্চিমে আপনারা অনেকেই যারা এই বইটি পড়ছেন তারা হয়তো একটি নির্দিষ্ট পবিত্র গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছেন: খ্রিস্টান বাইবেল। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বাইবেল সম্বন্ধে আলোচনা করবো। কারা এটি লিখেছিলেন, আর এটি যা কিছু বলছে সেগুলো সত্য এমন কিছু বিশ্বাস করার জন্য কারো কাছে কী এমন কারণ থাকতে পারে?

২ কিন্তু এটি কী সত্যি?

বাইবেলে আমরা যা কিছু পড়ি তার কতটুকু আসলে সত্য?

ইতিহাসে কোনো কিছু আসলেই ঘটেছিল কিনা সেটি আমরা কীভাবে জানতে পারি? কীভাবে আমরা জানি যে, জুলিয়াস সিজার নামে কারো অস্তিত্ব ছিল? অথবা উইলিয়াম দ্য কংকেরর? তাদের চাক্ষুষ দেখেছে এমন কেউ তো এখন বেঁচে নেই এবং এমনকি চাক্ষুষ সাক্ষীরা খুব বিস্ময়করভাবেই অনির্ভরযোগ্য হতে পারেন, জবানবন্দী সংগ্রহ করছেন এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা আপনাকে সেটি বলতে পারবেন। আমরা জানি যে সিজার এবং উইলিয়াম দুজনেরই একসময় অস্তিত্ব ছিল, কারণ প্রত্নতাত্ত্বিকরা খুব সুস্পষ্ট স্মারক চিহ্নগুলো খুঁজে পেয়েছেন এবং এর কারণ তারা যখন জীবিত ছিলেন সেই সময় লেখা বহু দলিলপত্রে সেই সত্যের সপক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে। কিন্তু যখন কোনো ঘটনা বা ব্যক্তির অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ বা দলিল সেই ঘটনা বা ব্যক্তির অস্তিত্বের কোনো সাক্ষীর মৃত্যুর বহু দশক বা শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পর লেখা হয়েছে, তখন ইতিহাসবিদরা খানিকটা সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন। এই প্রমাণ দুর্বল কারণ মৌখিক বিবরণের মাধ্যমে এটি হস্তান্তরিত হয়েছে, এবং খুব সহজেই যে বিবরণে বিকৃতি প্রবেশ করতে পারে। বিশেষ করে লেখক যদি নিজেই পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে থাকেন। উইনস্টোন চার্চিল বলেছিলেন: 'ইতিহাস আমার প্রতি সদয় হবে, কারণ আমার নিজেরই সেটি লেখার অভিপ্রায় আছে'। আমরা এই অধ্যায়ে দেখবো নিউ টেস্টামেন্টে বর্ণিত যিশুর অধিকাংশ গল্পেরই সমস্যা আছে। আর ওল্ড টেস্টামেন্টের সম্বন্ধে জানতে এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় অবধি অপেক্ষা করতে হবে।

যিশু আরামায়িক ভাষায় কথা বলেতেন, যে ভাষাটি হিব্রু ভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত 'সেমিটিক' একটি ভাষা। নিউ টেস্টামেন্টের বইগুলো মূলত গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছিল, আর ওল্ড টেস্টামেন্টের বইগুলো হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল। বইগুলোর বহু সংখ্যক ইংরেজি অনুবাদের অস্তিত্ব আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতটি হচ্ছে ১৬১১ সালের 'কিং জেমস' সংস্করণটি, এটির এমন নাম হবার কারণ এটি অনুবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন ও অর্থায়ন করেছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস (যিনি স্কটল্যান্ডের রাজ চতুর্থ জেমস)। আমি নিজেও এই কিং জেমস সংস্করণটির অনুবাদ পছন্দ করি কারণ এর ভাষাটি খুব সুন্দর, আর এটি বিস্ময়কর নয় কারণ এর ইংরেজিটি শেক্সপিয়ারের সমসাময়িক ইংরেজি ভাষা। তবে সেই ভাষাটি আধুনিক সময়ের পাঠকদের কাছে সবসময় খুব সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য না হবার কারণে এই বইটিতে আমি খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে একটি আধুনিক অনুবাদ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি - 'দ্য নিউ

ইন্টারন্যাশনাল' সংস্করণ। আর এখান থেকে আমি মূলত উদ্ধৃতিগুলো দেবো, যদি না সুস্পষ্টভাবে অন্য কোনো সূত্র উল্লেখ করি।

সামাজিক অনুষ্ঠানে বিনোদনের জন্য একটি খেলা আছে, যার নাম 'চাইনিজ হুইজপার' (ব্রিটেইনে এটি নামে পরিচিত) অথবা 'টেলিফোন' (যেভাবে আমেরিকায় এটি পরিচিত)। ধরুন আপনি দশ জনকে সারিবদ্ধভাবে দাড় করালেন। প্রথম ব্যক্তি কোনো কিছু - একটি গল্প হতে পারে – দ্বিতীয় একজন ব্যক্তিকে কানে কানে বলবেন। এবার দ্বিতীয় জন সেটি তৃতীয় জনকে বলবেন, তৃতীয় ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তিকে বলবেন এভাবে চলতে থাকবে শেষ ব্যক্তি অবধি। পরিশেষে, যখন গল্পটি দশম ব্যক্তির কাছে আসবে, তিনি যা কিছু শুনেছেন সেটি সবার সামনে পুনরাবৃত্তি করে শোনাবেন। যদি না মূল কাহিনীটি অস্বাভাবিকভাবে সরল আর সংক্ষিপ্ত না হয়ে থাকে, এটি খুব বেশি মাত্রায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে, প্রায়শই খুবই কৌতুককর কোনো উপায়ে। মৌখিকভাবে এভাবে হস্তান্তরের কারণে শুধুমাত্র শব্দগুলোই পরিবর্তিত হয় না, গল্পটির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোও বদলে যায়।

লেখা বা কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখার কৌশল এবং পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা আবির্ভূত হবার পূর্বে মৌখিকভাবে গল্প বলাই, সেই চাইনীজ হুইজপার খেলার মত সব বিকৃতিসহ, একমাত্র উপায় ছিল যার মাধ্যমে মানুষ ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে পারতো। আর এটি খুব ভয়ানকভাবে অনির্ভরযোগ্য একটি উপায় ছিল। যখন প্রতিটি প্রজন্মের গল্পবলিয়েরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সে গল্পগুলো মৌখিকভাবে হস্তান্তর করেছিলেন, সেই গল্পটি ক্রমশ আরো বেশি অসংলগ্নতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। একটি পর্যায়ে, ইতিহাস - যা আসলেই ঘটেছিল - সেটি পুরাণ আর কিংবদন্তীতে হারিয়ে গিয়েছিল। এটি জানা খুবই কঠিন যে কিংবদন্তীর গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের নেপথ্যে আসলেই কি কোনো সত্যিকারের মানুষ ছিলেন কিনা, অথবা রুপকথার সেই সুন্দরী হেলেন কি আসলেই কেউ ছিলেন, যার চেহারা 'সহস্র জাহাজ যুদ্ধ অভিমূখে প্রেরণ করেছিল'? অবশেষে যখন কবি হোমার এ কাহিনীগুলোর লিখিত রূপ দিয়েছিলেন (আর আমরা জানি না এটি কখন ঘটেছিল, এমনকি এর নিকটবর্তী শতাব্দী অবধি আমরা এটি নির্ধারণ করতে পারবো না), সেগুলো বহু প্রজন্মের মৌখিক বিনিময় আর পুনরাবৃত্তির প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। কোনো নির্ভরযোগ্য সত্য সেখান থেকে অপসারিত হয়েছিল। আমাদের জানা নেই হোমার কে ছিলেন, অথবা কখন তিনি জীবিত ছিলেন, অথবা তিনি অন্ধ ছিলেন কিনা, যেভাবে কিংবদন্তীতে তাকে আমরা পাই। কিংবা তিনি কী একজন,

নাকি একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। এবং মৌখিক পুনরাবৃত্তির হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বিকৃতিকরণের ছাকুনীর মধ্য দিয়ে অতিক্রম হবার পূর্বে আমাদের জানা নেই কীভাবে তার গল্পগুলো মূলত শুরু হয়েছিল। সেগুলো কী বাস্তব তথ্য নির্ভর কোনো বিবরণ থেকে শুরু হয়েছিল, যা পরে মূল ঘটনা থেকে অসংলগ্ন হয়ে গিয়েছিল? অথবা সেগুলো আসলেই শুরু হয়েছিল কল্পিত কোনো কাহিনী দিয়ে, যা পুনরাবৃত্তির প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়েছিল?

ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত কাহিনীগুলোর ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। অ্যাকিলিস বা হেলেনকে নিয়ে হোমারের কাহিনী আমরা যতটুকু বিশ্বাস করি, এগুলো বিশ্বাস করার জন্য তার চেয়ে বাড়তি কোনো কারণ নেই। আব্রাহাম আর জোসেফের কাহিনীগুলো হচ্ছে হিব্রু কিংবদন্তী ঠিক যেভাবে হোমারের গল্পগুলো গ্রিক কিংবদন্তী। তাহলে নিউ টেস্টামেন্ট? প্রকৃত ইতিহাস খুঁজে পাবার ক্ষেত্রে এটি আমাদের অপেক্ষাকৃত উত্তম একটি আশা দেয়, কারণ এটি ওল্ড টেস্টামেন্টের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক সময়ের প্রতি তথ্য নির্দেশ করছে: মাত্র দুই হাজার বছর আগের একটি ইতিহাস। কিন্তু আমরা আসলেই যিশু সম্বন্ধে সত্যিকারভাবে কতটুকু জানি? আমরা কী নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আসলেই তার অস্তিত্ব ছিল? যদিও সবাই নয়, তবে অধিকাংশ আধুনিক গবেষকরাই মনে করেন সম্ভবত তার অস্তিত্ব ছিল। আমাদের কাছে এর কী প্রমাণ আছে?

গসপেলগুলো? নিউ টেস্টামেন্টের শুরুতে যেগুলো ছাপা আছে, সুতরাং আপনি হয়তো ভাবতে পারেন হয়তো এগুলোই প্রথম লেখা হয়েছিল। কিন্তু আসলে নিউ টেস্টামেন্টে অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে প্রাচীন বইগুলো আছে এর শেষের দিকে: সেন্ট পলের চিঠিগুলো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পল যিশুর জীবন নিয়ে প্রায় কিছুই বলেননি। তবে যিশুর ধর্মীয় অর্থ নিয়ে প্রচুর বিবরণ আছে, বিশেষ করে তার মৃত্যু আর পুনরুত্থান । কিন্তু একেবারে কিছুই নয় যা কিনা এমনকি ইতিহাস বলে দাবী করা যেতে পারে। হয়তো পল ভেবেছিলেন তার পাঠকরা ইতোমধ্যেই যিশুর জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে জানেন। কিন্তু সম্ভাবনা আছে, পল নিজেই সেই সম্বন্ধে কিছু জানতেন না: স্মরণ করুন, গসপেলগুলো কিন্তু তখনও লেখা হয়নি। অথবা হয়তো তিনি এগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। পলের চিঠিতে যিশু সম্বন্ধে বাস্তব তথ্যের অনুপস্থিতি ইতিহাসবিদদের ভাবিয়েছে। বিষয়টি খুব অদ্ভুত না যে, পল যিনি চাইছেন সবাই যিশুর উপাসনা করুক, তিনি কিনা যিশু আসলেই কী বলেছিলেন বা করেছিলেন সে বিষয়ে প্রায় একেবারে কিছুই বলেননি?

আরেকটি বিষয় ইতিহাসবিদদের ভাবিয়েছিল সেটি হচ্ছে গসপেলের বাইরের ইতিহাসে যিশুকে নিয়ে প্রায় একবারে কোনো কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। ইহুদী

ইতিহাসবিদ জোসেফাস (৩৭- আনুমানিক ১০০ খ্রিস্টাব্দ), যিনি গ্রিক ভাষায় লিখেছিলেন, শুধুমাত্র এটুকুই বলেছিলেন:

> ‘এই সময় নাগাদ যিশু নামে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, যদিও আসলেই তাকে কারো মানুষ বলা উচিত হবে কিনা, কারণ তিনি বিস্ময়কর সব ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, এবং সেই ব্যক্তিদের একজন গুরু ছিলেন যারা আনন্দের সাথে সেই সত্যটি মেনে নিয়েছিলেন। তিনি বহু ইহুদী এবং অনেক গ্রিকদের মন জয় করতে পরেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মেসাইয়া (পরিত্রাতা) এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তিদের অভিযোগের ভিত্তিতে পিলাটে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিয়েছিলেন। তবে যারা প্রথম তাকে ভালোবেসেছিলেন, তারা তাকে ভালোবাসা বন্ধ করে দেননি। তার মৃত্যুর তিন দিন পর পুনরায় জীবিত হয়ে তিনি তাদের সামনে হাজির হয়েছিলেন, যেহেতু ঈশ্বরের নবীরাই এসব কিছুর পূর্বাভাস দিয়ে গিয়েছিলেন, আরো বহু সহস্র মানুষ তাকে নিয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন। অনুসারীরা তার নামানুসারে খ্রিস্টানদের গোত্র হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল, এবং আজ অবধি তারা টিকে আছেন, অদৃশ্য হয়ে যায়নি’।

বহু ইতিহাসবিদই এই অনুচ্ছেদটিকে একটি জালিয়াতির কাজ হিসাবে সন্দেহ করেন, একজন খ্রিস্টীয় লেখক সম্ভবত পরবর্তীতে এটি যুক্ত করে দিয়েছিলেন। এখানে সবচেয়ে সন্দেহজনক বাক্যটি হচ্ছে, তিনি ছিলেন ‘মেসাইয়া’। ইহুদী ঐতিহ্যে, ‘মেসাইয়া’ নামটি দীর্ঘ-প্রতিশ্রুত একজন ইহুদী রাজা অথবা সেনাপতিকে দেয়া হয়েছে, ইহুদীদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভ করতে যার জন্ম হবে । খ্রিস্টানরা ভেবেছিলেন, যিশুই হচ্ছে সেই প্রতিশ্রুত মেসাইয়া (‘ক্রাইস্ট’ শব্দটি শুধুমাত্র এই শব্দটির একটি গ্রিক অনুবাদ)। কিন্তু ধর্মপরায়ন ইহুদীদের কাছে যিশুকে কোনো সামরিক নেতা মনে হয়নি। বাস্তবিকভাবেই, যদি খুব মৃদুভাবে সেটি বলা হয়, তার বার্তা ছিল শান্তির, এমনকি অন্য গালটি পেতে দেয়া, যদি কেউ আপনাকে আঘাত করে - আর সেটি অবশ্যই কোনো সৈন্যের কাছে প্রত্যাশিত নয়। তার সময়ের রোমান শোষকদের বিরুদ্ধে ইহুদী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়া তো বহু দূরের কথা, যিশু অনুগতভাবে তাদের হাতে শাস্তি পেতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর যিশু যে মেসাইয়া এই ধারণাটি কোনো ধর্মনিষ্ঠ ইহুদীর কাছে গাজাখুরি গল্প মনে হতে পারে, বিশেষ করে জোসেফাসের মত কারো কাছে। আর যদি জোসেফাস ঘটনাক্রমে নিজের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারেন যে, যিশুর মত

কোনো চরিত্রের ব্যক্তির মেসাইয়া হবার সম্ভাবনা আছে, তাহলে উনি এটি নিয়ে আরো অনেক বড় বড় কথা লিখতেন। তিনি শুধুমাত্র একটি দায়সারা গোছের বাক্য, 'তিনি একজন মেসাইয়া ছিলেন' লিখেই ক্ষান্ত হতেন না। স্পষ্টতই এটি পরবর্তীতে সংঘটিত কোনো খ্রিস্টীয় কারসাজি হিসাবে অনুভূত হয়। আর এখন এ বিষয়ে গবেষকরা খুব নিশ্চিতভাবে সেটাই বিশ্বাস করেন।

জোসেফাস ছাড়া অন্য একমাত্র প্রাচীন যে ইতিহাসবিদ যিশুর কথা উল্লেখ করেছিলেন, তিনি ছিলেন রোমান ইতিহাসবিদ পুবলিয়াস কর্নেলিয়াস ট্যাসিটাস (৫৪-১২০ খ্রিস্টাব্দ)। তার লেখা যিশুর অস্তিত্বর পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করেছিল শ্লেষাত্মক কিছু কারণে - খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে ট্যাসিটাসের ভালো কিছু বলার ছিল না। সম্রাট নিরো (৩৭-৮৭ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক আদি খ্রিস্টানদের নিপীড়নের সময়ে ল্যাটিন ভাষা লেখা একটি ঘটনার বিবরণে ট্যাসিটাস মন্তব্য করেছিলেন:

> 'নিরো খুব দৃঢ়ভাবে তাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়েছিলেন এবং এই গোষ্ঠীটিকে তীব্রভাবে নির্যাতন করেছিলেন, যারা তাদের একাধিক ধর্মীয় বিধিনিষেধ আর অনীহার কারণে ঘৃণিত ছিল, জনগন যাদের খ্রিস্টান বলে চিহ্নিত করতো। যার কাছ থেকে এ নামটির উৎপত্তি, 'খ্রিস্টুস' নামের সেই ব্যক্তিকে টাইবেরিয়াসের শাসনামলে তার একজন প্রশাসক পন্টিয়াস পাইলেট চূড়ান্ত দণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। এবং অত্যন্ত ধূর্ত একটি কুসংস্কার এভাবে সে মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল, কিন্তু এটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এই অশুভ অনিষ্টের প্রথম জন্মস্থান শুধুমাত্র জুডিয়াতেই নয়, বরং এমনকি এই রোমেও, যেখানে পৃথিবীর সর্বত্র থেকে আসা কুৎসিত ঘৃণ্য আর লজ্জাজনক বিষয়গুলো তাদের গন্তব্য খুঁজে পায় এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে'।

এখানে পরবর্তীতে খ্রিস্টানরা কোনো কিছু যুক্ত করতে পারেনি !

যদিও সবাই নয়, তবে অধিকাংশ গবেষকদের মতে সম্ভাবনার ভারসাম্য প্রস্তাব করছে যে, যিশুর অস্তিত্ব ছিল। অবশ্যই আমরা নিশ্চিতভাবে সেটি জানতে পারতাম, যদি নিউ টেস্টামেন্টে যুক্ত গসপেল চারটির ঐতিহাসিকভাবে সত্যতার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারতাম। খুব সাম্প্রতিক সময় অবধি, কেউই এই গসপেলগুলোর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেননি। ইংরেজি ভাষায় এমনকি একটি প্রবাদ বাক্য আছে, 'গসপেল ট্রুথ' বা গসপেলের মত সত্য, এর মানে যতটা সত্য হওয়া সম্ভব এটি ততটাই সত্য। কিন্তু উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীতে

গবেষকদের (বিশেষ করে জার্মান) সম্পাদিত বহু গবেষণার কারণে এ প্রবাদ বাক্যটি এখন বরং শূন্যগর্ভ অনুভূত হয়।

গসপেলগুলো কারা লিখেছিলেন? এবং কখন? অনেকেই ভ্রান্তভাবে বিশ্বাস করেন, 'ম্যাথিউ'র গসপেল লিখেছিলেন ম্যাথিউ, কর-সংগ্রাহক, যিনি যিশুর বারোজন ঘনিষ্ঠ সহচরের একজন। এবং 'জনের' গসপেল লিখেছিলেন সেই ছোটো অনুসারী দলটির আরেকজন, সেই জন, যিনি 'প্রিয় শিষ্য' নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। তারা মনে করেন 'মার্ক' লিখেছিলেন যিশুর প্রধান শিষ্য পিটারের একজন তরুণ অনুসারী এবং 'ল্যুক' লিখেছিলেন পলের একজন চিকিৎসক বন্ধু। কিন্তু এই গসপেলগুলো আসলে কারা লিখেছিলেন সেই বিষয়ে কারোরই ন্যূনতম কোনো ধারণা নেই। এই চারটি উদাহরণের কোনো একটির ক্ষেত্রেও আমাদের কাছে কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। পরবর্তী সময়ের খ্রিস্টানরা সুবিধার খাতিরের প্রতিটি গসপেলের উপর একজনের নাম সেটে দিয়েছিলেন। সাদামাটা, নিরপেক্ষ নাম, এ, বি, সি, ডি ইত্যাদির বদলে এভাবে নাম ব্যবহার করা নিশ্চয়ই তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত উত্তম অনুভূত হয়েছিল। আর চাক্ষুষ সাক্ষীরা এই গসপেলগুলো লিখেছিলেন, এমন কিছু বর্তমানে কোনো প্রকৃত গবেষকই মনে করেন না, এবং সবাই একমত, এমনকি মার্ক, চারটি গসপেলের মধ্যে যা সবচেয়ে পুরানো, সেটি যিশুর মৃত্যুর ৩৫ থেকে ৪০ বছর পরে লেখা হয়েছিল। ল্যুক এবং ম্যাথিউর গসপেলে অধিকাংশ কাহিনী মার্কের গসপেল থেকে উদ্ধৃত, এছাড়া আরো কিছু তথ্য এসেছিল হারিয়ে যাওয়া একটি গ্রিক দলিল থেকে, যা 'কিউ' নামে পরিচিত। চূড়ান্তভাবে এই চারটি গসপেলের পাঠ্যাংশ লিখিত রুপ পাবার আগে গসপেলগুলোয় যা কিছু আছে সেই সব কিছুই বহু দশকের মৌখিক পুনরাবৃত্তি, সেই চাইনিজ-হুইজপার সদৃশ বিকৃতি আর অতিরঞ্জনের শিকার হয়েছিল।

১৯৬৩ সালে আততায়ীর বুলেটে প্রেসিডেন্ট কেনেডি হত্যার ঘটনাটি চাক্ষুষ দেখেছিলেন বহু শত মানুষ। এটি এমনকি মুভি ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে সংবাদপত্রগুলো সেই দিনই তাদের প্রথম পাতায় খবরটি প্রকাশ করেছিল। পরবর্তীতে সেদিন আসলে কি ঘটেছিল তার সব খুঁটিনাটি দিকগুলো বিশ্লেষণ করতে 'ওয়ারেন কমিশন' নামে একটি কমিটি চেষ্টা করেছিল। এটি বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ফরেনসিক গোয়েন্দা আর বন্দুক বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ সংগ্রহ করেছিল। ৮৮৮ পাতার ওয়ারেন কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপসংহার ছিল লি. হারভি ওসওয়াল্ড নামক এক ব্যক্তি কেনেডিকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন, এবং তিনি এই কাজটি একাই করেছিল। কিন্তু পরবর্তী বহু

দশক ধরে এটি নিয়ে নানা পুরান এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলো আবর্তিত আর বিকশিত হয়েছিল, আর এটি সম্ভবত বাড়তেই থাকবে, এমনকি সব চাক্ষুষ সাক্ষীর মৃত্যু হবার বহুদিন পরেও।

নিউ ইয়র্ক আর ওয়াশিংটন ডিসির উপর '৯/১১' সন্ত্রাসী আক্রমণের ঘটনাটির বিশ বছর এখনো পার হয়নি। যিশুর মৃত্যুর পর থেকে সবচেয়ে প্রাচীন গসপেল মার্ক লেখার মধ্যবর্তী সময়ের চেয়ে যে সময়টি সংক্ষিপ্ত। ৯/১১ সংক্রান্ত সব বাস্তব তথ্যগুলো ব্যাপকভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, বহু সংখ্যক সাক্ষী তাদের জবানবন্দী দিয়েছিলেন, এবং এরপর থেকে এটির বিস্তারিত খুঁটিনাটি সব বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্লেষণ এখনো চলমান। কিন্তু তারপরও এটি নিয়ে তারা ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেননি। বিকল্প স্ববিরোধী নানা গুজব, কিংবদন্তী আর ষড়যন্ত্র তত্ত্বে ইন্টারনেট উত্তপ্ত। কিছু মানুষ মনে করেন এটি আমেরিকার নিজস্ব একটি ষড়যন্ত্র, অথবা একটি ইজরায়েলি পরিকল্পনার পরিণতি। এমনকি মহাশূন্য থেকে আসা ভিনগ্রহীদের ষড়যন্ত্র বলেও দাবি করেছেন কেউ কেউ। অন্যরা কোনো প্রমাণ ছাড়াই সেই সময়ে ভেবেছিলেন, এই ঘটনার মূল পরিকল্পক হচ্ছেন ইরাকের একনায়ক সাদ্দাম হুসেইন। তাদের দৃষ্টিতে এটাই পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট বুশের ইরাক আক্রমণ ও আগ্রাসনের ঘটনাটি সমর্থনীয় করেছে (যদিও অবশ্যই এটির আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যাখ্যা ছিল না)। চাক্ষুষ সাক্ষীরা সেই দিন নিউইয়র্কের আকাশে ভেসে থাকা ধুলোর মেঘে শয়তানের চেহারা দেখেছিলেন বলে ভেবেছিলেন এবং তারা ছবি তুলেছিলেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য - এবং ইন্টারনেট আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সেটি সম্ভব করেছে - কেউ চাইলেই অনায়াসে বড় কোনো গুজব সৃষ্টি করতে পারেন। সত্যতা বিবেচনা ছাড়াই গুজব আর রটনাগুলো মহামারির মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহান আমেরিকান লেখক মার্ক টোয়াইন যেমন বলেছিলেন, 'সত্য যখন জুতা পরতে ব্যস্ত, মিথ্যা ততক্ষণে অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে'। আর শুধুমাত্র ক্ষতিকর মিথ্যাগুলোই নয়, বরং ভালো কাহিনীগুলো যা সত্য নয় কিন্তু আনন্দদায়ক আর পুনরাবৃত্তি করার মত আকর্ষণীয়, বিশেষ করে আপনি যদি সেটি আন্তরিকভাবে বলেন, আর এগুলো যে সত্য নয় সেটি নিশ্চিতভাবে না জেনে থাকেন। অথবা সেই কাহিনীগুলো, যদিও মজার নয়, কিন্তু ভৌতিকভাবে অপ্রাকৃত কিংবা রহস্যময় - এটি আরেকটি কারণ কেন এই ধরনের এত কাহিনী এভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

কীভাবে একটি অসত্য কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে, তার একটি বৈশিষ্ট্যসূচক উদাহরণের কথা বিবেচনা করুন, কারণ এটি বেশ মজার, এবং এটি মানুষের

প্রত্যাশা আর সংস্কারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে প্রথমে নেপথ্যের কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করার দরকার আছে। আপনি হয়তো 'রাপচারের' কথা শুনেছেন। কিছু ধর্ম প্রচারক এবং লেখক, বাইবেলের কিছু সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করে সম্প্রতি অনেককেই, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে, এই কাহিনীর প্রতি বহু মানুষকে আকৃষ্ট করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এই মানুষগুলো বিশ্বাস করতে প্ররোচিত হয়েছেন, শীঘ্রই অল্প কিছু ভাগ্যবান, তাদের 'ভালোত্বের' জন্য নির্বাচিত হবেন, এবং হঠাৎ করেই আকাশে দ্রুত উড়ে যাবেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করবেন। আর এই রাপচার যিশুর প্রতিশ্রুত 'দ্বিতীয় আগমনের' সুসংবাদ বয়ে আনবে। আর আমরা বাকিরা, যাদের এভাবে স্বর্গারোহন হবে না, তারা হবেন আনরাপচার্ড – 'লেফট বিহাইন্ড' বা পরিত্যক্ত জনগোষ্ঠী। এমন মানুষ যাদের আমরা চিনি তারা হঠাৎ করেই কোনো চিহ্ন না রেখেই অদৃশ্য হয়ে যাবেন। অনুমান করা যেতে পারে, 'উপরে আকাশে' এই উড়ে যাবার ক্ষেত্রে অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা ইউরোপবাসীরা যে দিক দিয়ে আকাশে আরোহন করবেন তার বিপরীত দিক থেকে করবেন!

এখন সেই কাহিনীটি, যা আমি বলবো বলে উল্লেখ করেছিলাম। এটি সত্য নয় তবে ব্যাপকভাবেই সেটাই বিশ্বাস করা হয় আর এটি প্রদর্শন করে কীভাবে একটি ভালো গল্প ছড়িয়ে পড়তে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের আরকানসাস রাজ্যের একজন নারী মানুষ-আকৃতির বিশাল বেলুন বহনকারী একটি ট্রাকের পেছনে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। সামনের সেই ট্রাকটি হঠাৎ একটি দূর্ঘটনার শিকার হয় এবং গোলাপী রঙের ফুলে থাকা বেলুনগুলো উপরে আকাশের দিকে উড়তে শুরু করেছিল, কারণ সেগুলোর ভিতরে ছিল হিলিয়াম গ্যাস। এই দৃশ্যটি দেখে পেছনের গাড়িতে বসা সেই নারীটি একটি 'রাপচার' এবং যিশুর দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন দেখছেন এমন কিছু চিন্তা করে, 'তিনি ফিরে এসেছেন, তিনি ফিরে এসেছেন' চিৎকার করতে করতে তার চলন্ত গাড়ির ছাদের সানরুফ দিয়ে বের হয়ে এসেছিলেন স্বর্গে আরোহন করার উদ্দেশ্যে। পরিণতিতে সৃষ্ট বিশটি গাড়ির বড় একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছিল সেই নারীসহ আরো ১৩ জন নিরীহ মানুষ। লক্ষ করুন '১৩ জন নিরপরাধ' মানুষের সেই মিথ্যা তথ্যের সুনির্দিষ্টতাটি। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, কোনো গুজব এত সুনির্দিষ্টভাবে খুঁটিনাটি তথ্য উপস্থাপন করতে পারে না। কিন্তু আপনার সেই চিন্তাটি ভুল হবে।

আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন কত সহজে এই কাহিনীটি 'সঞ্চারণযোগ্য'। যদি কেউ আপনাকে এটি একটি বাস্তব তথ্য হিসাবে বলে থাকেন, আপনি প্রায় নিশ্চিতভাবে অন্য কাউকে সেটি বলতে দেরি করবেন না। এই কাহিনীগুলো

এভাবে ছড়িয়ে পড়ে কারণ এগুলো আকর্ষণীয় কাহিনী। হয়তো এগুলো মজারও। হয়তো আমরা সবাই সেই মনোযোগ উপভোগ করি যখন কোনো ভালো গল্প এই ভাবে অন্যের কাছে হস্তান্তর করি। হিলিয়াম পুতুলের গল্পটি শুধু অতিমাত্রায় জীবন্ত নয়, এটি মানুষের প্রত্যাশা আর সংস্কারের সাথে মানানসইও। আপনি কী বুঝতে পারছেন, যিশুর অলৌকিক কর্মকাণ্ড আর পুনরুত্থানের কাহিনীগুলোর ক্ষেত্রেও একই ভাবে এটি সত্য হতে পারে? সদ্য আবির্ভূত খ্রিস্টান ধর্মের আদি অনুসারীরা সত্যতা যাচাই করে দেখার আগেই যিশুকে নিয়ে বর্ণিত নানা গুজব আর গল্পগুলোকে ছড়িয়ে দিতে হয়তো বেশি উদগ্রীব ছিলেন।

'৯/১১' কিংবা কেনেডির মৃত্যুকে ঘিরে প্রচলিত বিকৃত কিংবদন্তীগুলো লক্ষ করুন, এবং তারপর কল্পনা করুন আরো কত বেশি সহজে এবং বিস্তারিতভাবে কোনো কিছু আরো বিকৃত করা সম্ভব হতে পারে, যদি সেখানে কোনো ক্যামেরা কিংবা সংবাদপত্র না থাকে, এছাড়া ঘটনা ঘটার ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হবার আগে যখন কোনো কিছুই লেখা না হয়ে থাকে। শুধুমাত্র মুখের কথা, রটনা ছাড়া আর কোনোই তথ্য উৎস নেই। যিশুর মৃত্যুর পর এরকমই ছিল পরিস্থিতি। পূর্ব ভূমধ্যসাগরের চারপাশে, প্যালেস্টাইন থেকে রোম পর্যন্ত বহু সংখ্যক বিচিত্র ধরনের বিচ্ছিন্ন খ্রিস্টান-গোষ্ঠীর বসবাস ছিল, এসব স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অনিয়মিত এবং অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ছিল। তখনও গসপেলগুলো লিখিত রূপ পায়নি। সেগুলোকে একত্রে যুক্ত করার মত কোনো নিউ টেস্টামেন্টও তাদের ছিল না । বহু বিষয় তাদের মতবিরোধ ছিল, যেমন খ্রিস্টান হতে গেলে কী ইহুদী হতে হবে (আর সেক্ষেত্রে খৎনাও করাতে হবে) কিংবা তাদের এই খ্রিস্ট ধর্মটি কি সম্পূর্ণ নতুন একটি ধর্ম। পলের কিছু চিঠি এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একজন নেতার শৃঙ্খলা ফেরানোর সংগ্রামটিকে প্রদর্শন করে।

একটি স্বীকৃত ঐক্যমতের বাইবেলের 'ক্যানন' – অর্থাৎ যে বইগুলো আনুষ্ঠানিক তালিকায় থাকার স্বীকৃতি পেয়েছে - পলের মৃত্যুর পর বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পরেই কেবল নির্ধারিত হয়েছিল। প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টানরা যে বাইবেল পড়েন সেটি নিউ টেস্টামেন্টের ২৭ টি বই আর ওল্ড টেস্টামেন্টের ৩৯ টি বইয়ের একটি স্বীকৃত ক্যানন (রোমান ক্যাথলিক আর অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের বাইবেল ক্যাননে আরো এক সেট বই আছে যাদের বলা হয় 'অ্যাপোক্রিফা')।

ম্যাথিউ, মার্ক, ল্যুক এবং জনের গসপেলগুলোই শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক 'ক্যাননে' স্বীকৃত গসপেল, কিন্তু আমরা পরে দেখবো, আরো অনেক যিশুর গসপেল আছে, যা প্রায় একই সময়ে লেখা হয়েছিল। 'ক্যানন' মূলত ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে চার্চ নেতার

একটি সম্মেলনে ধার্য করা হয়েছিল, যা 'কাউন্সিল অব নাইসিয়া' নামে ইতিহাসে পরিচিত। এই কাউন্সিলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎকালীন রোম সম্রাট কনস্টান্টিন - যার ধর্মান্তরের মাধ্যমে ইউরোপ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহন করেছিল। রোম সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে তিনি খ্রিস্টধর্মকে নির্বাচন করেছিলেন। কনস্টান্টিন যদি এই পদক্ষেপ না নিতেন, তাহলে হয়তো আপনি জুপিটার, অ্যাপোলো আর মিনার্ভা আর অন্য রোমান দেবতাদের উপাসনা করেই প্রতিপালিত হতেন। আরো বহু শতাব্দী পরে, আরো দুটি বড় সাম্রাজ্যের কারণে খ্রিস্টধর্ম দক্ষিণ আমেরিকায় বিস্তার লাভ করেছিল, পর্তুগীজ সাম্রাজ্য (ব্রাজিলে) এবং স্প্যানিশ সাম্রাজ্য (মহাদেশটির অবশিষ্টাংশে)। উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য আর ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের ব্যাপক বিস্তারের কারণ ছিল সামরিক বিজয়ের পরিণতি।

যেমন উল্লেখ করেছি, ম্যাথিউ, মার্ক, ল্যুক আর জন হচ্ছে কাউন্সিল অব নাইসিয়ার সময়ে প্রচলিত বহু সংখ্যক গসপেলের মধ্যে মাত্র চারটি। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে স্বল্প-পরিচিত কিছু গসপেল নিয়ে আলোচনা করবো, তাদের যে-কোনোটিকে হয়তো ক্যানোনে যুক্ত করা হতো, কিন্তু নানা কারণে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রায়শই এর কারণ সেগুলোকে 'হেরেটিকাল' বা ভিন্নমতাবলম্বী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এর মানে এগুলো কাউন্সিল সদস্যদের গতানুগতিক বা অর্থোডক্স বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। আংশিকভাবে এর কারণ ছিল এই গসপেলগুলো ম্যাথিউ, মার্ক, ল্যুক আর জনের গসপেলের চেয়ে খানিকটা বেশি সাম্প্রতিক সময়ে লেখা হয়েছিল। কিন্তু যেমন আমরা দেখেছি, এমনকি মার্কও যথেষ্ট আগে লেখা হয়নি যে একে সম্ভাব্য নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বলা যেতে পারে।

সমর্থিত চারটি গসপেলকে নির্বাচন করা হয়েছিল, আংশিকভাবে খুব অদ্ভুত কারণে, যা ইতিহাসের চেয়ে বরং কাব্যিক কল্পনার কাছে বেশি পরিমানে ঋণী। আইরেনিউস, খ্রিস্টধর্মের আদি ইতিহাসে প্রভাবশালী চরিত্রের একজন, যারা 'চার্চ পিতৃবর্গ' নামে পরিচিত, এবং কাউন্সিল অব নাইসিয়া প্রতিষ্ঠা হবার এক শতাব্দী আগে জীবিত ছিলেন। তিনি বিচিত্র কারণে বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, গসপেলের সংখ্যা অবশ্যই চার হতে হবে, এর চেয়ে বেশি বা কম নয়। তিনি দাবী করেছিলেন (যেন এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার হতে পারে) পৃথিবীতে চারটি দিক আর 'ফোর উইন্ডস' বা চারটি আধ্যাত্মিক সত্য আছে। আর যেন এটি যথেষ্ট নয়, তিনি আরো উল্লেখ করেছিলেন 'বুক অব রিভিলেশনে' বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের সিংহাসন বহন করছে চারটি জন্তু যাদের চারটি করে মুখ

আছে, এটি সম্ভবত ওল্ড টেস্টামেন্টের নবী ইজেকিয়েল দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি ধারণা, যিনি বাতাসের ঘূর্ণিপাক থেকে চারটি জন্তুকে বের হয়ে আসতে দেখেছিলেন, যাদের প্রত্যেকের চারটি করে মুখ ছিল, চার, চার, চার, চার, আপনি এই 'চার' থেকে মুক্তি পাবেন না, আর সেই কারণে ক্যাননে আমাদের চারটি মাত্র গসপেল থাকতেই হবে। আমি দুঃখিত এবং বলতে বাধ্য হচ্ছি এই ধরনের 'যুক্তি প্রক্রিয়া' ধর্মতত্ত্বে বিশেষ যুক্তি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচ্য।

আর প্রসঙ্গক্রমে, কমপক্ষে আরো এক শতাব্দীর আগে 'বুক অব রিভিলেশন' বইটিকে 'ক্যাননে' যুক্ত করা হয়নি, আর এটি যে করা হয়েছে সেটিও খুব দুঃখজনক একটি ঘটনা। পাটমস নামক একটি দ্বীপে জন নামের একজন ব্যক্তি এক রাতে অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, এবং তিনি সেই স্বপ্নটির বিবরণ লিখে রেখেছিলেন। আমাদের সবারই স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা আছে, আর সেগুলো অধিকাংশই খুব অদ্ভুত। আমার নিজের স্বপ্নগুলো সবসময়ই খুবই অদ্ভুত, কিন্তু আমি সেগুলো লিখে রাখি না, এবং আমি অবশ্যই ভাবি না যে এগুলো যথেষ্ট পরিমানে আগ্রহোদ্দীপক যা কিনা আমি অন্য মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে পারি। জনের স্বপ্ন বাকি সবার চেয়ে আরো বেশি অদ্ভুত ছিল (প্রায় যেন মনে হতে পারে তিনি মাদকের নেশায় মত্ত হয়ে ছিলেন)। আর এটি যে কারণে খুব বেশি মাত্রায় প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পেরেছিল, সেই কারণটি হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে এটি বাইবেল 'ক্যাননে' এর জায়গা করে নিতে পেরেছিল। এটিকে ভবিষ্যসূচক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আমেরিকার অতি-উৎসাহী যাজকদের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় প্রায়শই সেগুলোর উদ্ধৃতি দেয়া হয়। থেসালোনিয়ার অধিবাসীদের প্রতি পলের প্রথম চিঠির সাথে, রিভিলেশন হচ্ছে 'রাপচার' ধারণাটির মূল অনুপ্রেরণা। একই সাথে এটি খুব বিপজ্জনক একটি ধারণার উৎস: 'আর্মাগেডনের' সেই যুদ্ধটি শেষ না হওয়া অবধি অতি-কাঙ্ক্ষিত যিশুর দ্বিতীয় আগমন ঘটবে না। এই বিশ্বাসটি হচ্ছে একটি কারণ যে, আমেরিকার কিছু মানুষ মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েল সংশ্লিষ্ট একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ কামনা করেন। তারা মনে করেন এই যুদ্ধই হবে 'আর্মাগেডন'।

বহু সহস্র মানুষ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে তথাকথিত 'লেফট বিহাইন্ড' ধারাবাহিকের বইগুলোর লক্ষণীয় জনপ্রিয়তার পরে, আন্তরিকভাবে এই উন্মত্ত বিশ্বাসটি ধারণ করেন যে, 'রাপচার' আসলেই ঘটবে, এবং এটি খুব শীঘ্রই ঘটবে। এমনকি কিছু ওয়েবসাইটও আছে যা অর্থের বিনিময়ে আপনার পোষা বিড়ালের দেখাশুনা করার নিশ্চয়তা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়, যদি কোনো সতর্ক সংকেত ছাড়াই আপনাকে আকস্মিকভাবে স্বর্গে 'টেনে' তুলে নেয়া হয়। খুবই

দুঃখজনক একটি বিষয় যে, অনেকেই এমনকি অনুধাবন করতে পারেন না যে, খ্রিস্টীয় ক্যাননে কোন বইগুলো জায়গা পাবে আর কোন বইগুলো 'পরিত্যক্ত' হবে সেটি মূলত দৈব ঘটনার চেয়ে সামান্য খানিকটা বেশি ছিল।

যিশুর মৃত্যু আর গসপেলগুলো লিখিত রূপে আবির্ভূত হবার মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানই এগুলো যে ইতহাসের নির্ভরযোগ্য সূত্র নয়, এমন কিছু সন্দেহ করতে আমাদের একটি কারণ দিয়েছে। সন্দেহ করার অন্য আরেকটি কারণ হচ্ছে, গসপেলগুলোয় উল্লেখিত বহু তথ্য পরস্পরবিরোধী। যদিও সব গসপেলই একমত যে, যিশুর ঘনিষ্ঠ বারো জন শিষ্য ছিলেন, কিন্তু এই বারো জন কারা ছিলেন, সেই ব্যাপারে গসপেলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ আছে। ম্যাথিউ আর ল্যুক এই দুটি গসপেল সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই গুচ্ছ পূর্বসূরিদের মাধ্যমে মেরির স্বামী জোসেফের বংশঐতিহ্য অনুসরণ করেছে, ম্যাথিউর গসপেলে ২৫ জন আর ল্যুকে ৪১ জন। আরো পরিস্থিতি আরো জটিলতর হয়েছে কারণ কুমারী মায়ের গর্ভে যিশুর জন্ম হবার কথা, সুতরাং খ্রিস্টানরা ডেভিডের বংশধর হিসাবে যিশুকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জোসেফের বংশঐতিহ্যটি ব্যবহার করতে পারেন না। এছাড়াও গসপেলগুলোর মধ্যে বহু ইতোমধ্যেই জানা আছে এমন বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রেও বিভ্রাট আছে, যেমন রোমান শাসকদের তালিকা এবং তাদের কর্মকাণ্ডগুলো।

গসপেলগুলোকে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহন করার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তাদের চিন্তাবিষ্টতা। বিশেষ করে ম্যাথিউর গসপেলে। আপনার মনে হতে পারে শুধুমাত্র ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্য হয়েছে তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে কাহিনী উদ্ভাবন এবং সেগুলো গসপেলে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ম্যাথিউ খুবই পারদর্শী ছিলেন। তার উদ্ভাবনের নগ্নতম উদাহরণটি হচ্ছে সেই কিংবদন্তীটি উদ্ভাবন, মেরি কুমারী ছিলেন যখন তিনি যিশুর জন্ম দিয়েছিলেন। আর সেটি ছিল এমন একটি কিংবদন্তী যা আসলেই নিজস্ব একটি জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছিল। ম্যাথিউ আমাদের বলেছেন, কীভাবে একজন ফেরেশতা জোসেফের স্বপ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তার হবু স্ত্রী মেরির অন্তসত্ত্বা হবার কারণ অন্য কোনো পুরুষ নয় বরং স্বয়ং ঈশ্বর। (আর প্রসঙ্গক্রমে এটি ল্যুকের বিবরণ থেকে ভিন্ন, যেখানে ফেরেশতা এসেছিলেন মেরির কাছেই)। যা-ই হোক না কেন, ম্যাথিউ তার কাহিনী অব্যাহত রেখেছিলেন, লজ্জার সামান্যতম কোনো আভাস ছাড়াই, তার পাঠকের কাছে স্বীকারোক্তি করতে:

‘এই সব কিছুই ঘটেছিল যা ঈশ্বর তার নবীর মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন তা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে: ‘কুমারীর গর্ভে আসবে একটি শিশু, এবং সে জন্ম দেবে এক পুত্রের, এবং তারা তাকে ইম্যানুয়েল নামে ডাকবে’ - যার অর্থ, ‘আমার সাথে ঈশ্বর আছেন’।

হয়তো এখানে ‘লজ্জা’ শব্দটি ব্যবহার করা ভুল হবে। ম্যাথিউ, তিনি যে-ই হোন না কেন, ঐতিহাসিক সত্যতার ব্যাপারে আমাদের চেয়ে খুবই ভিন্ন একটি ধারণা ধারণ পোষণ করতেন। তার জন্য, একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করা আসলেই যা ঘটেছিল তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বুঝতে পারতেন না কেন আমি বলেছি, ‘লজ্জার সামান্যতম কোনো আভাস ছাড়াই’।

আসলে ম্যাথিউ ভবিষ্যদ্বাণীটিকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলেন। ‘বুক অব আইজেইয়ার’ সপ্তম অধ্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণীটি আছে। বুক অব আইজেইয়া থেকেই এটি সুস্পষ্ট যে - আপাতদৃষ্টিতে ম্যাথিউর কাছে তা মনে হয়নি - আইসাইয়া দূরবর্তী একটি ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলছিলেন না, তিনি তার সময়ের নিকটবর্তী একটি ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলছিলেন। তিনি রাজা আহাজের সাথে কথা বলছিলেন, তার উপস্থিতিতে থাকা একটি সুনির্দিষ্ট তরুণীকে নিয়ে, যখন তিনি সেটি বলছিলেন সে তরুণী তখন গর্ভবতী।

যে শব্দটি ম্যাথিউ উদ্ধৃত করছেন ‘ভার্জিন’ বা কুমারী হিসাবে সেটি আইজেইয়ার হিব্রু ভাষায় ‘আলমাহ’। আলমাহ শব্দটির অর্থ ‘কুমারী’ হতে পারে, এছাড়াও এর অর্থ ‘তরুণী’ হতে পারে, অনেকটাই ইংরেজি ‘মেইডেন’ শব্দটির মত, যার এই দুটো অর্থই হতে পারে। যখন ‘সেপ্টুয়াজিন্ট’ নামে ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি সংস্করণে আইজেইয়ার হিব্রু গ্রিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, যা ম্যাথিউ হয়তো পড়েছিলেন, ‘আলমাহ’ হয়েছিল ‘পার্থেনোস’- আসলেই যার অর্থ ‘কুমারী’। সাধারণ একটি অনুবাদের ভুলের কারণে বিশ্বব্যাপী আশীর্বাদপুষ্ট কুমারী মেরির পূর্ণাঙ্গ কিংবদন্তীটি এবং মেরিকে এক ধরনের দেবী - ‘স্বর্গের রানী’ - হিসাবে অনুসরণ করা রোমান ক্যাথলিকদের কাল্ট বা ধর্মগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল ।

ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূরণ করার সেই একই প্রত্যয় বেথলেহেমকে যিশু জন্মস্থান হিসাবে নির্ধারণ করতে ম্যাথিউ এবং ল্যুক দুজনকেই প্ররোচিত করেছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টের আরেকজন নবী মাইকাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ‘ডেভিডের শহর’ বেথলেহেমে একজন ইহুদী মেসাইয়ার জন্ম হবে। জনের গসপেল, যথেষ্ট পরিমানে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে নাজারেথ শহরটিকেই যিশুর

জন্মস্থান হিসাবে অনুমান করেছিল, যে শহরে যিশুর বাবা-মা বাস করতেন। জন সংশয়বাদীদের কথা বলেছিলেন যারা বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, তিনি কি আসলেই মেসাইয়া ছিলেন কিনা, যার কিনা নাজারেথে জন্ম হয়েছে। মার্ক তার জন্মের কথা এমনকি উল্লেখও করেনি। কিন্তু ম্যাথিউ এবং ল্যুক দুজনই নবী মাইকাহ'র ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন এবং দুজনেই চেষ্টা করেছিলেন নাজারেথ থেকে বেথলেহেমে যিশুর জন্মস্থান স্থানান্তর করতে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা সেটি করেছিলেন পৃথক এবং পরস্পরবিরোধী উপায়ে।

সমস্যাটির জন্যে ল্যুকের সমাধান ছিল রোম সম্রাট অগাস্টাসের জারি করা একটি কর পরিশোধ করার নির্দেশ। ল্যুকের বিবরণ অনুযায়ী এই কর পরিশোধ করার নির্দেশটি একটি আদমশুমারির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু এখানে ল্যুক তারিখগুলো তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলেন, কারণ আধুনিক ইতিহাসবিদরা জানেন যে, ল্যুকের বর্ণিত গল্পের সেই সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে এমন কোনো আদমশুমারির ঘটনা রোম-সাম্রাজ্যে ঘটেনি। কিন্তু থাক এ ভুলটা আপাতত উপেক্ষা করি। ল্যুক উল্লেখ করেছিলেন যে, এই শুমারির গণনায় অন্তর্ভুক্ত হতে হলে সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের 'নিজেদের জন্ম শহরে' ফেরত যেতে হবে। যদিও জোসেফ প্রকৃতপক্ষে তখন নাজারেথে বসবাস করছিলেন, কিন্তু ল্যুক দাবি করেছিলেন, তার 'নিজের শহর' হচ্ছে বেথলেহেম। কেন? কারণ তিনি রাজা ডেভিডের পুরুষ বংশধারায় জন্ম নেয়া উত্তরসূরিদের একজন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার, এই দাবিটি এককভাবেই যথেষ্ট হাস্যকর। ল্যুকের ব্যাখ্যায় ডেভিড ছিলেন জোসেফের ৪১ তম প্র-পিতামহ। কীভাবে আইন কোনো শহরকে কারো 'নিজের শহর' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে, যেখানে তার ৪১ তম প্র-পিতামহ জন্মগ্রহন করেছিলেন? আপনার পুরুষ পূর্বসূরিদের বংশধারায় ৪১ তম প্র-পিতামহ কে ছিলেন সেই বিষয়ে আপনার কী সামান্যতম ধারণা আছে? আমরা সন্দেহ আছে রানি এলিজাবেথও সেটি জানেন না। তবে যা-ই হোক, ল্যুকের বিবরণ অনুসারে সেই কারণে যিশু বেথলেহেম শহরে জন্মগ্রহন করেছিলেন। শুমারির কারণে তার পিতা-মাতা নাজারেথ থেকে জোসেফের ৪১ তম প্র-প্রতিমহের জন্মস্থানে এসে বসতি গড়েছিলেন।

আর মাইকাহ'র ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে ম্যাথিউ উপায়টি ছিল ভিন্ন। আপাতদৃষ্টিতে বেথলেহেম শহরকে মেরি আর জোসেফের জন্মশহর হিসাবে তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন, আর সেই কারণে যিশুর সেখানে জন্ম হয়েছিল। ম্যাথিউর সমস্যা ছিল পরবর্তীতে তিনি কীভাবে এই পরিবারটিকে নাজারেথে নিয়ে যাবেন। সুতরাং তার কাহিনীতে বর্ণনা করেছিলেন কীভাবে নিষ্ঠুর রাজা

হোরোড বেথলেহেমে যিশুর জন্মের বিষয়টি টের পেয়ে গিয়েছিলেন। পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করা 'নতুন' ইহুদীদের রাজার আবির্ভাবে ক্ষমতাচ্যুত হবার আশঙ্কায় হেরোড বেথলেহেমে জন্ম নেয়া প্রতিটি পুরুষ শিশুকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জোসেফকে সতর্ক করে দিতে আর মেরি আর যিশুকে নিয়ে মিশরের দিকে পালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে ঈশ্বর জোসেফের স্বপ্নে একজন ফেরেশতাকে পাঠিয়েছিলেন। হয়তো আপনি সেই ক্রিসমাস ক্যারোলটি গেয়েছেন, যেটি হচ্ছে এরকরম:

> তারপর, আতঙ্কিত হেরোড দিশেহারা:
> ইহুদী জাতির এক রাজকুমার!
> সব পুরুষ শিশুকে হত্যা করেছিলেন ক্ষুদ্ধ হয়ে সেই বেথলেহেমে।

মেরি আর জোসেফ ঈশ্বরের নির্দেশ মান্য করেছিলেন, এবং হেরোডের মৃত্যুর আগে তারা মিশর থেকে ফিরে আসেননি। তবে, তারা এমনকি বেথলেহেমকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন কারণ ঈশ্বর অন্য আরেকটি স্বপ্নে জোসেফকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, হোরোডের পুত্র আরকেলাউসের জন্য তারা বেথলেহেমে নিরাপদে থাকতে পারবেন না। সুতরাং এর পরিবর্তে বসবাস করার জন্য,

> 'তারা নাজারেথে নামে একটি শহরে গিয়েছিলেন, আর এভাবেই যেন নবীদের উচ্চারিত আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে পারে: তিনি নাজারিন নামে পরিচিত হয়ে উঠবেন'।

ম্যাথিউর বেশ পরিচ্ছন্ন একটি সমাধান উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি তার কাহিনীর যিশু চরিত্রটিকে নিরাপদে নাজারেথে নিয়ে এসেছিলেন, এবং এমনকি এই প্রক্রিয়ায় আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

আমি বলেছিলাম ঐসব বাড়তি গসপেলগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। ক্যাননে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন প্রায় ৫০টি গসপেল আছে, ম্যাথিউ মার্ক, ল্যুক আর জনের গসপেলের এগুলোর যে-কোনোটাই মূল ক্যানোনে যুক্ত হতে পারতো। যিশুর মৃত্যু পরবর্তী দুই শতাব্দীতে এই গসপেলগুলোর অধিকাংশই লিখিত রুপ পেয়েছিল, কিন্তু স্বীকৃত চারটি গসপেলের মত ঐসব চূড়ান্ত সংস্করণগুলোর প্রাচীন মৌখিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছিল (সম্ভবত 'চাইনিজ হুইজপার' সদৃশ্য নানা বিচ্যুতিতে পূর্ণ হয়ে)। এর মধ্যে আছে পিটারের গসপেল, ফিলিপের গসপেল, মেরি ম্যাগডালেনের গসপেল, টমাসের কপটিক

গসপেল, টমাসের ইনফ্যান্সি গসপেল, মিশরীয়দের গসপেল এবং জুডাস ইসকারিয়টের গসপেল।

কিছু ক্ষেত্রে এগুলো কেন ক্যাননে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি সেটি বোঝা কিন্তু খুব সহজ। জুডাস ইসকারিয়টের গসপেলের কথা ধরা যাক, যিশুর গল্পে জুডাস হচ্ছেন প্রধান খলনায়ক। তিনি যিশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে রোমান কর্তৃপক্ষের কাছে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, যারা যিশুকে গ্রেফতার এবং পরে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। ম্যাথিউর গসপেল অনুযায়ী, তার এমন আচরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল লোভ: এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনি ৩০টি রৌপ্যমূদ্রা পেয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাথিউর সমস্যা হচ্ছে, যেমনটা আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি, তিনি ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূরণ করতেই মূলত আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। ম্যাথিউ চেয়েছিলেন, যিশুর সাথে ঘটা সব কিছুই যেন একটি ভবিষ্যদ্বাণীকেই পূর্ণ করে। এবং আমরা হয়তো ভাবতে পারি জুডাস কী আসলে তার উপর আরোপিত তথাকথিত অর্থলিপ্তার অভিযোগসহ ম্যাথিউর নবীদের-ভবিষ্যদ্বাণী-পূর্ণ-করার-চিন্তাবিষ্টতার শিকার কিনা। এই সংক্রান্ত কিছু তথ্য আমি বাইবেল ইতিহাসবিদ বার্ট এহরমানের কাছ থেকে জেনেছিলাম। নবী জাকারিয়াকে (অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ১২) ৩০ টি রৌপ্যমূদ্রা পরিশোধ করা হয়েছিল। খুব বেশি লক্ষণীয় কোনো কাকতলীয় ঘটনা নয়, যতক্ষণ না আপনি জাকারিয়ার পববর্তী অনুচ্ছেদটি লক্ষ করবেন:

> সুতরাং তারা আমাদের ত্রিশটি রৌপমূদ্রা পরিশোধ করেছিল। এবং ঈশ্বর আমাকে বলেছিলেন, 'মূদ্রাগুলো কুমারদের প্রতি নিক্ষেপ করো' - বেশ ভালো দামেই তারা আমার মূল্যায়ন করেছে। সুতরাং আমি ত্রিশটি রৌপ্যমূদ্রা নিয়ে প্রভুর উপাসনালয়ে উপস্থিত হই এবং কুমারের উদ্দেশ্যে সেগুলো নিক্ষেপ করি।

এখানে 'কুমার' আর 'নিক্ষেপ করো' শব্দটি আপনার মাথায় রাখুন, যখন আমরা আবার ম্যাথিউর অধ্যায় ২৭-এ ফিরে যাই। অনুতপ্ত জুডাস তার ত্রিশটি রৌপ্যমূদ্রা প্রধান পুরোহিত এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল:

> যখন যিশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী জুডাস দেখেছিলেন যে, যিশুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে, তিনি অনুশোচনায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে হয়েছিলেন এবং ত্রিশটি রৌপ্যমূদ্রা তিনি প্রধান পুরোহিত আর বয়োজ্যেষ্ঠদের ফেরত দিতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি পাপ করেছিল, আমি নিষ্পাপ একটি মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা

> করেছি'। তারা উত্তর দিয়েছিল, 'তাতে আমাদের কী আসে যায়, এর জন্য তুমি একাই দায়ী'। সুতরাং জুডাস মূদ্রাগুলো মন্দিরে নিক্ষেপ করে সেখান থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি শহর ত্যাগ এবং গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। প্রধান পুরোহিত মুদ্রাগুলো মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'এই মূদ্রা পুনরায় কোষাগারে রাখা বেআইনি হবে, কারণ এর গায়ে রক্ত লেগে আছে'। সুতরাং তারা ভিনদেশীদের জন্য সমাধিক্ষেত্র (পটার্স ফিল্ড) হিসাবে একটি জমি ক্রয় করতে এ মূদ্রাগুলো ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

প্রধান পুরোহিতরা সে 'রক্ত-রঞ্জিত' অর্থ গ্রহন করতে চাননি। সুতরাং তারা সেটি 'পটার্স ফিল্ড' নামক এক খণ্ড জমি ক্রয় করতে ব্যবহার করেছিলেন। ম্যাথিউ তার স্বভাবমতোই, এই পুরো কাহিনী ঘুরিয়ে নিয়ে এসে জেরেমাইয়া নামক আরেকজন নবীর সাথে যুক্ত করেছিলেন:

> তারপর নবী জেরেমাইয়া যা উচ্চারণ করেছিলেন সেটি পূর্ণ হয়েছিল: 'তারা সেই ত্রিশটি রৌপ্যমূদ্রা নিয়েছিল, ইজরায়েলের মানুষ তার মাথার দাম হিসাবে যা নির্ধারণ করেছিল এবং তারা পটার্স ফিল্ড ক্রয় করতে সেটি ব্যবহার করেছিলেন, যেভাবে প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন'।

জুডাসের গসপেলটির পুনরাবিষ্কারের ঘটনাটি ছিল বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার সংক্রান্ত সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর একটি। তথ্য ছিল যে, এমন একটি গসপেল লেখা হয়ছে, কারণ আদি চার্চ পিতারা এটির কথা উল্লেখ এবং নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু মূলত ভাবা হয়েছিল যে, এটি হয়তো হারিয়ে গেছে, হয়তো ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে এটি পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু তারপর, ১৭০০ বছর পর, সত্তরের দশকের শেষের দিকে, মিশরের একটি সমাধির মধ্যে এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। আর সাধারণত এই ধরনের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে, সত্যিকারভাবে সংরক্ষণ করতে সক্ষম এমন সঠিক গবেষকদের হাত অবধি এই গুরুত্বপূর্ণ অমূল্য দলিলটি পৌঁছাতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল এবং এই পথটি পাড়ি দেবার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এটি ক্ষতিগস্ত হয়েছিল। তেজস্ক্রিয়-কার্বন ডেটিং পদ্ধতি ২৮০ খ্রিস্টাব্দের ষাট বছর আগে কিংবা পরের কোনো একটি সময়কে এর সম্ভাব্য সময়কাল হিসাবে নির্ধারণ করেছিল [কার্বন ডেটিং একটি বুদ্ধিদীপ্ত বৈজ্ঞানিক কৌশল, যার মাধ্যমে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের সময় নির্ণয় করতে পারি। আর এটি কীভাবে কাজ

করে সেটি আমি ব্যাখ্যা করেছি ‘দ্য ম্যাজিক অব রিয়েলিটি’ বইটিতে (লন্ডন, বেন্টাম প্রেস,২০১১)]।

এই পুনরাবিষ্কৃত দলিলটি প্রাচীন একটি মিশরীয় ভাষায়- কপটিক- লেখা, কিন্তু ধারণা করা হয় এটি আরো আগের এখনো নিখোঁজ কোনো গ্রিক অনুবাদের অনুবাদ, যা সম্ভবত খ্রিস্টীয় ক্যাননে জায়গা পাওয়া গসপেলের সমসাময়িক। ঐ চারটির মতোই যে লেখকের নামে দলিলটির নামকরণ করা হয়েছে তিনি ছাড়া অন্য কেউ এটি লিখেছিলেন: সুতরাং সম্ভবত এটি জুডাসের নিজের লেখা নয়। এটি মূলত জুডাস আর যিশুর মধ্যকার একগুচ্ছ কথোপকথন। এটি সেই বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনীটি বর্ণিত করেছে কিন্তু সেটি জুডাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং এটি পুরো ঘটনা থেকে জুডাসের দায় অনেকাংশেই অপসারণ করেছিল। এটি প্রস্তাব করেছিল যে, যিশুর বারো জন শিষ্যের মধ্যে জুডাস একাই কেবল প্রকৃতার্থে যিশুর উদ্দেশ্যটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখবো খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করেন , এটি ঈশ্বরেরই পরিকল্পনা ছিল যে, যিশুকে গ্রেফতার করা হবে, এবং তাকে হত্যা করা হবে, আর এর মাধ্যমে ঈশ্বর মানবতার অতীত ও ভবিষ্যতের সব পাপ ক্ষমা করবেন। জুডাসের ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ আসলেই যিশুকে ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনাটি পূর্ণ করতে সহায়তা করেছিল। তিনি যিশু এবং ঈশ্বরকেই বরং সহায়তা করেছিলেন। যদি এটি শুনতে অদ্ভুত মনে হয় (এবং এটি আসলেই অদ্ভুত) এটি এর সেই অদ্ভুত ব্যাপারটি খ্রিস্ট ধর্মের কেন্দ্রীয় ধারণাটি থেকেই সরাসরি গ্রহন করেছে: আর সেটি হচ্ছে, যিশুর মৃত্যু ছিল অত্যাবশ্যকীয় একটি বিসর্জন, যার পরিকল্পক স্বয়ং ঈশ্বর। আপনি হয়তো এখন বুঝতে পারছেন কেন কাউন্সিল অব নাইসিয়া গসপেল জুডাসকে ক্যাননে অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি।

ভিন্ন কিছু কারণে, এটি বিস্ময়কর নয় যে কাউন্সিল অব নাইসিয়া টমাসের ‘ইনফ্যান্সি’(যিশুর শৈশবের) গসপেলকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। যথারীতি, কেউই জানেন না কে এটি লিখেছিলেন। গুজবের ব্যতিক্রম, এটি সেই ‘ডাউটিং টমাসে’র কাজ নয়, সংশয়পূর্ণ যে শিষ্য যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করার আগে প্রমাণ দেখতে চেয়েছিলেন (হয়তো তাকে বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষক সেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত)। এই গসপেলে যিশুর শৈশব নিয়ে বিস্ময়কর কিছু গল্প আছে, তার জীবনের যে অংশটি পুরোপুরিভাবে আনুষ্ঠানিক ক্যানন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এই গসপেলের বিবরণ অনুযায়ী যিশু দুরন্ত আর বেশ দুষ্টু শিশু ছিলেন, যিনি তার জাদুকরী শক্তি ব্যবহার করতে কখনোই ইতস্ততা বোধ

করেননি। পাঁচ বছর বয়সে একটি নদীর পাশে খেলা করার সময় তিনি একবার নদী থেকে কাঁদা তুলে বারোটি জীবন্ত চড়ুইপাখি বানিয়েছিলেন।

১০০ বিলিয়নের চেয়েও বেশি সংখ্যক কোষ দিয়ে একটি চড়ুই পাখির শরীর তৈরি হয়। স্নায়ুকোষ, মাংসপেশীর কোষ, যকৃতের কোষ, রক্ত কণিকা, হাড়ের কোষ এবং আরো বহু শত ভিন্ন ধরনের কোষ।ঐ প্রত্যেকটি কোষই হচ্ছে অসাধারণ আর বিস্ময়কর জটিলতার ক্ষুদ্রাকৃতির একটি যন্ত্র। যেখানে একটি চড়ুই পাখির শরীরে থাকা প্রায় ২০০০ পালকের প্রত্যেকটি বিস্ময়করভাবে সূক্ষ্ম স্থাপত্য। যিশুর সময় কারোরই এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয়গুলো কেউ জানতেন না। তা সত্ত্বেও, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে বড়রা তার বিস্ময়কর কর্ম দেখে নিশ্চয়ই খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। কাদা দিয়ে এক মুহূর্তে ঐসব চড়ুই পাখির সৃষ্টি জাদুর একটি বিস্ময়কর অর্জন। কিন্তু না, জোসেফ বরং যিশুকে বকাঝকা করার উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন কারণ তিনি সাবাথের দিনে সেই কাজটি করেছিলেন। যে দিন ইহুদী আইনে যে-কোনো ধরনের কাজ করা নিষিদ্ধ। কিছু আধুনিক ইহুদী এমনকি সাবাথের দিনে লাইটের সুইচটাও নাড়ান না, সেটি করার জন্য তাদের এখন বিশেষ সময় নিয়ন্ত্রিত সুইচ আছে। আর কিছু অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে, সাবাথের দিনে লিফট প্রতিটি তলায় থামে, সুতরাং আপনার লিফটের বোতাম টিপে কোনো 'কাজ' করতে হয় না।

আর সেই বকা খাবার প্রতি যিশুর প্রত্যুত্তর ছিল, হাতে তালি দেয়া এবং বলা, 'যাও উড়ে যাও', এবং নির্দেশ মান্য করে, কিচির মিচির করতে করতে চড়ুইগুলো উড়ে গিয়েছিল।

ইনফ্যান্সি গসপেল অনুযায়ী, তরুণ যিশু এছাড়াও অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় উপায়ে তার জাদুর শক্তি ব্যবহার করেছিলেন। একটি ঘটনায় তিনি গ্রামের মধ্যে হাঁটছিলেন, তখন আরেকটি শিশুর তার পাশ দিয়ে দৌড়ে যাবার সময় তার কাধের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল। যিশু রেগে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'তুমি আর বেশি দূর যেতে পারবে না'। সেই রাতেই শিশুটি অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছিল। বোধগম্যভাবেই শোকাহত ছেলেটির বাবা-মা জোসেফের কাছে অভিযোগ করেন এবং তাকে বলেন তিনি যেন যিশুর জাদুর ক্ষমতাটিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু তাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল এমন অভিযোগে কী বিপদ হতে পারে, সাথে সাথে যিশু তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছিলেন। এর আগের একটি ঘটনায় যিশুকে একটি ছেলের উপর খুব বিরক্ত হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং পরিণতিতে শরীরটি পুরোপুরিভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল।

তবে সব ঘটনাই খারাপ নয়। একবার যখন তার এক খেলার সাথী ছাদ থেকে পড়ে মারা গিয়েছিল, যিশু তাকে আবার জীবিত করে তুলেছিলেন। তিনি এই একই উপায়ে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের জীবন বাঁচিয়েছিলেন, এবং একবার একটি মানুষকে নিরাময় করেছিলেন যে কিনা দুর্ঘটনাবশত কুড়ালের আঘাতে তার নিজের পা কেটে ফেলছিল। একদিন যিশু যখন তার কাঠমিস্ত্রী পিতাকে সহায়তা করছিলেন, দেখেছিলেন যে এক টুকরো কাঠ দৈর্ঘ্যে বেশ খানিকটা ছোটো। বেশ, এ ধরনের ছোটোখাট সমস্যার কারণে ভালো একটি কাজ নষ্ট হতে দেবার মত মানুষ যিশু ছিলেন না। তিনি শুধু জাদুর মন্ত্র পড়ে কাঠটিকে প্রয়োজন মত লম্বা করে নিয়েছিলেন।

কেউই বিশ্বাস করেন না যে, টমাসের এই ইনফ্যান্সি গসপেলে বর্ণিত আশ্চর্যজনক ঘটনাগুলো আসলেই ঘটেছিল। যিশু কাদার মূর্তিকে চড়ুইপাখিতে রূপান্তরিত করেননি, সেই শিশুটিকে হত্যা করেননি যার সাথে তার ধাক্কা লেগেছিল বা তার পিতা-মাতাকে অন্ধ করে দেননি অথবা কাঠমিস্ত্রীর দোকানে কাঠের টুকরোকে প্রয়োজনমত লম্বা করেননি। তাহলে কেন মানুষ একইভাবে অসম্ভব সব অলৌকিক ঘটনাগুলো বিশ্বাস করেন, যা আনুষ্ঠানিক ক্যাননে জায়গা পাওয়া গসপেলগুলো বর্ণনা করেছে: পানিকে মদে রূপান্তর করা, পানির উপর হাঁটা, মৃতদের জীবিত করা ইত্যাদি? তারা কি তাহলে চড়ুই পাখি বা কাঠ লম্বা করার জাদুর অলৌকিকতাকে বিশ্বাস করতেন, যদি ইনফ্যান্সি গসপেলটি ক্যানোনে আনুষ্ঠানিক গসপেলের স্বীকৃতি পেত? যদি না হয়ে থাকে এর উত্তর, তাহলে কেন না? এই চারটি গসপেলের ক্ষেত্রে বিশেষ কী আছে, ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নাইসিয়ায় এক দল বিশপ বা ধর্মতাত্ত্বিকদের দ্বারা যেগুলো শুধু দৈবক্রমে আনুষ্ঠানিক ক্যাননের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল? কেন এ দুই ধরনের আচরণ?

এই দ্বিমুখি আচরণের আরো একটি উদাহরণ। ম্যাথিউ আমাদের বলেছেন যে, ক্রুশের উপর যিশুর মৃত্যুর সেই সুনির্দিষ্ট মুহূর্তে জেরুজালেমে মন্দিরে একটি বিশাল পর্দা ঠিক মাঝখান থেকে দ্বি-বিভক্ত হয়েছিল, পৃথিবী কেপে উঠেছিল, কবর ভেঙ্গে গিয়েছিল, মৃতরা রাস্তায় হাটতে শুরু করেছিল। তাহলে আনুষ্ঠানিক গসপেল অনুযায়ী, পুনরুত্থানের বিষয়টি যিশুর জন্য তাহলে খুব স্বতন্ত্রভাবে অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। কাজটি যিশুর করার মাত্র তিনদিন আগে আসলেই বহু মানুষ তাদের কবর ফুড়ে বের হয়ে এসেছিলেন এবং যারা জেরুজালেমের রাস্তায় হাটছিলেন। আসলেই কী খ্রিস্টানরা সেটি বিশ্বাস করেন? যদি না করে থাকেন, তাহলে কেন না? কারণ যিশুর পুনরুত্থানের বিষয়টিকে বিশ্বাস করা এবং না করার একই পরিমান কারণ (অথবা আরো সুনির্দিষ্টভাবে

একই পরিমানে কম কারণ আছে) আছে। আর বিশ্বাসীরা কীভাবে সিদ্ধান্ত নেন কোন কল্পিত ঘটনাটি তারা বিশ্বাস করবেন আর কোনটিই বা তারা প্রত্যাখ্যান করবেন?

আমি যা উল্লেখ করেছিলাম, অধিকাংশ ইতিহাসবিদ (যদিও সবাই না) মনে করেন যে যিশুর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এটি বেশি কিছু ব্যাখ্যা করে না। 'জেসুস' (ইয়েসুস-জিসাস-যিশু) নামটি হিব্রু নাম জোশুয়া অথবা ইয়েশুয়ার একটি রোমান রূপ। এটি খুব সাধারণ প্রচলিত একটি নাম ছিল এবং সেই সময় ভ্রাম্যমান ধর্মপ্রচারকের সংখ্যাও কম ছিল না। সুতরাং অসম্ভব নয় যে, ইয়েশুয়া নামে কোনো ধর্মপ্রচারক ছিলেন। এই নামে আরো অনেকেই থাকতে পারেন। যা বিশ্বাসযোগ্য নয় সেটি হচ্ছে তাদের কেউ পানিকে মদে রূপান্তর করেছিলেন (বা কাদা থেকে চড়ুই), পানির উপর হেঁটেছিলেন (অথবা কাঠের একটি টুকরো প্রয়োজন মত দীর্ঘ করেছিলেন), এবং যার জন্ম হয়েছিল কোনো কুমারী মায়ের গর্ভে, অথবা তিনি মৃত্যুর পর আবার জীবিত ফিরে এসেছিলেন। আর আপনি যদি এই সব কিছু বিশ্বাস করতে চান, আপনার জন্যে ভালো হবে বর্তমানে লভ্য এমন প্রমাণের চেয়ে আরো উত্তম কোনো প্রমাণ অনুসন্ধান করা। যেভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সেগান বলেছিলেন, 'অসাধারণ কোনো দাবির জন্য অসাধারণ প্রমাণ প্রয়োজন'। তিনি হয়তো বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ লাপ্লাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন, 'অসাধারণ কোনো দাবীর জন্যে প্রমাণের ভার অবশ্যই এর অসাধারণত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে'।

'জেসুস' (যিশু) নামে একজন ভ্রাম্যমান ধর্মপ্রচারক কারো অস্তিত্ব ছিল - এটি যদিও আসাধারণ কোনো দাবি নয়। এবং প্রমাণ, যদিও 'সামান্য' তবে সেই 'অনুপাতে' বিদ্যমান: ছোটো দাবির জন্যে ছোটো প্রমাণ। ইয়েশুয়ার সম্ভবত অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তার মা একজন কুমারী নারী ছিলেন, এবং তিনি মৃত্যুর পর থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সমাধি থেকে বের হয়ে এসেছিলেন, এই দাবিগুলো আসলেই অতিমাত্রায় অসাধারণ কিছু দাবি। সুতরাং এর জন্য প্রমাণগুলোকেও সেই পরিমানে ভালো হতে হবে। আর এ প্রমাণগুলো আসলেই যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম অলৌকিক ঘটনাগুলো নিয়ে কিছু প্রস্তাবনা করেছিলেন আর সেগুলো নিয়ে খানিকটা আলোচনা করতে চাই কারণ এটি গুরত্বপূর্ণ। আমি এটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করবো। যদি কেউ দাবী করেন যে, তিনি কোনো অলৌকিক ঘটনা দেখেছেন - যেমন, অলৌকিক কোনো দাবী করেন যে, যিশু তার সমাধি থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে

এসেছিলেন, অথবা বালক যিশু কাদাকে চড়ুইপাখিতে রূপান্তরিত করেছিলেন, এখানে দুটি সম্ভাবনা আছে।

> সম্ভাবনা ১ : এটি আসলেই ঘটেছিল।
>
> সম্ভাবনা ২: যিনি সাক্ষী তিনি ভুল করেছেন - অথবা মিথ্যা কথা বলছেন অথবা কল্পনা করেছেন, অথবা ভুল ব্যাখ্যা করছেন, অথবা কোনো জাদুর কৌশল দেখেছেন ইত্যাদি।

আপনি হয়তো বলতে পারেন: 'এই সাক্ষী এত বেশি নির্ভরযোগ্য যে আমি আমার জীবন দিয়ে তাকে বিশ্বাস করি, এবং এছাড়াও আরো অনেক সাক্ষী আছে - যদি তিনি মিথ্যা বলেন থাকেন কিংবা ভুল করে থাকেন সেটাই বরং একটি "অলৌকিক" ঘটনা হবে'। কিন্তু হিউম এর প্রত্যুত্তর দিতেন এভাবে: 'বেশ, সবই ঠিক আছে, কিন্তু এমনকি যদিও আপনি ভাবছেন যে 'সম্ভাবনা ২' একটি অলৌকিক ঘটনা হবে, তারপরও নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন যে 'সম্ভাবনা ১' এমনকি আরো বেশি অলৌকিকতাপূর্ণ। যখন আপনার কাছে বাছাই করার জন্য দুটি সম্ভাবনা থাকবে, সবসময় অপেক্ষাকৃত কম অলৌকিকতাপূর্ণ সম্ভাবনাটি নির্বাচন করুন।

আপনি কী আসলেই কখনো মন্ত্রমুগ্ধ করে দেবার মতো কোনো 'জাদুকর' দেখেছেন? যেমন, ডারেন ব্রাউন কিংবা জ্যামি আয়ান সুইস অথবা ডেভিড কপারফিল্ড অথবা জেমস র‍্যান্ডি অথবা পেন অ্যান্ড টেলার? তাদের হতবাক করে দেয়ার মত রহস্যময় জাদুর কৌশল দেখে আপনার ভিতরের কণ্ঠস্বর চিৎকার হয়তো চিৎকার করে বলবে, 'এটি অবশ্যই অলৌকিক ঘটনা, এটি অতিপ্রাকৃত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না'। কিন্তু তারপর, যদি জাদুকর নিজেই সৎ হয়ে থাকেন, তিনি আপনাকে খুব নম্র ও শান্ত স্বরে বলবেন, "না, এটি শুধুমাত্র একটি কৌশল, কিন্তু কীভাবে এটি করা হয়েছে সেটি অবশ্যই আপনাকে আমি বলতে পারবো না, যদি তেমন কিছু আমি করি তাহলে আমাকে 'ম্যাজিক সার্কল' থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে, কিন্তু আমি আপনাকে প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে, এটি জাদুর একটি কৌশল মাত্র"।

প্রসঙ্গক্রমে জেনে রাখা ভালো, সব জাদুকর সৎ নয়। কেউ যেমন প্রচুর উপার্জন করেন তথাকথিত 'সাইকিক' ক্ষমতাবলে চামচ বাঁকাতে পারার দাবি করে। এবং তারপর অসৎভাবে কোনো খনি কোম্পানিকে প্ররোচিত করতে পারেন, তিনি সাইকিক ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদের বলে দেবেন কোথায় মাটি খনন

করতে হবে। আর এই সব প্রতারকরা বেশ সহজেই তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেন, কারণ তাদের শিকাররা অলৌকিকতায় বিশ্বাস করতে অতিআগ্রহী।

কখনো কখনো খুব সহজেই বোঝা সম্ভব কীভাবে জাদুর এই কৌশলগুলো করা হয়। সাইকিক ক্ষমতা - টেলিপ্যাথি ইত্যাদির সমর্থন করা ব্রিটিশ টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানের কথা আমি স্মরণ করতে পারি। আসলেই এটি সাধারণ কিছু জাদুকরের কৌশলে এই অনুষ্ঠানটির উপস্থাপক ডেভিড ফ্রস্টকে বোকা বানানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ডেভিড ফ্রস্ট হয় খুবই বোকা অথবা - খুব সম্ভবত এ অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা বাড়ানোর খাতিরে বোকা সাজার ভান করতেন। ইজরায়েল থেকে পিতা-পুত্রের একটি উপস্থাপনা ছিল, যেখানে পুত্র দাবী করেছিল সে নাকি তার পিতার চিন্তা 'টেলিপ্যাথির' মাধ্যমে পড়তে সক্ষম। পিতা একটি গোপন সংখ্যার দিকে তাকিয়েছিলেন এবং চিন্তার একটি ঢেউ যে মঞ্চের অন্য দিকে উপবিষ্ট তার পুত্র বরাবর প্রেরণ করেছিলেন, যিনি কিনা সঠিকভাবে তার 'চিন্তা পড়তে' পারেন। পিতা বেশ নাটকীয়তার সাথে গভীর মনোযোগ প্রদর্শনের আচরণ করেন, এবং 'তুমি কী পেয়েছ, পুত্র'? এমন কিছু চিৎকার করে বলেছিলেন, যা শুনে পুত্রও চিৎকার করে উত্তর দিয়েছিল, 'পাঁচ'! উপস্থিত দর্শকরা তুমূল হর্ষধ্বনিতে বিস্ফোরিত হয়েছিলেন, যা আরো উস্কে দিয়েছিল অনুষ্ঠারটির বোকা উপস্থাপক এমন কিছু বলে: 'বিস্ময়কর, রহস্যময়, গভীরভাবে রহস্যময়, টেলিপ্যাথি প্রমাণিত'!

আপনি কী বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা আমি আপনাকে খানিকটা ধারণা দেই। যদি গোপন সংখ্যা আট হয়ে থাকে, বাবা হয়তো তার চিৎকারের সময় এমন কিছু বলবেন, 'কী মনে হচ্ছে তোমার, সংখ্যাটি কী সেটি বলতে পারবে, পুত্র'? যদি গোপন সংখ্যাটি তিন হয়, তাহলে তার বাবার চিৎকারটি হতে পারে, 'বুঝতে পেরেছো, পুত্র'?, যদি সংখ্যাটি চার হয় তাহলে এরকম, 'তুমি পেলে উত্তরটি, পুত্র'? কিন্তু আমার মূল বক্তব্যটি হচ্ছে, এমনকি যদি জাদুকর আসলেই খুব ভালো জাদুকর হয়ে থাকেন (এই পিতা-পুত্র যুগলের ব্যতিক্রম) এবং যদি আপনি কোনোভাবেই অনুমান করতে পারেন না যে, কীভাবে কারসাজিটি করা হয়েছে, তারপরও কিন্তু এটি একটি কারসাজি - জাদুর কৌশল। কোনো কারণ নেই হাল ছেড়ে দিয়ে এমন কিছু বলা যে, 'অবশ্যই এটিকে একটি অলৌকিক ঘটনা হতে হবে'। হিউমের মত চিন্তা করুন।

আসুন হিউমের যুক্তিটি বিখ্যাত জাদুকরী কৌশলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, দুটি 'সম্ভাবনাকে' নুতন করে নাম দেই - 'অলৌকিক ঘটনা'।

অলৌকিক ঘটনা ১: জাদুকর আসলেই মহিলাকে করাত দিয়ে কেটে দুটি টুকরো করেছেন। জাদুকর যুগল পেন অ্যান্ড টেলার আসলে তাদের দাঁত দিয়ে দুজনের হাতের বন্দুক থেকে পরস্পরের দিকে ছোড়া গুলিটি ধরেছিলেন। ডেভিড কপারফিল্ড আসলে আইফেল টাওয়ারকে অদৃশ্য করে দিয়েছিলেন, জেমস র‍্যান্ডি আসলেই একজন ব্যক্তির পেটে মধ্যে তার খালি হাত ঢুকিয়ে নাড়িভুড়ি টেনে বের করে এনেছিলেন।

অলৌকিক ঘটনা ২: আপনার চোখ আপনাকে ধোকা দিয়েছে এমনকি যখন আপনি জাদুকরের প্রতিটি পদক্ষেপ বাজপাখির একাগ্রতা নিয়ে লক্ষ করেছেন, সুতরাং কোনো কিছু আপনার চোখ এড়িয়ে যাওয়াটাই 'অলৌকিক' মনে হতে পারে।

যতই আপনি প্রতিবাদ করতে চান না কেন, আমি মনে করি আপনি একমত হবেন যে 'অলৌকিক ঘটনা ২' অপেক্ষাকৃভাবে অনেক কম অলৌকিক একটি ঘটনা। এই অপেক্ষাকৃত কম অলৌকিক ঘটনাটিকে আপনাকে সম্ভাব্য বলে নির্বাচন করতে হবে, এবং হিউমের মতোই উপসংহারে পৌঁছাতে হবে: অলৌকিক ১ কখনোই ঘটেনি। আপনি প্রতারিত হয়েছেন।

কখনো 'অলৌকিক ঘটনা ১', কথিত সত্য অলৌকিক ঘটনাকে সত্য প্রতিপন্ন করে বহু সংখ্যক সাক্ষী। হয়তো সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনাটি হচ্ছে ফাতিমায় আওয়ার লেডি - যিশুর মা মেরির আত্মার আবির্ভাব।

১৯১৭ সালে পর্তুগালের ফাতিমায়, তিনটি শিশু দাবী করেছিল কুমারী মেরির আত্মা তাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের একজন, লুসিয়া, দাবি করেছিল, মেরি তার সাথে কথা বলেছেন এবং অক্টোবর মাস অবধি প্রতি মাসে ১৩ তারিখে একই জায়গায় তিনি ফিরে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন, এবং অক্টোবরের ১৩ তারিখে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে তিনি কে তার প্রমাণ দেবেন। পর্তুগাল জুড়েই এই কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং ১৩ অক্টোবর সেখানে প্রায় সত্তর হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষের সমাবেশ হয়েছিল মেরির প্রতিশ্রুত অলৌকিক ঘটনাটি চাক্ষুষ দেখতে। এবং নিশ্চিতভাবে, সাক্ষীদের ভাষ্য অনুযায়ী, এটি ঘটেছিল। কুমারী মেরি লুসিয়ার সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন (অন্য আর কারো সামনে নয়), যখন লুসিয়া উত্তেজিতভাবে সূর্যের দিকে তার আঙ্গুল নির্দেশ করেছিল। তারপর ..

মনে হয়েছিল যেন সূর্যটি আকাশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এবং খুব দ্রুত গতি এগিয়ে আসতে শুরু করেছিল ভীত সন্ত্রস্ত উপস্থিত মানুষগুলোর দিকে,

ঠিক যখনই মনে হয়েছিল আগুনের এই গোলকটি তাদের উপর আছড়ে পড়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে, সেইঅলৌকিক ঘটনাটি ঘটা হঠাৎ করেই থেমে গিয়েছিল, এবং সূর্য আকাশে তার নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে এসেছিল, এবং চিরকালের মত শান্তিপূর্ণভাবে এর আলো বিতরণ করা অব্যাহত রেখেছিল।

রোমান ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাসীরা এই ঘটনাটিকে খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহন করেছিলেন (তাদের অনেকেই এখনো সেভাবে ভাবেন)। তারা এটিকে একটি আনুষ্ঠানিক অলৌকিক ঘটনা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৮১ সালে যখন পোপ জন পল (দ্বিতীয়) খুব অল্পের জন্য আততায়ীর বুলেটে আক্রমণ থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তাকে রক্ষা করেছিলেন 'আওয়ার লেডি অব ফাতিমা', যিনি 'বুলেটটির দিক পরিবর্তন করেছিলেন' আর সেকারণে বুলেটটি তাকে হত্যা করতে পারেনি। লক্ষ করুন শুধুমাত্র 'আওয়ার লেডি' নয়, কিন্তু বিশেষভাবে 'আওয়ার লেডি অব ফাতিমা'। এর মানে কী ক্যাথলিকরা বহু সংখ্যক ভিন্ন 'আওয়ার লেডি' বিশ্বাস করেন? প্রথম অধ্যায়ে আমি যতটা প্রস্তাব করেছিলাম, তারা কী তার চেয়েও বেশি বহু-ঈশ্বরবাদী। শুধু একজন 'মেরি' নয় বরং বহু সংখ্যক 'মেরি', পাহাড়ী কোনো এলাকা বা গুহায় তার আত্মা প্রতিটি আবির্ভাবের জন্য একটি করে।

২০১৭ সালে নিউ ইয়র্কের রোমান ক্যাথলিক চার্চের অক্সিলারি বিশপ ডমিনিক লাগোনেগ্রো একটি ধর্ম-বক্তৃতায় তার এক খালার উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছিলেন, যিনি ফাতিমার সেই ঘটনাটির একজন চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন। তার বিবরণ অনুযায়ী, সুর্য উপর নীচ, সামনে পেছনে নাড়াচড়া করে উঠেছিল, প্রায় মনে হতে পারে যেন এটি নাচছিল, 'শুধু ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট মা মেরি ছাড়া সূর্যকে এভাবে আর কে নাচাতে পারবে', (বিশপ লাগোনেগরো) হেসেছিলেন, 'কিন্তু তারপর এটি আকারে বিশাল বড় হয়ে উঠেছিল এবং 'পৃথিবীর দিকে আসতে শুরু করেছিল', বিশপ বলা অব্যাহত রাখেন, 'আমার খালার স্মরণ করতে পারেন যে, তখন মনে হচ্ছিল যেন সবার কাপড় সূর্যের হলুদ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কয়েক মিনিটের জন্য এটি পৃথিবীর দিক এর পতন অব্যাহত রেখেছিল', তিনি বলেছিলেন তার খালা গল্প অনুসারে, 'এবং তারপর এটি থেমে যায়' এবং এর কক্ষপথে আবার ফিরে গিয়েছিল।

এর 'কক্ষপথ'? কোন 'কক্ষপথ' হতে পারে সেটি? এবং 'কয়েক মিনিটের জন্যে এটি পৃথিবী বরাবর পড়তে শুরু করেছিল', 'কয়েক মিনিটের' জন্যে? এই ঘটনাটি আসুন হিউম দিয়ে বিশ্লেষণ করি।

অলৌকিক ঘটনা ১: আসলেই সূর্য আকাশে তার অবস্থান পরিবর্তন করেছিল এবং তার সরাসরি সেখানে জমায়েত মানুষগুলোর দিকে ধেয়ে এসেছিল, বেশ কয়েক মিনিটের জন্য তারা দেখতে পেয়েছিলেন এটি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

অলৌকিক ঘটনা ২: ৭০০০০ চাক্ষুষ সাক্ষী ভুল দেখেছেন বা মিথ্যা বলছেন বা ভুল তথ্য দিয়েছেন।

'অলৌকিক ২' আসলেই একটি অলৌকিক ঘটনার মত মনে হয়, তাই নয় কি? সত্তর হাজার মানুষ একই সাথে সবাই মিলে একই দৃষ্টি বিভ্রমের শিকার হয়েছিলেন? অথবা, সবাই মিলে একই মিথ্যা বলেছিলেন? নিশ্চয়ই এটি দানবীয় আকারের একটি অলৌকিক ঘটনা হবারই কথা? আর তেমনই মনে হয়েছিল। কিন্তু এর বিকল্পটি বিবেচনা করুন, অলৌকিক ১, যদি সূর্য আসলেই এর অবস্থান পরিবর্তন করে, পৃথিবীর যে অংশে তখন দিন ছিল, এই ঘটনাটি সবার চোখেই কী ধরা পড়ার কথা ছিল না? শুধুমাত্র পর্তুগালে একটি মাত্র গ্রামের বাইরে জড়ো হওয়া সেই মানুষগুলো ছাড়াও আরো অনেকেরই সেটি দেখার কথা? আর যদি এটি সত্যি অবস্থান পরিবর্তন করে থাকে (অথবা পৃথিবী নড়েছিল যেন মনে হয়েছিল সূর্যও নড়ছে), এটি ভয়াবহ মহাপ্রলয়ের সূচনা করার কথা, এটি পৃথিবীকে ধ্বংস করতো তো বটেই এবং একই সাথে আরো কিছু গ্রহকেও ধ্বংস করতো। বিশেষ করে যদি কয়েক মিনিটের জন্য এটি পৃথিবী বরাবর পড়তে থাকে।

সুতরাং হিউম অনুসারে, আমরা অপেক্ষাকৃত কম অলৌকিক ঘটনাটিকে বেছে নেবো, এবং উপসংহারে পৌঁছাবো, ফাতিমার সেই বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনাটি আসলেই কখনো ঘটেনি।

আসলেই, অলৌকিক ২ যতটা অলৌকিক তার চেয়েও বেশি অলৌকিক প্রস্তাব করে। আমি কি খুব বেশি ছাড় দিচ্ছি, আসলেই কী সেখানে ৭০০০০ মানুষ উপস্থিত ছিলেন? এত বড় একটি সংখ্যার কী কোনো ঐতিহাসিক রেকর্ড আছে? আমাদের নিজস্ব এই সময়ে এই ধরনের সংখ্যাগুলোকে প্রায়শই অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমন দাবি করেছিলেন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তার শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে দেড় মিলিয়ন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আলোকচিত্রের প্রমাণগুলো প্রদর্শন করেছে যে, এমন দাবি মূলত খুব বেশি মাত্রার একটি অতিরঞ্জন। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে এমনকি যদিও সত্তর হাজার মানুষ আসলেই ফাতিমায় জড়ো হয়েও থাকেন, তাদের কতজন আসলে দাবি করতে

পারবেন যে, তারা আকাশে সূর্যকে এভাবে নড়তে দেখেছেন? হয়তো অল্প কয়েকজন সেটি দাবি করতে পারেন, আর চাইনিজ হুইজপার সদৃশ একটি কানকথা প্রভাবের কারণে এই সংখ্যাটি ফুলে ফেপে অনেক বড় হয়ে উঠেছিল। আপনি যদি সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন, যেভাবে লুসিয়া তাদের নির্দেশ দিয়েছিল (প্রসঙ্গক্রমে এমন কিছু করবেন না, এটি আপনার চোখের জন্য ভালো নয়), আপনি হয়তো হালকা নড়াচড়া দেখতে পাবার একটি বিভ্রমে আক্রান্ত হতে পারেন। তার সেই নড়াচড়ার পরিমান, এবং যারা এটি দেখেছে বলে দাবি করেছিলেন সেই সংখ্যাটি 'চাইনিজ হুইজপার' প্রভাবে আরো অতিরঞ্জিত হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে ঐসব বিবেচনাগুলো নিয়ে আমাদের বেশি বিচলিত হবার কোনো দরকার নেই। এমনকি যদি সত্তর হাজার মানুষ আসলেই দাবী করে থাকেন যে, তারা সেই দিন সূর্যকে এর অবস্থান থেকে নড়ে উঠতে আর পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতে দেখেছিলেন, আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি সেটি ঘটেনি কারণ এই গ্রহটি সেদিন ধ্বংস হয়ে যায়নি, এবং ফাতিমার বাইরে কোনো মানুষই এটিকে নড়তে দেখেননি। এই দাবীকৃত অলৌকিক ঘটনাটি নিশ্চিতভাবেই কখনো ঘটেনি, এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে সত্যায়িত করে খুবই বোকার মত একটি কাজ করেছিল।

ঘটনাক্রমে, বুক অব জশুয়ায় একই রকম একটি অলৌকিক ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। হয়তো এই ঘটনাটি লুসিয়াকে তার নিজস্ব একটি সংস্করণ উদ্ভাবন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইজরায়েলাইটদের নেতা জশুয়া প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলোর সাথে তার বহু যুদ্ধে একটিতে যুদ্ধরত ছিলেন এবং বিজয় নিশ্চিত করার জন্যে তার খানিকটা বেশি সময়ের দরকার পড়েছিল। কী করা যায়? অতি সুস্পষ্ট এক সমাধান, সেই সময়ে আপনি সরাসরি ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে পারতেন। জশুয়ার শুধু ঈশ্বরকে অনুরোধ করতে হয়েছিল, যেন তিনি সূর্যকে আকাশে স্থির অবস্থানে দাড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে রাতের আগমনকে খানিকটা বিলম্বিত করেন। ঈশ্বর তার অনুরোধ পূর্ণ করেছিলেন, এবং সূর্য স্থির হয়ে দাড়িয়ে পড়েছিল, জশুয়াকে যা বাড়তি একটি দীর্ঘ দিন দিয়েছিল, যুদ্ধ জয় করার জন্য যে সময়ের তার প্রয়োজন ছিল। অবশ্যই এই অলৌকিক ঘটনা আসলেই কখনো ঘটেনি। কোনো সত্যিকারের গবেষক চিন্তাও করবেন না যে এটি ঘটেছিল। কিন্তু বহু মৌলবাদী খ্রিস্টান বাইবেলের প্রতিটি শব্দকে আক্ষরিক সত্য হিসাবে বিশ্বাস করতে আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে থাকেন। আর জশুয়ার এই দীর্ঘ দিনটি সত্য বলে প্রমাণ করার জন্যে কীভাবে মরিয়া হয়ে তারা বিচিত্র

কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, সেটি আপনি এখনো মৌলবাদীদের ওয়েবসাইটগুলোয় খুঁজে পাবেন।

বুক অব জশুয়া অবশ্যই ওল্ড টেস্টামেন্টে অন্তর্ভুক্ত বইগুলোর একটি। আমরা এখন মূল ওল্ড টেস্টামেন্টের দিকে নজর দেবো, এবং জানতে চাইবো সেখানে বর্ণিত কাহিনীগুলো আদৌ সত্য কিনা।

৩ পুরাণ, আর কীভাবে সেগুলো শুরু হয়েছিল

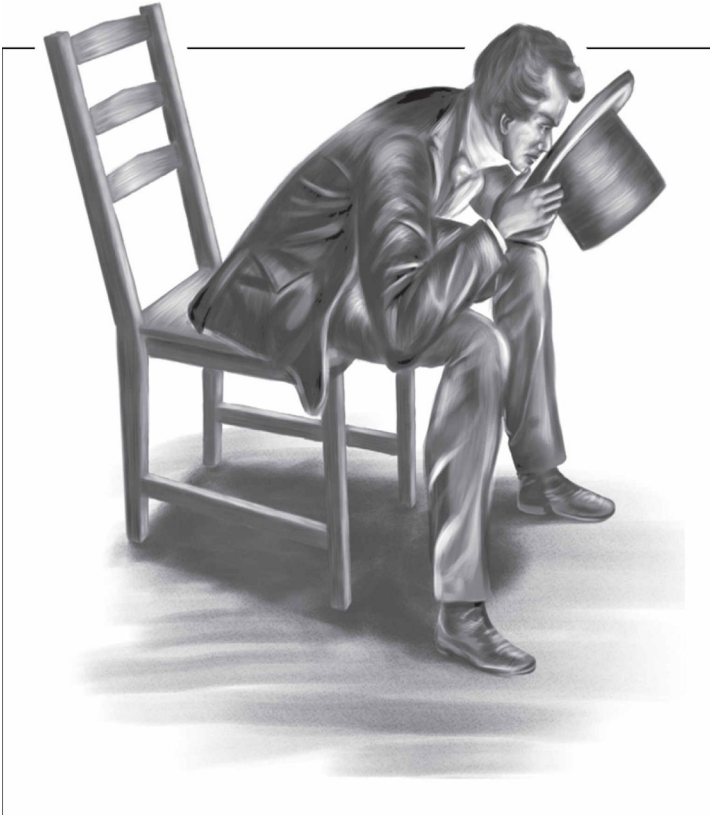

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি মূলত নিউ টেস্টামেন্ট নিয়ে কথা বলেছিলাম। যা ওল্ড টেস্টামেন্টের চেয়ে আরো সাম্প্রতিক সময়ের বিষয়গুলো বর্ণনা করেছে। ইতিহাস হবার জন্য এটাই ছিল বাইবেলের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা। আমি ওল্ড টেস্টামেন্ট নিয়ে আলোচনা করে বেশি সময় নষ্ট করবো না। এটি আমাদের আরো বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন পুরাণ আর কিংবদন্তীর জগতে নিয়ে যাবে। এবং বাইবেল বিশেষজ্ঞরা এটিকে ইতিহাস হিসাবে গুরুত্ব দেন না। কিন্তু পুরাণগুলো কৌতূহলোদ্দীপক এবং এদের নিজস্ব অধিকারেই গুরুত্বপূর্ণ। এবং পুরাণগুলো পর্যবেক্ষণ এবং কীভাবে এসব শুরু হয়েছিল সেটি বিশ্লেষণ করতে এই অধ্যায়টি ওল্ড টেস্টামেন্টকে একটি সূচনা বিন্দু হিসাবে ব্যবহার করবে।

আব্রাহাম ছিলেন ইহুদী জনগোষ্ঠীর মূল 'প্যাট্রিয়ার্ক' বা গোত্রপিতা, এবং বর্তমান পৃথিবীর তিনটি প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা - ইহুদীবাদ, খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম। কিন্তু আসলেই কী তার অস্তিত্ব ছিল? যেমন, অ্যাকিলিস আর হারকিউলিস কিংবা রবিন হুড আর কিং আর্থার, সেটি জানা অসম্ভব এবং তার যে অস্তিত্ব ছিল তেমন কিছু ভাবারও সুস্পষ্ট কোনো কারণ নেই। আবার অন্যদিকে, আব্রাহামের অস্তিত্ব অসাধারণ কোনো দাবী নয়, যার জন্য অসাধারণ কোনো প্রমাণের দরকার আছে। জোশুয়ার সেই সূর্যের স্থির হয়ে থাকা 'দীর্ঘ' দিন অথবা মৃত্যুর যিশুর পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠা, অথবা বড় একটি মাছের পেটে জোনাহ'র তিন দিন কাটানোর তুলনায় আব্রাহামের অস্তিত্ব - অথবা অনস্তিত্ব - কোনো বড় বিষয় নয়। শুধুমাত্র কোনো দিক বরাবরই এর কোনো প্রমাণ নেই। ইহুদী ইতিহাসে আরেক মহান বীর রাজা ডেভিডের ক্ষেত্রেও এটি একই ভাবে প্রযোজ্য। বাইবেলের বাইরে প্রত্নতত্ত্ব কিংবা লিখিত ইতিহাসে ডেভিড তার কোনো ছাপ রেখে যাননি। এটি প্রস্তাব করছে যে, যদি তার আদৌ কোনো অস্তিত্ব থেকে থাকে, তিনি সম্ভবত স্থানীয় গৌন একজন গোত্র-নেতা ছিলেন, কিংবদন্তী কিংবা লোকসঙ্গীতে প্রশংসিত মহান কোনো রাজা নন।

আর সঙ্গীতের কথা যখন বলছি, 'সং অব সলোমন' ('সং অব সংস' নামেও যা পরিচিত, এর যা আরো ভালো শিরোনাম, কারণ এটি অবশ্যই রাজা সলোমনের লেখা নয়) বাইবেলের একমাত্র রোমাঞ্চকর (এবং যৌনতাপূর্ণ) বই। কাউন্সিল অব নাইসিয়া কীভাবে এটি আনুষ্ঠানিক ক্যানোনে সংযুক্ত করার অনুমতি দিয়েছিল সেটি আসলেই বিস্ময়কর মনে হতে পারে। এই বইটির কিছু অদ্ভুত বিষয় আছে। কিং জেমস বাইবেল, বাইবেলের সবচেয়ে বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদে এই বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠার উপরে একটি মন্তব্য ব্যাখ্যা আছে। এই 'সং অব সংস' একজন নারী এবং পুরুষের মধ্যে যৌন ভালোবাসার চমৎকার একটি

অভিব্যক্তি। কিন্তু পৃষ্ঠার উপরে সংযুক্ত করা খ্রিস্টীয় ব্যাখ্যাটি আমাদের কী বলছে? 'খ্রিস্ট এবং চার্চের পারস্পরিক ভালোবাসা', অমূল্য হঠকারিতা, এবং ধর্মতাত্ত্বিকরা কীভাবে চিন্তা করেন তার বৈশিষ্ট্যসূচক সুস্পষ্ট একটি উদাহরণ: আসলেই যা বলা হচ্ছে সেটি উপেক্ষা করুন, ভান করুন, একটি প্রতীকী বা রূপক হিসাবে উপস্থাপন করাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য।

কিং জেমস বাইবেলে কিছু অসাধারণ সুন্দর ইংরেজি পাঠ্যাংশ আছে। ইক্লেজিয়াস্টেস সং অব সংসের মতোই সমপরিমানে হৃদয়গ্রাহী, যদিও এর কবিতা নিরানন্দ এবং জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ। আপনি যদি বাইবেলে আর কিছুই না পড়েন, আমি এই দুটি বই পড়তে উপদেশ দেবো: ইক্লেজিয়াস্টেস এবং সং অব সংস। কিন্তু কিং জেমস সংস্করণটি যেন আপনি পড়েন সেটি নিশ্চিত করতে হবে। আধুনিক ইংরেজিতে অনুবাদ করলে এটি এর হৃদয়স্পর্শী বৈশিষ্ট্যটি হারিয়ে ফেলে, অর্থাৎ এটিকে আর কবিতা মনে হয় না। মূল হিব্রু কী বলেছে সেটি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সত্য একটি ধারণা পেতেও এই দুটি বই আপনাকে সহায়তা করবে। আর সেটি সম্ভবত আপনাকে বুঝতে সহায়তা করবে, আপনি যেন না বুঝতে পারেন ধর্মীয় শিক্ষকরা হয়তো সেটাই শ্রেয়তর বলে মনে করেন। আপনি যদি না জানেন আমি এর দ্বারা কী বোঝাতে চাইছি, তাহলে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করুন।

ইক্লেজিয়াস্টেস এবং সং অব সংস, আমার প্রিয় ঐ দুটি বই, ইতিহাস হবার জন্য কোনো ভান করে না। ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্য বইগুলো যেভাবে করে থাকে, যেমন, জেনেসিস, এক্সোডাস, কিংস অ্যান্ড ক্রোনিকলস। জেনেসিস, এক্সোডাস, লেভিটিকাস, নাম্বার্স আর ডিউটেরোনমিকে খ্রিস্টানরা 'পেন্টাটিউখ' বলেন, ইহুদীরা বলেন 'টোরাহ'। ঐতিহ্য দাবী করে যে, এগুলোর লেখক ছিলেন স্বয়ং মোজেস, তবে অবশ্যই কোনো সত্যিকারের গবেষকই সেটি মনে করেন না। 'রবিন হুড অ্যান্ড হিস মেরি মেন' অথবা 'কিং আর্থার অ্যান্ড হিস নাইটস অব দ্য রাউন্ড টেবল' যেমন। হয়তো অস্পষ্ট কোনো সত্যের খণ্ডাংশ পেন্টাটিউখের ভিতরে লুকিয়ে আছে, কিন্তু সেখানে এমন কিছু নেই যা কিনা আপনি সত্যিকারের ইতিহাস বলতে পারবেন।

ইহুদী জনগোষ্ঠীর বংশঐতিহ্যের মহান পুরাণটি হচ্ছে মিশরে অবস্থানকালীন তাদের বন্দীদশা এবং ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত ভূমিতে তাদের বীরোচিতভাবে পালিয়ে আসা। প্রতিশ্রুত ভূমিটি ইজরায়েল, প্রবাদের সেই 'দুধ আর মধু প্রবাহিত হওয়া' সমৃদ্ধশালী একটি ভূখণ্ড, যে ভূমিটি ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদের হবে, এবং যে ভূখণ্ডটি অধিগ্রহন করতে তারা সেখানে ইতোমধ্যে বসবাসরত

গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী বহু যুদ্ধ করেছিল। বাইবেল মোহাচ্ছন্ন তীব্রতায় এই কিংবদন্তী বহু বার পুনরাবৃত্তি করেছে। মিশর থেকে ইহুদীদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে মহাঅভিপ্রয়ানে যে নেতা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দাবী করা হয়, তিনি ছিলেন মোজেস। সেই একই মোজেস, বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বই যিনি লিখেছিলেন বলেও তারা বিশ্বাস করেন।

আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, এমন বিশাল একটি ঘটনা, যেমন পুরো একটি জাতির দাসত্ব, এবং প্রজন্ম পরে জাতিটির মহাঅভিনিষ্ক্রমণ প্রত্নতাত্ত্বিক ও মিশরের লিখিত ইতিহাসে কিছু না কিছু চিহ্ন রেখে গেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই দুই ধরনের কোনো প্রমাণ সেখানে পাওয়া যায়নি। মিশরে ইহুদী জনগোষ্ঠীর বন্দীত্ব সংক্রান্ত কোনো প্রমাণ নেই। সম্ভবত এটি কখনোই ঘটেনি, যদিও এই কিংবদন্তী ইহুদী সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত। যখনই বাইবেল ঈশ্বর বা মোজেসের কথা উল্লেখ করেছে, তাদের নামের পরে 'যিনি তোমাদের মিশর থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছিলেন'' বা তেমন কোনো সমতুল্য বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতি বছর তাদের 'ফিস্ট অব পাসওভারের' সময় ইহুদী জনগোষ্ঠী মিশর থেকে তাদের কথিত এই পলায়ন স্মরণ করে থাকেন। গল্প কিংবা সত্য ঘটনা যা-ই হোক না কেন, এটি খুব সুন্দর কোনো কাহিনী নয়। ঈশ্বর চেয়েছিলেন মিশরীয় রাজা, ফারাও, তার ইজরায়েলাইট দাসদের মুক্ত করে দেবেন। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন অলৌকিকভাবে ফারাওর মন পরিবর্তন করা ক্ষমতা নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরের এখতিয়ারের মধ্যে থাকার কথা। তবে খুবই পরিকল্পিতভাবে ঈশ্বর ঠিক এর বিপরীতটাই করেছিলেন, আমরা সেটি কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবো। কিন্তু প্রথমে তিনি ধারবাহিকভাবে দশটি প্লেগ বা মহাবিপর্যয় বা মড়ক প্রেরণ করে মিশর সম্রাটের উপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন, যতক্ষণ অবধি ফারাও হাল ছেড়ে না দেন এবং ইজরায়েলাইট দাসদের মুক্তি দেন। এই মড়কগুলোর মধ্যে ছিল ব্যাঙের মড়ক, যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়ার মড়ক, পঙ্গপালের মড়ক, তিন-দিন ব্যাপী অন্ধকার। সর্বশেষ মড়কটি ছিল নির্ধারণী, আর এটাই স্মরণ করা হয় 'পাসওভার' উদযাপক করার সময়। ঈশ্বর প্রতিটি মিশরীয় পরিবারের সবচেয়ে বড় সন্তানটিকে হত্যা করেছিলেন, কিন্তু 'পাসড ওভার' বা ইহুদীদের বাড়িগুলো এড়িয়ে গিয়েছিলেন তাদের সন্তানদের কোনো ক্ষতি না করে। ইজরায়েলাইটদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা যেন তাদের বাড়ির দরজায় ভেড়ার রক্ত দিয়ে একটি চিহ্ন এঁকে রাখেন, যা মৃত্যুর ফেরেশতাকে এই শিশু হত্যার মহাতাণ্ডবে কোন বাসাগুলো এড়িয়ে যেতে হবে সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে, নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ

এবং সবচেয়ে জ্ঞানী ঈশ্বর হয়তো নিজেই কোন বাড়িগুলো কার সেটি বলতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু হয়তো লেখক মনে করেছিলেন, ভেড়ার রক্ত-চিহ্ন এই গল্পে বর্ণিল একটি মাত্রা যোগ করতে পারে। যা-ই হোক, এটাই হচ্ছে কিংবদন্তীর সেই 'পাসওভারের' ঘটনা, যা এখনোও সর্বত্র ইহুদীরা নিয়মিতভাবে উদযাপন করেন।

আসলেই ফারাও ততদিনে হাল ছেড়ে দেবার একেবারে প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এর আগেই তিনি হয়তো ইজরায়েলাইটদের মুক্ত করে দিতেন, আর সেটি বেশ ভালো হতো, কারণ ঐসব অসংখ্য নিষ্পাপ শিশুর জীবন বাঁচানো সম্ভব হতো। কিন্তু ঈশ্বর খুব পরিকল্পিতভাবেই ফারাওকে আরো বেশি একগুঁয়ে করে তুলতে তার জাদুর শক্তি ব্যবহার করেছিলেন, যেন ঈশ্বর আরো কিছু মড়ক মিশরীয়দের উপর চাপিয়ে দিয়ে নির্যাতন করতে পারেন, যেন এসবই ছিল একটি 'ইঙ্গিত', যা মিশরীয়দের প্রদর্শন করেছিল কে আসলে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছেন। আর ঈশ্বর মোজেসকে যা বলেছিলেন সেটি হচ্ছে এমন:

> 'কিন্তু আমি সম্রাটের হৃদয় আরো কঠোর করে দেবো এবং যদিও মিশরে আমি আমার অলৌকিক ইশারা আর বিস্ময়গুলো বহুগুণে বাড়িয়ে দেবো, তিনি কিন্তু তোমার কথা শুনবেন না। তারপর আমি মিশরের উপর আমার হাত রাখবো শক্তিশালী বিচারের দণ্ড নিয়ে। আমি আমার অনুগত, আমার জনগোষ্ঠী, ইজরায়েলাইয়েটদের মিশর থেকে বের করে আনবো। এবং মিশরীয়রা জানবে যে, আমি হচ্ছি প্রভু যখন আমি মিশরের বিরুদ্ধে আমার হাত প্রসারিত করেছি এবং ইজরায়েলাইটদের সেখান থেকে মুক্ত করে এনেছি' (এক্সোডাস ৭: ২-৩)।

দুর্ভাগা ফারাও, ঈশ্বরই তার হৃদয়কে কঠিন করে তুলেছিলেন যেন তিনি ইজরায়েলাইটদের মুক্তি দিতে অস্বীকার করেন, বিশেষ করে যেন ঈশ্বর তার সে নির্মম 'পাসওভার' কারসাজটি করে দেখাতে পারেন। ঈশ্বর এমনকি মোজেসকে আগে থেকেই বলেছিলেন তিনি ফারাও-এর মুখ থেকে 'না' উচ্চারণ করাবেন, আর এর পরিণতিতে মিশরীয়দের নিরপরাধ প্রথম জন্ম নেয়া শিশুগুলোকে হত্যা করা করা হবে, আর ঈশ্বর তার প্রতিশ্রুতি মতো সেটাই করেছিলেন। যেমন, আমি বলেছিলাম, এটি খুব মধুর কোনো কাহিনী নয়, এবং আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করতে করতে পারি যে, আসলেই এমন কোনো ঘটেনি।

মিশরের ইহুদীদের কথিত বন্দীত্ব থেকে আরো বেশি অকৃত্রিম এবং সত্য ছিল পরবর্তীতে তাদের ব্যাবিলনে বন্দীত্বের কাহিনীটি। এই ঘটনাটির বহু প্রমাণ আছে। ৬০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাদনেজ্জার জেরুজালেম দখল করেছিলেন এবং বহু ইহুদীকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে এসেছিলেন। এবং প্রায় ৬০ বছর পরে পারস্য রাজা সাইরাস দ্য গ্রেটের হাতে ব্যাবিলন শহরটির আবার পতন হয়েছিল। সাইরাস ইহুদীদের দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই সেটি করেছিলেন। ব্যাবিলনে এই নির্বাসনের সময় বা এর আশে পাশের কোনো একটি সময়ে ওল্ড টেস্টামেন্টে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ বইগুলো লেখা হয়েছিল। সুতরাং, যদি আপনি ভেবে থাকেন যে, মোজেস অথবা ডেভিড বা নোয়া অথবা অ্যাডামের গল্পগুলো যারা লিখেছিলেন, সেই লেখকরা তাদের বর্ণিত যা কিছু ঘটেছে সেই সম্বন্ধে হালনাগাদ জ্ঞান রাখতেন, তাহলে আবার ভেবে দেখুন। আপাতদৃষ্টিতে ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণিত ইতিহাসগুলো লেখা হয়েছিল অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কোনো একটি সময়ে - ৬০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে, যে ঘটনাগুলো তারা বর্ণনা করেছেন বলে তারা দাবী করেছেন সেগুলো ঘটার বহু শতাব্দী পরে।

ওল্ড টেস্টামেন্ট আসলেই কখন লেখা হয়েছিল এর পাঠ্যাংশের মধ্যে কালের অসঙ্গতিগুলো লক্ষ করলে সেই বিষয়ে আমরা কিছু ইঙ্গিত পাই। কালের অসঙ্গতিগুলো হচ্ছে এমন কিছু যা ভুল সময়ে আবির্ভুত হয়, ধরুন কোনো একজন অভিনেতা, প্রাচীন রোমের পটভূমিতে রচিত কোনো নাটকের দৃশ্যে তার হাত ঘড়িটি খুলে রাখতে যখন ভুলে যান। বেশ, বুক অব জেনেসিসে একটি চমৎকার কাল অসঙ্গতির উদাহরণ লক্ষ করা যাক। জেনেসিসে বর্ণিত আছে যে আব্রাহাম বেশ কিছু সংখ্যক উটের মালিক ছিলেন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণগুলো প্রদর্শন করেছে, আব্রাহাম যে সময় মৃত্যুবরণ করেছেন বলে মনে করা হয়, তার বহু শতাব্দী পরেই কেবল উট গৃহপালিত প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। যদিও ব্যাবিলনে ইজরায়েলাইটদের বন্দীত্বের সময় নাগাদ উটের গৃহপালিত প্রাণীতে রূপান্তর প্রক্রিয়াটি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছিল, যে সময় 'বুক অব জেনেসিস' আসলেই লেখা হয়েছিল।

বেশ, তাহলে জেনেসিসের সূচনা পর্বে বর্ণিত পুরানগুলো নিয়ে আমরা কী বলতে পারি? অ্যাডাম এবং ইভ (আদম ও হাওয়া)? অথবা নোয়া'র আর্ক (নুহ নবীর নৌকা)? নোয়ার গল্পটি ব্যাবলনিয় একটি পুরাণ থেকে সরাসরি এসেছিল - উটনাপিশটিমের পুরাণ - আর বিষয়টি কিন্তু বিস্ময়কর নয়, কারণ জেনেসিস পর্বটি ব্যাবিলনে বন্দীদশায় লেখা হয়েছিল। সুমেরিয় মহাকাব্য গিলগামেশ

থেকে উটনাপিশটিমের গল্পটি এসেছে । তর্কস্বাপেক্ষে যা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম সাহিত্যকর্ম। এটি লেখা হয়েছিল নোয়ার কাহিনীটি লেখারও প্রায় দুই হাজার বছর আগে। সুমেরিয়রা বহু-ঈশ্বরবাদী ছিলেন। তাদের বন্যা সংক্রান্ত পুরাণ বলছে, পৃথিবীতে মানুষের অতিরিক্ত কোলাহলের কারণে দেবতার শান্তিতে ঘুমাতে পারছিলেন না। আর এই হট্টগোলে বিরক্ত দেবতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, একটি মহাপ্লাবন দিয়ে সবকিছু প্লাবিত করে সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করবেন। কিন্তু দেবতাদের মধ্যে একজন, পানি দেবতা এনকি, উটনাপিশটিম নামে একজন মানুষের প্রতি সদয় হয়েছিলেন (প্রাচীন একটি সংস্করণে তিনি ছিলেন জিউসুডরা) এবং তিনি তাকে সতর্ক করে দিয়ে একটি বিশাল নৌকা বা আর্ক নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলে - যে নৌকার নাম হবে 'জীবনের সংরক্ষক'। এই গল্পটির বাকী অংশ প্রায় অনেকটাই জেনেসিসে বর্ণিত নোয়া'র মহাপ্লাবণের কাহিনীর অনুরূপ: সব ধরনের প্রাণীদের এক জোড়া সেই নৌকায় জায়গা পেয়েছিল, সামনে কোথায় স্থলভূমি আছে কিনা তা দেখতে পালাক্রমে একটি কবুতর, একটি সোয়ালো আর একটি কাককে আর্ক থেকে মুক্ত করা হয়েছিল, অবশেষে চমৎকার একটি রংধনু দিয়ে গল্পটি শেষ হয়। অন্য একজন দেবী, ইশথার, যিনি দেবতাদের প্রতিজ্ঞা প্রতীক হিসাবে একটি রংধনু স্থাপন করেছিলেন - এই ধরনের কোনো প্রলয়ঙ্করী প্লাবণের আর কখনোই পুনরাবৃত্তি হবে না।

গ্রিক পুরাণে এর কাছাকাছি একটি কাহিনী আছে। জিউস, দেবরাজ, বেশ রেগে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মানব জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। তিনি পুরো পৃথিবীকে প্লাবিত করেছিলেন এবং সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেছিলেন। সবাইকে, তবে শুধুমাত্র একটি দম্পতি ছাড়া, ডিউকালিয়ন এবং তার স্ত্রী পিরা। তারা একটি ভাসমান কাঠের আলমারির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে পেরেছিলেন, যা একটি সময় মাউন্ট পারনাসাসে এসে পৌঁছেছিল। সারা পৃথিবীজুড়ে এ ধরনের মহাপ্লাবণের বহু পুরাণ কাহিনী আছে, যেখানে কেবল একটি মাত্র পরিবার বেঁচে থাকে। প্রাচীন মেক্সিকোর অ্যাজটেকদের পুরাণে একটি মাত্র জীবিত পরিবার - কক্সকক্স এবং তার স্ত্রী একটি ফাঁপা গাছের কাণ্ডের মধ্যে ভেসে ছিলেন, পরিশেষে তারাও, নোয়ার পরিবারের মতোই একটি পাহাড়চুড়ায় এসে থামেন এবং এরপর সেখানে থেকে সমতলে অবতরণ করে পৃথিবীকে তারা আবার জনপূর্ণ করে তুলেছিলেন।

জেনেসিসে বর্ণিত কাহিনীর ব্যাবিলনের বহু-ঈশ্বরবাদী শিকড় সম্বন্ধে পরমসুখময় অজ্ঞতায় বাইবেল-বিশ্বাসী কেন্টাকির খ্রিস্টানরা দানবীয় আকৃতির

একটি নোয়ার আর্ক নির্মাণ করতে এমনকি করমুক্ত তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন, যা দর্শনীর বিনিময়ে পরিদর্শন করতে হবে। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন এই কাহিনীটির মূল ইতিহাস অনুসন্ধানে তাদের হয়তো আরো খানিকটা বেশি পরিমান সময় দেয়া উচিত ছিল। যদি নোয়ার কাহিনী সত্যি হতো, যে স্থানগুলোয় আমরা প্রতিটি ধরনের প্রাণীদের খুঁজে পাই, সেটির এমন একটি বিন্যাস প্রদর্শন করা উচিত ছিল, যেন দেখে মনে হয় তারা সেই স্থানটি থেকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, যে স্থানটিতে প্লাবন শেষে নোয়ার আর্ক এসে ভিড়েছিল বলে বাইবেল বর্ণনা করেছে - তুরস্কের মাউন্ট আরারাত। আর এর বদলে আমরা আসলেই যা দেখি তা হচ্ছে প্রতিটি মহাদেশ আর দ্বীপের নিজস্ব অনন্য প্রজাতি আছে: অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা আর নিউ গিনির মারসুপিয়ালরা, দক্ষিণ আমেরিকার স্লথ আর অ্যান্টইটাররা, মাদাগাস্কারের লেমুর। কেন্টাকির ঐসব মানুষগুলো আসলে কী ভাবছিলেন? তারা কী কল্পনা করেছিলেন যে, মিস্টার এবং মিসেস ক্যাঙ্গারু 'আর্ক' থেকে নেমেই লাফিয়ে লাফিয়ে অষ্ট্রেলিয়া অবধি পাড়ি দিয়েছিলেন পথে কোনো সন্তানের জন্ম না দিয়েই? আর মিস্টার এবং মিসেস ওমব্যাট, মিস্টার এবং মিসেস তাসমানিয়ান ডেভিল, মিস্টার এবং মিসেস বিলবি এবং আরো বহু সংখ্যক মারসুপিয়াল প্রাণী, যাদের অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। মিস্টার এবং মিসেস লেমুর, তাদের সম্পূর্ণ ১০১ জোড়া, অন্য আর কোথাও না গিয়ে সবাই দল বেধে একবারে সরাসরি শুধু মাদাগাস্কারেই গিয়েছিলেন এবং মিস্টার এবং মিসেস স্লথ কী খুবই ধীর গতিতে হামাগুড়ি দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় হাজির হয়ছিলেন? বাস্তবিকভাবে, অবশ্যই, সব প্রাণী, এবং তাদের জীবাশ্মগুলো ঠিক সেখানেই অবস্থান করছে, যেখানে বিবর্তনের মূলনীতি অনুযায়ী তাদের থাকা উচিত। আর ডারউইনের ব্যবহার করা প্রমাণগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রমাণ ছিল। পূর্বসূরি মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ীরা অষ্ট্রেলিয়ায় পৃথকভাবে বিবর্তিত হয়েছিল বহু মিলিয়ন বছর ধরে, এবং এটি বহু ভিন্ন মারসুপিয়াল প্রজাতিতে বিভাজিত হয়েছে - ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা, ওপোসাম, কোক্কাস, ফ্যালাঙ্গার ইত্যাদি। ভিন্ন একগুচ্ছ স্তন্যপায়ী দক্ষিণ আমেরিকায় বিবর্তিত হয়েছে, স্লথ, অ্যান্টইটার, আর্মাডিলো এবং অন্যান্য কিছু প্রাণী রূপে বিভাজিত হয়েছে । অন্যদিকে আরো একগুচ্ছ প্রাণী বিবর্তিত হয়েছে আফ্রিকায়. এবং আরো এক গুচ্ছ, সব লেমুরসহ, বিবর্তিত হয়েছে মাদাগাস্কারে এবং এভাবে আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে।

অ্যাডাম আর ইভ এবং নোয়া'র আর্কের কাহিনীগুলো ইতিহাস নয়। এবং শিক্ষিত কোনো ধর্মতাত্ত্বিকই এগুলোকে ইতিহাস হিসাবে বিবেচনা করেন না।

পৃথিবীজুড়ে অগণিত এমন কাহিনীর মত এগুলো হচ্ছে 'পুরাণ'। আর পুরাণ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কোনো কোনোটি সুন্দর এবং অধিকাংশই মুগ্ধ করার মত, কিন্তু সেগুলো ইতিহাস নয়। দূর্ভাগ্যজনকভাবে, বহু অশিক্ষিত মানুষ, বিশেষ করে আমেরিকা এবং ইসলামী বিশ্বে, এগুলোকেই আসলেই ইতিহাস বলেই মনে করেন। সব সংস্কৃতি আর জনগোষ্ঠীরই পুরাণ আছে। যে দুটোর কথা আমি উল্লেখ করলাম, সেগুলো ইহুদীদের পুরাণ, বিশ্বব্যাপী যে পুরাণের কাহিনীগুলো খুব বেশি মাত্রায় পরিচিত হয়ে উঠেছে তার কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র ঘটনাক্রমে এই পুরাণগুলোকে একত্রে সংকলিত করা হয়ছে ইহুদীবাদ, খ্রিস্টধর্ম আর ইসলামের মূল ক্যাননে।

কীভাবে প্রাচীন একটি পুরাণে সূচনা হয় সেটি কদাচিৎ স্পষ্ট হতে পারে। হয়তো আসলেই যা ঘটেছিল সেই সংক্রান্ত একটি মূল কাহিনীর অস্তিত্ব ছিল, ধরুন স্থানীয় অ্যাকিলিস বা রবিন হুডের মত কোনো বিরোচীত চরিত্রের কিছু দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড। হয়তো কোনো এক কল্পনাপ্রবণ গল্পবলিয়ে একটি গল্পের জাল বুনে রাতের বেলা বসতি শিবিরের আগুনের পাশে বসে থাকা তার স্বগোত্রীয়দের আনন্দ দিয়েছিল। যা হতে পারে একসময়ে ঘটা কোনো কাহিনীর অতিরঞ্জিত বা বিকৃত কোনো সংস্করণ, অথবা কোনো কল্পিত কাহিনী, যা শুধুমাত্র আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছিল, হয়তো দুঃসাহসী নাবিক সিন্দাবাদের কাহিনীর মত। এমন একজন কাহিনীকার হয়তো ইতোপূর্বে বিদ্যমান পুরাণের চরিত্রগুলো ব্যবহার করতে পারেন, যা ইতোমধ্যেই শ্রোতাদের কাছে পরিচিত: হারকিউলিস, অ্যাকিলিস, অ্যাপোলো, থিসিউসের মত চরিত্রগুলো। অথবা, আমাদের এই সময় অবধি, যেমন, ব্রের র‍্যাবিট অথবা সুপারম্যান বা স্পাইডার ম্যান। এছাড়াও গল্পবলিয়ে হয়তো তার গল্পগুলোকে নিছক বিশুদ্ধ আনন্দ দেবার জন্য সৃষ্ট কাহিনী হিসাবে নাও ভাবতে পারেন। তার হয়তো নৈতিক বা নীতিকথার গল্প হিসাবে সেগুলো উপস্থাপন করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। যেমন, যিশুর গুড সামারিটান সংক্রান্ত নীতিগর্ভ রূপককাহিনী অথবা ইশপের উপকথাগুলোর মত।

পুরাণের প্রায়শই স্বপ্নসদৃশ একটি বৈশিষ্ট্য থাকে, এবং কখনো কাহিনীর মূল আবিষ্কর্তা হয়তো সেই স্বপ্নের বর্ণনাই দিয়ে থাকেন। ইতিহাসব্যাপী, বহু মানুষই বিশ্বাস করেছেন যে, তাদের স্বপ্নের গুরুত্বপূর্ণ কোনো অর্থ বা বার্তা আছে। ভাবা হয়েছে স্বপ্ন ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা তাদের পুরাণের উৎস খুজে পান একটি রহস্যময় ভোরের যুগ থেকে, যা তাদের পূর্বসূরিদের অতীতের অংশ, যার তারা নাম দিয়েছেন 'ড্রিমটাইম'।

তবে যা-ই হোক, যখন একটি কাহিনীর সূচনা হয়, সত্য বা কল্পিত, রুপককাহিনী অথবা স্বপ্ন - 'চাইনিজ হুইজপার' প্রক্রিয়ার প্রভাব নিশ্চিত করবে যে, প্রজন্মান্তরে যতবার এটি পুনরাবৃত্তি আর পুন-পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে, ততই এটি পরিবর্তিত হওয়া অব্যাহত রাখবে। ভালো কাজগুলো অতিরঞ্জিত হয়, প্রায়শই অতিমানবীয় একটি মাত্রায়। কখনো মূল চরিত্রের নাম পরিবর্তিত হয়, যেমন সুমেরিয় কিংবদন্তীর উটনাপিশটিম চরিত্রটি হিব্রু পুনকথনে নোয়া নামের একটি চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। কাহিনীর নানা খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও পরিবর্তিত ও সম্পাদিত হয়। ধারাবাহিকভাবে আসা কাহিনীকাররা গল্পের 'উন্নতি' বা পরিবর্ধন করেন, সমসাময়িক মানুষদের কাছে এটিকে আরো উপভোগ্য করে তুলতে অথবা তাদের পূর্ব বিশ্বাস অথবা খামখেয়ালী ইচ্ছাগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে করে তুলতে। অথবা শুধুমাত্র গল্পের ঘটনাগুলো ইতোমধ্যে জনপ্রিয় কোনো চরিত্রের জন্য আরো বৈশিষ্ট্যসূচক করতে তুলতে। সুতরাং যখন অবশেষে এই গল্পটি লিখিত রুপ পায়, মূল গল্পের খুব সামান্যই তখন টিকে থাকে। এটি একটি পুরাণে পরিণত হয়।

একটি পুরাণ খুব দ্রুত গড়ে উঠতে পারে, যেভাবে সেই বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর উদাহরণ থেকে আমরা জানতে পেরেছি। যে ঘটনাগুলো আমাদের নিজেদের এই সময়ে শুরু হয়েছে সুতরাং আমরা আসলেই তাদের জন্ম আর বিকশিত হওয়া পর্যবেক্ষণ করেছি। এলভিস প্রিসলিকে এখনো জীবিত দেখা গেছে - এ সংক্রান্ত এখনো বহু পুরাণের অস্তিত্ব আছে, যা হয়তো যিশুর পুনরুত্থানের মত অনুরূপ কাহিনীগুলো সম্বন্ধে আপনাকে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে প্ররোচিত করবে।

একটি আধুনিক পুরাণ সংক্রান্ত আমার সবচেয়ে প্রিয় উদাহরণ হচ্ছে নিউ গিনি আর প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন মেলানেসিয়া দ্বীপগুলোর 'কার্গো-কাল্ট'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ আর অষ্ট্রেলিয়ার সৈন্যরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় বহু দ্বীপ দখল করেছিল। নানা ধরনের পণ্যসামগ্রী দিয়ে এসব অস্থায়ী সামরিক ঘাটিগুলো সমৃদ্ধ ছিল - খাদ্য, ফ্রিজ, রেডিও, টেলিফোন, গাড়ি ইত্যাদি। খানিকটা এই ধরনেরই একটি সরবরাহ-মজুত প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল উনবিংশ শতাব্দী থেকেই, যখন উপনিবেশ কর্মকর্তা আর মিশনারীরা নানা ধরনের পণ্যসামগ্রী নিয়ে এই দ্বীপগুলোয় বসবাস করতে এসেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় পণ্যসামগ্রী সরবরাহের পরিমান এবং বৈচিত্র্য দ্বীপের আদি-বাসিন্দাদের হতভম্ব করেছিল। তারা কোনো বিদেশীকে কখনোই কৃষিকাজ করে ফসল ফলাতে দেখেনি, অথবা গাড়ি কিংবা ফ্রিজ বানাতে দেখেনি অথবা তাদের দৃষ্টিতে উপযোগী কোনো কাজই তারা তাদের করতে দেখেননি। কিন্তু

তারপরও তাদের অভাব ছিল না, বিস্ময়কর সব পণ্য আর খাদ্য বিরতিহীনভাবে তাদের কাছে আসা অব্যাহত ছিল, একেবারে আকাশ থেকেই সেগুলো পড়তো। যুদ্ধের সময় আক্ষরিকভাবেই এগুলো আকাশ থেকে পড়তো, কারণ এগুলো সেখানে বহন করে আনতো বিশালাকৃতির 'কার্গো' বা পণ্যবাহী উড়োজাহাজ। দ্বীপের আদিবাসীদের কাছে মনে হয়েছিল ঐসব চমৎকার 'কার্গো' (পণ্যসামগ্রী) নিশ্চয়ই দেবতা অথবা তাদের পুর্বসূরিদের (যাদের দেবতা হিসাবে উপাসনা হয়) কাছ থেকে আসছে। এবং যেহেতু দ্বীপের আগ্রাসনকারীরা এই পণ্য পাওয়ার জন্য কোনো উপযোগী কাজই কখনো করেন না, তাহলে তারা যে কাজগুলো করেন নিশ্চয়ই সেগুলো হচ্ছে ধর্মীয় আচার। সেগুলো নিশ্চয়ই এমনভাবে পরিকল্পিত যেন স্বর্গ থেকে বৃষ্টির মতোই আরো পণ্য তাদের কাছে পাঠানোর জন্য যে আচারগুলো 'কার্গো' দেবতাদের সন্তুষ্ট এবং প্ররোচিত করতে পারে। সুতরাং এভাবে হয়তো কার্গো দেবতাদের সন্তুষ্ট করা যাবে সেটি ভেবে দ্বীপবাসীরা এই সব আচারগুলো অনুকরণ করা চেষ্টা করেছিলেন।

আর কীভাবে তারা সেটি করেছিলেন? বেশ, তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে মনে হয়েছিল, বিমানবন্দর অবশ্যই পবিত্র একটি স্থান, কারণ সেখানে 'কার্গো' বহন করা উড়োজাহাজগুলো অবতরণ করে। সুতরাং দ্বীপের আদিবাসীরা জঙ্গলের মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গায় তাদের নিজস্ব একটি 'বিমানবন্দর' বানানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যেখানে বিমানবন্দরের 'কন্ট্রোল' টাওয়ারের অনুকরণে তারা একটি টাওয়ারও নির্মাণ করেছিলেন, নকল রেডিও মাস্তুলসহ, এছাড়া নকল রানওয়েতে নকল উড়োজাহাজও ছিল। যুদ্ধের পর এই অস্থায়ী সামরিক ঘাটিগুলো যখন পরিত্যক্ত হয় এবং সৈন্যরা ফিরে গিয়েছিলেন, আকাশ থেকে কার্গো আসাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, দ্বীপবাসীরা এরপর একটি দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রত্যাশা করেছিলেন। সেই হারিয়ে যাওয়া কিন্তু স্মরণীয় মহাসমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে 'কার্গো' দেবতাদের তুষ্ট করতে তারা তাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ পরিমানে বৃদ্ধি করেছিলেন ।

স্বতন্ত্রভাবে 'কার্গো' ধর্মগোষ্ঠীগুলোর অন্ততপক্ষে ডজনখানেক বার উদ্ভব হয়েছিল, পরস্পর থেকে বহু দূরে অবস্থিত এমন অনেকগুলো দ্বীপে। কয়েকটি দ্বীপে এই ধর্মীয় গোষ্ঠীটি এখনোও এটি বেশ দৃঢ়ভাবেই টিকে আছে। ভানুয়াতু দ্বীপপুঞ্জের তাননা দ্বীপে, 'কাল্ট অব জন ফ্রাম' নামে এই ধরনের একটি ধর্মগোষ্ঠীর এখনো অস্তিত্ব আছে। জন ফ্রাম হচ্ছেন একজন পৌরাণিক মেসাইয়া-সদৃশ চরিত্র - দ্বীপের আদিবাসীদের বিশ্বাস অনুযায়ী যিনি একদিন তার জনগণের দেখাশুনা করতে যিশুর মত প্ররিত্রাতা রূপে ফিরে আসবেন। এ নামটি

সম্ভব এসেছে কোনো এক আমেরিকার সৈন্যের কাছ থেকে, যিনি সম্ভবত 'জন ফ্রম আমেরিকা' নামে পরিচিত ছিলেন (আমেরিকার ইংরেজিতে 'ফ্রম' শুনতে 'ফ্রাম'-এর মত শোনায়, ইংরেজি 'কাম' শব্দটির মত একই ছন্দে)। কাল্ট পুজার আরেকটি সংস্করণ হচ্ছে 'টম নেভি'। প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি নাম হয়তো কোনো পুরাতন গোত্র-দেবতার ব্যক্তিত্বের উপর আরোপ করা হয়েছে, যেভাবে 'উটনাপিশটিম' পরবর্তীতে 'নোয়া' হয়েছিলেন।

তাননা দ্বীপে আরো একটি ধর্মগোষ্ঠী আছে, যারা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী, প্রিন্স ফিলিপকে একজন দেবতা হিসাবে উপাসনা করেন। এই ক্ষেত্রে এটি ঠিক 'কার্গো' সংশ্লিষ্ট নয়, বরং একজন দীর্ঘদেহী সুদর্শন নৌবাহিনীর অফিসার যাকে দেখতে নিশ্চয়ই চমৎকার লেগেছিল তার সাদা ইউনিফর্মে, এবং যথেষ্ট পরিমানে ঈশ্বর-সদৃশ, যিনি যেখানেই গিয়েছেন তাকে সারাক্ষণ উৎসাহিত করা একদল মানুষ অনুসরণ করেছিল। এটি সম্ভবত 'চাইনিজ হুইজপার' প্রভাবের প্রক্রিয়াটিকে দ্রুত শুরু করে দিয়েছিল। প্রিন্স ফিলিপের পুরাণ কাহিনী ১৯৭৪ সাল সেই দ্বীপটি ভ্রমণের পর থেকে ক্রমশ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, কিছু অধিবাসীরা এখনো, অন্তত ২০১৮ সালেও তার দ্বিতীয় আগমনের আশায় অপেক্ষমান।

এইসব আধুনিক ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো আমাদের একটি ভালো ধারণা দেয় - কত সহজেই পুরাণের জন্ম হতে পারে। হয়তো আপনি মন্টি পাইথনের সিনেমা 'লাইফ অব ব্রায়ান' দেখেছেন? এর নায়ক ব্রায়ান দূর্ভাগ্যজনক একজন 'মেসাইয়া' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। অনুরক্ত ভক্ত জনতাদের থেকে পালাতে উন্মত্তভাবে দৌড়ানোর সময় একটি পাত্র এবং তার পায়ের একটি স্যান্ডেল ভুল ক্রমে পড়ে গিয়েছিল। প্রায় তাৎক্ষিণকভাবে উপাসনাকারীরা দুটি প্রতিদ্বন্দী দলে বিভাজিত হয়েছিল। একটি গ্রুপ পবিত্র স্যান্ডেলকে অনুসরণ করেছিল, অন্য দলটি পবিত্র পাত্রকে। যদি সুযোগ হয়, দয়া করে এই সিনেমাটি দেখবেন - আসলেই খুবই কৌতুকময়, এবং কীভাবে একটি ধর্মের সূচনা হয় তার একটি নিখুঁত আর অসাধারণ ব্যঙ্গরূপ।

আমার প্রিয় মানুষগুলোর মধ্যে অন্যতম ডেভিড অ্যাটেনবরো (নিশ্চয় তিনি সবারই প্রিয় মানুষদের একজন) তাননা দ্বীপে জন ফ্রামের স্যাম নামের এক অনুসারীর সাথে তার একটি কথোপকথনের বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি স্যামকে বোঝাতে চেয়েছিলেন ১৯ বছর পরেও জন ফ্রামের দ্বিতীয় আগমন তখনও ঘটেনি।

স্যাম মাটি থেকে চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুমি যদি দুই হাজার বছর যিশুর ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে পারো, আর সে যদি এখনো ফিরে না আসে, তাহলে আমি জনের জন্যে উনিশ বছরেরও চেয়ে বেশি সময় অপেক্ষা করতে পারবো'।

স্যামের মন্তব্যটিতে একটি যুক্তি ছিল (যদিও তিনি ডেভিড অ্যাটেনবুরোকে একজন বিশ্বাসী খ্রিস্টান ভেবে ভুল করেছিলেন)। আদি খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, যিশুর দ্বিতীয় আগমন তাদের নিজেদের জীবদ্দশার মধ্যেই ঘটবে, আর যিশুর নিজের ভাষায় - গসপেল যার উদ্ধৃতি দিয়েছে - ইঙ্গিত করছে যে যিশুর নিজেরও - অথবা অন্ততপক্ষে সেই ব্যক্তিদের, যারা তার শিক্ষার লিখিত রূপ দিয়েছিলেন, একই প্রত্যাশা ছিল।

মর্মনবাদ হচ্ছে আরেকটি অপেক্ষাকৃতভাবে নতুন ধর্মগোষ্ঠী, যা 'জন ফ্রাম' বা 'কার্গো' কিংবা 'এলভিস পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন' ধর্মগোষ্ঠীগুলোর ব্যতিক্রম ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে, এবং এটি আর্থিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ আর অন্যতম ক্ষমতাপূর্ণ একটি ধর্মে পরিণত হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে জন্মগ্রহন করা একজন ব্যক্তি জোসেফ স্মিথ। ১৮২৩ সালে তিনি দাবী করেছিলেন, মোরোনি নামের একজন ফেরেশতা প্রাচীন লেখাসহ কিছু স্বর্ণ-নির্মিত প্লেট বা পাত খুঁজে পেতে কোথায় মাটি খুঁড়তে হবে, সেই বিষয়ে তাকে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্মিথ বলেছিলেন তিনি সেই কাজটি করেছিলেন, এবং সেই পাতগুলোর উপর খোদাই করা প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় লেখা কিছু পাঠ্যাংশ তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি এটি করতে জাদুর টুপির মধ্যে একটি জাদুর পাথরে সহায়তা নিয়েছিলেন, যখন তিনি সেই টুপির মধ্যে তাকিয়েছিলেন, পাথরটি সোনার পাতের উপর খোদাই করা লেখাগুলোর অর্থ তার কাছে উন্মোচন করেছিল। ১৮৩০ সালে তিনি তার ইংরেজি 'অনুবাদ' প্রকাশ করেছিলেন। অদ্ভুতভাবে সেই ইংরেজি তার সমসাময়িক সময়ের ইংরেজি ছিল না, বরং এই ইংরেজিটি ছিল অন্ততপক্ষে দুই শতাব্দী প্রাচীন।, কিং জেমস বাইবেলের ইংরেজি। মার্ক টোয়েইন কৌতুক করেছিলেন যদি আপনি "ইট কেম টু পাস" (বা কিছু সময় অতিক্রান্ত হবার পরে) বাক্যটির প্রতিটি পুনরাবৃত্তি কেটে বাদ দেন, 'বুক অব মর্মন' পাতলা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় পরিণত হবে।

কেন? স্মিথ আসলে কী ভাবছিলেন যখন শব্দগুলো নিয়ে তিনি খেলছিলেন? তিনি কী ভেবেছিলেন ঈশ্বর ইংরেজিতে কথা বলেছিলেন? এবং সেটি আবার ষোড়শ শতাব্দীর ইংলিশ? এটি আমাকে একটি গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয় (হয়তো

মিথ্যা, কিন্তু খুবই প্রচারযোগ্য, সেই হিলিয়াম-পূর্ণ পুতুলের গল্পটির মত), মিরিয়াম এ. ফার্গুসন নামে টেক্সাসের একজন প্রাক্তন গভর্নরের গল্প। স্প্যানিশ ভাষাকে টেক্সাসের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা হিসাবে ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারটি অপছন্দ করে কথিত আছে তিনি বলেছিলেন, 'যিশুর জন্য যদি ইংরেজি ভাষা যথেষ্ট হয়, আমার জন্যও সেটি যথেষ্ট হবে'।

আপনি হয়তো ভাবতে পারেন জোসেফ স্মিথের এই প্রাচীন ইংরেজির ব্যবহার যে একটি জালিয়াতি সেটি মানুষের মনে সন্দেহ উদ্রেক করার জন্য যথেষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল। এটি এবং সেই বাস্তব সত্যটি যে, ইতোপূর্বে একটি আদালত প্রতারণার দায়ে তাকে অভিযুক্ত করেছিল। তা সত্ত্বেও খুব দ্রুত তিনি অনুসারীদের আকৃষ্ট করতে শুরু করেছিলেন, বর্তমানে তার বহু মিলিয়ন সংখ্যক অনুসারী আছে। ১৮৪৪ সালে খুন হবার অল্প কিছু দিনের মধ্যে তার এই ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠীটি, ব্রিগহাম ইয়ং নামক আকর্ষণীয় এক নেতার অধীনে নতুন ও বিশাল একটি ধর্মে পরিণত হয়ে উঠেছিল। মোজেস-সদৃশ (আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে একটি পুরাণ অতীতের অন্য কোনো পুরাণ থেকে ধারণা ঋণ করে) ব্রিগহাম ইয়ং প্রতিশ্রুত একটি ভূখণ্ড খুঁজতে তার অনুসারীদের নিয়ে ভ্রাম্যমান একটি তীর্থযাত্রায় বের হয়েছিলেন। এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ অঙ্গরাজ্যে সেই ভূখণ্ডটি তারা খুঁজে পেয়েছিলেন । বর্তমানে মূলত তারাই এই রাজ্যটি পরিচালনা করেন। এবং মর্মনবাদ এখন 'চার্চ অব ল্যটার ডে সেন্টস' অথবা 'এলডিএস' নামে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। সল্ট লেক সিটিতে দানবীয় আকারের একটি মর্মন মন্দির (তারা যাকে টেম্পল বলেন) আছে, এবং এছাড়াও কমপক্ষে আরো একশ 'টেম্পল' আছে আমেরিকা এবং সারা পৃথিবীব্যাপী। মর্মনবাদ আর স্থানীয় কোনো ধর্মগোষ্ঠী নয় যেমন, জন ফ্রাম কাল্ট, ভানুয়াতুতে যাদের বসবাস। মর্মনদের মধ্যে আছে আমেরিকার বহু সমৃদ্ধ শিল্পপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীসহ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ, এবং একজন, যিনি এমনকি প্রায় প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছিলেন। মর্মনরা তাদের আয়ের দশ শতাংশ চার্চে দান করবেন এমনটাই সাধারণত প্রত্যাশিত, আর যে কারণে মর্মনচার্চ বিস্ময়করভাবে বিত্তশালী, আপনি যদি সেই বিস্ময়কর টেম্পলগুলো দেখেন তাহলে সেটি অনুধাবন করতে পারবেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সব সমৃদ্ধশালী মর্মন ভদ্রলোকরা এমন কিছু জিনিস বিশ্বাস করে - বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে খুব স্পষ্টভাবে আমরা জানি যে, সেগুলো সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব: পুরোপুরিভাবে মনগড়া অর্থহীন কিছু দাবী। যেমন, বুক অব মর্মন বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের আদিবাসীরা হচ্ছেন সেই সব

ইজরায়েলাইটদের বংশধর, যারা ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উত্তর আমেরিকায় অভিপ্রয়ান করেছিলেন। আর এই দাবির অসারতা যদি এমনকি আপনার কাছে সুস্পষ্ট অনুভূত না হয়, তাহলে ডিএনএ বিশ্লেষণ একটিকে অকাট্যভাবে ভুল প্রমাণ করেছে। আরো একবার, আপনি হয়তো মনে করতে পারেন, জোসেফ স্মিথ একজন প্রতারক, সেটি মর্মনদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর জন্য এটাই যথেষ্ট। কিন্তু এটি তাদের কাছে কোনো সমস্যাই মনে হয় না।

ক্রমশ এই প্রতারণা আরো বিস্তারিত রূপ নিয়েছিল, বুক অব মর্মন প্রকাশের কয়েক বছর পরে, স্মিথ দাবী করেছিলেন যে, একজন সংগ্রাহকের নিকট থেকে সংগৃহীত কিছু প্রাচীন মিশরীয় কাগজ তিনি অনুবাদ করেছেন, এই কাগজগুলো সেই ব্যক্তি মিশরের থিবস শহরের কাছে কোথাও খুঁজে পেয়েছিলেন। মিশরে আব্রাহামের জীবন ও ভ্রমণের একটি বিবরণ হিসাবে এটিকে দাবী করে ১৮৪২ সালে স্মিথ 'বুক অব আব্রাহাম' নামে তার সেই 'অনুবাদ' প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে বহু পৃষ্ঠাব্যাপী আব্রাহামের প্রথম জীবন এবং মিশরীয় ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। ১৮৮০ সালে মর্মন চার্চ স্মিথের 'বুক অব আব্রাহাম' বইটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ক্যাননের অংশ করে নিয়েছিল।

মিশরীয় হিয়েরোগ্লিফিক্স বিশেষজ্ঞরা অবশ্যই সন্দেহ করেছিলেন যে, স্মিথের অনুবাদ সম্ভবত একটি জালিয়াতি। ১৯১২ সালে নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামের একজন কিউরেটরের লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী, 'বুক অব আব্রাহাম' একটি বিশুদ্ধ কল্পকাহিনী... 'প্রথম থেকে শেষ অবধি আজগুবি কল্পনা আর অর্থহীন বক্তব্যের একটি মিশ্রণ'। কিন্তু তারপরও ধর্মপ্রাণ মর্মনদের জন্য এর উপর তাদের ধর্মবিশ্বাস বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে - কারণ ধারণা করা হয় মূল প্যাপিরাসগুলো হারিয়ে গিয়েছে যখন শিকাগো মিউজিয়ামে যে ঘরে এটি রাখা হতো সেখানে ১৮৭১ সালে দূর্ঘটনাবশত আগুন ধরে গিয়েছিল। জোসেফ স্মিথের জন্যে দুর্ভাগ্যজনক, কারণ আগুনে সব প্যাপিরাসগুলো ধ্বংস হয়নি, ১৯৬৬ সালে এর কিছু অংশ পুনরাবিষ্কৃত হয়েছিল। ততদিনে গবেষকরা প্যাপিরাসের দলিলটি যে ভাষা রচিত হয়েছিল সেই ভাষাটি পড়তে শিখেছিলেন এবং যখন মর্মন এবং মর্মন নয় এমন গবেষকদের দ্বারা সেটি সঠিকভাবে অনুবাদ করা হয়েছিল, যারা আসলেই ভাষাটি জানতেন, দেখা গিয়েছিল এর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন, আব্রাহামকে নিয়ে সেখানে একটি শব্দও লেখা হয়নি। জোসেফ স্মিথের অনুবাদটি খুব পরিকল্পিত, এবং সুস্পষ্টভাবে একটি জালিয়াতি ছিল।

সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, স্মিথের 'বুক অব আব্রাহাম' আসলেই অস্তিত্ব আছে এমন একটি পান্ডুলিপির বানোয়াট একটি অনুবাদ। তাহলে কী খুব সম্ভাব্য নয় যে, তার আগের 'অনুবাদ' বুক অব মর্মন, যা জাদুর টুপির মধ্যে রাখা একটি জাদুর পাথর ব্যবহার করে অনুবাদ করা হয়েছিল কেউ যেন পরবর্তীতে পরীক্ষা করে দেখতে না পারে এমন সুবিধাজনকভাবে 'অদৃশ্য' হয়ে যাওয়া 'সোনার পাত' থেকে, সে বইটিও বানোয়াট অনুবাদ আর জালিয়াতি? আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে, মর্মনরা নিশ্চয়ই এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এমনকি স্মিথের সুস্পষ্ট অসততা, যা বুক অব আব্রাহামের জালিয়াতি মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়েছিল, এমনকি সেটিও মর্মন বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ভাঙ্গানোর মত যথেষ্ট শক্তিশালী প্রমাণিত হয়নি।

আমি সন্দেহ করছি, এটি শৈশবে কোনো মতবাদ দ্বারা দীক্ষিত করার প্রক্রিয়াটির বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রদর্শন করছে। কোনো একটি ধর্মে যখন কেউ প্রতিপালিত হন, তাদের জন্যে সেটি পরিত্যাগ করার কাজটি খুবই কঠিন অনুভূত হয়। এবং তারপর সেই মতবাদটি তারা পরের প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করেন। এবং এভাবেই চলতে থাকে। 'চার্চ অব ল্যাটার ডে সেইন্ট' এখন পৃথিবীর অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মগুলোর একটি। সেটি নিয়ে একটু ভাবুন, এবং হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন কীভাবে, আগের একটি যুগে, যিশুর মৃত্যুর পরের বহ দশক অবধি শুধুমাত্র মুখে পুনরাবৃত্তি করার মত গালগল্প ছাড়া, যখন কোনো সংবাদপত্র, ইন্টারনেট কিংবা বই ছিল না, তখন খ্রিস্টের এই ধর্মগোষ্ঠীটি কুমারী মায়ের সন্তান, অলৌকিক ঘটনা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, সরাসরি স্বর্গে আরোহন ইত্যাদি সংক্রান্ত তাদের অদ্ভুত কিছু বিশ্বাস নিয়ে সফলভাবে যাত্রা শুরু করেছিল।

মর্মন আর জন ফ্রামের পুরাণের ব্যতিক্রম ওল্ড টেস্টামেন্টের পুরাণগুলো, যেমন স্বর্গোদ্যান বা গার্ডেন অব ইডেনের মত পুরাণগুলো বহু দিন আগেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর কীভাবে এটির সূচনা হয়েছিল সেই সম্বন্ধে আমাদের তেমন কিছু জানা নেই। বিস্ময়কর নয় যে, প্রতিটি গোত্রের একটি করে সৃষ্টি-পূরাণ আছে। কারণ কোথা থেকে তারা এসেছে, কোথা থেকে সব প্রাণীরা এসেছে, কীভাবে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র আর নক্ষত্রগুলো সৃষ্টি হয়েছে - এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানতে মানুষ সহজাতভাবেই কৌতূহলী। স্বর্গোদ্যান (গার্ডেন অব ইডেন) হচ্ছে ইহুদীদের একটি সৃষ্টি পুরাণ। পৃথিবীব্যাপী বহু সহস্র সৃষ্টিপূরাণের মধ্য থেকে ইহুদী গোত্রের এই সৃষ্টিপুরাণটি ঘটনাক্রমে খ্রিস্টীয় বাইবেলে জায়গা করে নিয়েছিল, শুধুমাত্র যার কারণ দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যিশু নিজে ইহুদী ছিলেন

এবং রোম সম্রাট কনস্টান্টিন খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। নোয়া'র মহাপ্লাবণের কাহিনীর ব্যতিক্রম, আদম আর হাওয়ার কাহিনীটি সম্ভবত ব্যাবিলনীয় কোনো উৎস থেকে আসেনি। যথেষ্ট বিস্ময়কর বলতে হবে, মধ্য-আফ্রিয়ার বনাঞ্চলে বসবাসকারী খর্বাকার পিগমীদের সৃষ্টি পুরাণের সাথে এই কাহিনীটির বেশ সদৃশ্যতা আছে।

আপনি হয়তো মনে করতে পারবেন, ইহুদীদের কাহিনীতে 'মাটির থেকে তুলে নেয়া ধুলা' থেকে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। ঈশ্বর এরপর তার 'নাকের ছিদ্র দিয়ে জীবনের নিঃশ্বাস প্রবিষ্ট করে দিয়েছিলেন, এবং মানুষ একটি জীবন্ত আত্মায় পরিণত হয়েছিল'। খানিকটা কোনো বাগানের মালির মত, এরপর ঈশ্বর এক ধরনের কলম বা কাটিং এর মাধ্যমে আদমের একটি পাজরের হাড় থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি আপনি হয়তো বিস্মিত হবেন জেনে কত বেশি সংখ্যক মানুষ এই পুরাণ অনুসারে আসলেই মনে করেন যে, পুরুষদের শরীরে একটি পাজরের হাড় কম আছে!

আদম ও হাওয়াকে একটি সুন্দর বাগানে রাখা হয়েছিল - গার্ডেন অব ইডেন। ঈশ্বর তাদের বলেছিলেন বাগানে তাদের যা কিছু ইচ্ছা সেটাই তারা খেতে পারবেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ছাড়া। বাগানের মাঝখানে অবস্থিত একটি বিশেষ বৃক্ষ - ভালো আর মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞানদায়ী এই বৃক্ষটিকে খুব কঠোরভাবে তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কোনো পরিস্থিতিতেই তারা এর ফল খেতে পারবেন না। কিছু সময়ের জন্য সব ঠিকই ছিল। তারপর কথা বলতে সক্ষম একটি সাপ সেই দৃশ্যে প্রবেশ করেছিল। এবং এটি এই জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল খেতে হাওয়াকে প্ররোচিত করেছিল। হাওয়া সে কাজটি করেছিলেন, এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল একবার খেয়ে দেখার জন্য তিনি তার সঙ্গী আদমকেও রাজি করিয়েছিলেন। হায়! সাথে সাথে নিষিদ্ধ সব জ্ঞানে তারা পূর্ণ হয়েছিলেন, যার মধ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই বাস্তব সত্যটি, তারা দুজনেই নগ্ন। তাদের নগ্নতায় লজ্জা পেয়ে তারা গাছের পাতা দিয়ে আচ্ছাদন তৈরি করে নিয়েছিলেন। আর এটি দেখেই ঈশ্বর বুঝে গিয়েছিলেন, 'দিনের শীতলতায় বাগানের ছায়ায় তারা হাঁটছিল' (মিষ্টি একটি বাক্য)। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ আর ভয়ঙ্কর সেই ফল খেয়েছে। তিনি খুবই ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। হতভাগ্য আদম এবং হাওয়াকে সেই সুন্দর বাগান থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আদম এবং তার পুরুষ বংশধরদের উপর অভিশাপ ছিল যে, তারা তাদের সারা জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করবে। হাওয়া এবং তার নারী বংশধরদের শাস্তি হবে শিশু জন্ম দেবার সময় কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করা। আর সেই সাপ ও তার

বংশধরদের শাস্তি হয়েছিল যে, সারা জীবন তারা মাটিতে এভাবেই কোনো পা ছাড়া চলাফেরা করবে (এবং অনুমান করতে পারছি যে, তারা তাদের কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়েছিল)।

এবার পিগমীদের এই পুরান কাহিনীটির সাথে ইহুদীদের সৃষ্টি পুরাণটি তুলনা করে দেখুন। এই সাদৃশ্যতাটি প্রথম উল্লেখ করেছিলেন বেলজিয়ামের একজন নৃতাত্ত্বিক, যিনি ইটুরি জঙ্গলে পিগমীদের সাথে দীর্ঘসময় বসবাস করেছিলেন, তাদের ভাষা শিখেছিলেন এবং তাদের সমাজে বিদ্যমান একই ধরনের বেশ কিছু সৃষ্টি পুরাণের সংস্করণগুলো তিনি অনুবাদ করেছিলেন। নীচে সেগুলোর একটি সংস্করণ উল্লেখিত হলো:

স্বর্গে চমৎকার একটি দিনে ঈশ্বর তার প্রধান সহকারীকে প্রথম মানুষ সৃষ্টি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। চাঁদের ফেরেশতা নেমে এসেছিলেন, তিনি মাটি দিয়ে প্রথম মানুষের একটি মডেল তৈরি করেন, মাটির উপর এরপর চামড়া দিয়ে আবৃত করে, তারপর চামড়ায় রক্ত ঢেলে দেন, নাক, চোখ, কান আর মুখের জায়গায় ছিদ্র করে দেন। তিনি এই প্রথম মানুষের পেছনে নীচে আরেকটি ছিদ্র করে দিয়েছিলেন, এবং তার ভিতরে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর এই মাটির মূর্তির মধ্যে তিনি তার নিজস্ব প্রাণবায়ু নিঃশ্বাসের মাধ্যেম প্রবেশ করিয়ে দেন। তিনি সেই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। এবং এটি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, এটি উঠে বসে, এটি হাঁটতে শুরু করে। এটি ছিল ‘এফে’, প্রথম মানুষ এবং এরপরে যত মানুষ এসেছে তাদের পিতা।

ঈশ্বর এফেকে বলেছিলেন, ‘আমার জঙ্গল মানুষে পূর্ণ করতে সন্তানের জন্ম দাও। সুখী হবার জন্য আমি তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু দেবো। তাদের কখনোই কোনো কাজ করতে হবে না। তারা এই পৃথিবীর প্রভু হবে। তারা অনন্তকাল বাঁচবে। তবে, শুধুমাত্র একটি জিনিস করতে আমি তাদের নিষেধ করবো। বেশ - মনোযোগ দিয়ে শোনো - তোমার সন্তানদের আমার কথাগুলো জানাও, এবং বলো এই নির্দেশ যেন তারা বংশানুক্রমিকভাবে তাদের বংশধরদের জানায়। টাহু গাছ মানুষের জন্য চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ। কোনো কারণেই তোমরা এই নিষেধ অমান্য করতে পারবে না’।

এফে ঈশ্বরের এসব নির্দেশ মান্য করেছিলেন। তিনি এবং তার সন্তানরা কখনোই টাহু গাছের কাছে যায়নি। বহু বছর এভাবে অতিক্রান্ত হয়েছিল। তারপর একদিন ঈশ্বর এফেকে ডেকেছিলেন, ‘স্বর্গে উঠে এসো, তোমার সাহায্য

আমার দরকার'! সুতরাং এফে আকাশে স্বর্গে আরোহন করেছিলেন। তিনি চলে যাবার পর, তার বংশধররা তার আইন আর শিক্ষা অনুযায়ী দীর্ঘ দিন শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বসবাস করছিলেন। তারপর এক ভয়ঙ্কর দিনে, একজন গর্ভবতী নারী তার স্বামীকে বলেছিলেন, 'প্রিয়, আমার টাহু গাছের ফল খেতে খুব ইচ্ছা করছে। তিনি বলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো এ গাছের ফল খাওয়া আমাদের জন্যে নিষিদ্ধ'। তার স্ত্রী প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন? স্বামী উত্তরে বলেছিলেন, কারণ এটি 'বেআইনি'। সেই নারী এরপর বলেন, ওটা খুবই প্রাচীন ফালতু একটি আইন, তুমি কাকে বেশি মূল্য দেবে - আমাকে, নাকি ঐ প্রাচীন তুচ্ছ আইনটাকে'?

এভাবে তারা তাদের তর্ক অব্যাহত রেখেছিলেন। পরিশেষে, স্বামীটি বাধ্য হয়েছিল রাজী হতে। প্রচন্ত শঙ্কায় কম্পমান হৃদয় নিয়ে গভীর থেকে গভীরতম জঙ্গলে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, ধীর ধীরে তিনি সেই টাহু গাছের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন - ঈশ্বরের নিষিদ্ধ ঘোষিত সেই গাছ। ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্যকারী সেই পাপী একটি টাহু ফল পাড়েন।তিনি টাহু ফলের খোসা ছাড়ান, আর খোসাগুলো পাতার একটি স্তূপের নীচে তিনি লুকিয়ে রাখেন। তারপর তিনি আবার গ্রামে ফিরে আসেন, তার স্ত্রীকে সেই ফলটি দেন, এবং তিনি ফলটির স্বাদ নিয়েছিলেন।

স্ত্রী তার স্বামীকেও ফলটি খেতে জোর করেন। স্বামীটি সেটি করেছিলেন। অন্য সব পিগমীরাও একটু একটু করে স্বাদ নিয়েছিল এরপর, সবাই ভেবেছিল যে ঈশ্বর কখনো তাদের এই নির্দেশ অমান্য করার ঘটনাটি জানতে পারবেন না।

কিন্তু চাঁদের ফেরেশতা আকাশে বসে পুরো ঘটনাটি দেখছিলেন, তিনি খুব দ্রুত তার মনিব, ঈশ্বরকে বিষয়টি জানান: 'মানুষ টাহু গাছের ফল খেয়েছে!'। ঈশ্বর ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। 'তোমরা আমার নির্দেশ অবজ্ঞা করেছো', তিনি সেই আদিপুরুষদের বলেছিলেন, 'এর কারণে তোমাদের মৃত্যু হবে'।

বেশ, আপনার কী মনে হয়? এটা কী কাকতলীয় কোনো ব্যাপার? অবশ্যই সাদৃশ্য খুব বেশি নয়। হয়তো কাহিনীর কিছু ছক গভীরভাবে মানব অবচেতনে প্রোথিত হয়ে আছে, প্রায়শই যা পুরাণ রূপে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিখ্যাত সুইস মনোবিজ্ঞানী সি. জি. ইয়ুং অবচেতনের এই সব ছকগুলোকে বলেছিলেন 'আর্কিটাইপ'। ইয়ুং হয়তো প্রস্তাব করতে পারেন, 'নিষিদ্ধ ফল' হচ্ছে বিশ্বজনীন একটি মানবিক আর্কিটাইপ বা আদি-রূপ, যা লুকিয়ে আছে পিগমি এবং ইহুদী উভয়ের মনে, এবং স্বতন্ত্রভাবে যা তাদের পৃথক দুটি সৃষ্টিপুরাণকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কীভাবে পৃথিবীব্যাপী পুরাণগুলো তাদের যাত্রা শুরু করে সেই

তালিকায় হয়তো আমাদের ইয়ুং-এর প্রস্তাবিত আর্কিটাইপ ধারণাটিও যুক্ত করা প্রয়োজন। সারা পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক প্লাবনের পুরাণ কী তাহলে একইভাবে একটি ইয়ুং-এর আর্কিটপাইপ ধারণা হতে পারে?

আরেকটি সম্ভাবনা, যা হয়তো ইতোমধ্যেই আপনার মনে হতে পারে, সেটি হচ্ছে এই পিগমী সৃষ্টিপুরাণ এর উৎসে বিশুদ্ধভাবে পিগমী পুরাণ নয়। হতে পারে কী, কোনো একটি পর্যায়ে এটি খ্রিস্টান মিশনারীদের ধারণা দ্বারা দূষিত হয়েছিল? মিশনারীরা নিশ্চয়ই আদম আর হাওয়ার গল্প পিগমীদের বলেছিলেন। তারপর প্রজন্মান্তরের 'চাইনিজ-হুইজপার' কানকথার প্রভাবে গভীর জঙ্গলে এটি খানিকটা রূপান্তরিত হয়েছে, বাইবেলের সেই নিষিদ্ধ ফলের ধারণাটিও পিগমীদের সৃষ্টিপুরাণে যুক্ত হয়েছে। আমার মনে হয় সেটি হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর এর বিপরীতে এই পুরাণের অনুবাদক বেলজিয়ামের নৃতত্ত্ববিদ জ্যাঁ পিয়ের হালে (ঘটনাক্রমে তিনি খুব চমৎকার এক চরিত্র, তার নাম আর সাথে 'ব্যাডঅ্যাস' লিখে একসাথে গুগল করে দেখার চেষ্টা করতে পারেন) বিশ্বাস করেন এই প্রভাবটি আসলে অন্য দিক বরাবর হয়তো প্রবাহিত হয়েছে। তিনি মনে করেন যে নিষিদ্ধ ফলের কিংবদন্তীটি পিগমীদের কাছেই শুরু হয়েছিল এবং সেটি মিশর হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করেছিল। যদি এসব তত্ত্বের কোনোটি সঠিক হয়ে থাকে, এই দুটি পুরাণের মধ্যে পার্থক্য আরো একবার প্রদর্শন করছে 'চাইনিজ-হুইজপার' প্রভাবের শক্তি, যেভাবে একটি পুরাণ অন্য একটি পুরাণে রূপান্তরিত হয়।

আদম এবং হাওয়ার পুরাণসহ বহু গোত্রীয় পুরাণের কাব্যিক একটি সৌন্দর্য আছে। কিন্তু একটি বিষয় দুঃখজনকভাবে আমাকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে, কারণ বহু মানুষই সেই বিষয়টি অনুধাবন করেন না: এইসব পুরাণগুলো সত্য কাহিনী নয়। এগুলো ইতিহাস নয়। অধিকাংশই এমনকি খুব হালকাভাবেও ইতিহাস নির্ভর নয়। আমাদের ভাবার প্রবণতা আছে যে, যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে একটি অগ্রসর ও শিক্ষিত দেশ। আর আংশিকভাবে এটি তাই। কিন্তু তারপরও একটি বিস্ময়কর বাস্তব সত্য হচ্ছে এই মহান দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ আদম এবং হাওয়ার কাহিনীটিকে আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করেন। সৌভাগ্যক্রমে অন্য অর্ধেকও সেখানে বসবাস করেন। এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম একটি বৈজ্ঞানিক শক্তিতে পরিণত করেছে। আপনাকে ভাবতে বাধ্য করে আরো কত বেশি এ দেশটি অগ্রসর হতো যদি বৈজ্ঞানিকভাবে অজ্ঞ অর্ধেক যারা বাইবেলের প্রতিটি শব্দ আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করেন, তারা এটিকে পেছনে টেনে ধরে না থাকতেন।

আজ কোনো শিক্ষিত মানুষই আদম ও হাওয়ার পুরাণ অথবা নোয়া'র আর্ক পুরাণ আক্ষরিকভাবেই সত্য কাহিনী হিসাবে মনে করেন না। তবে বহু সংখ্যক মানুষ যিশুর পুরাণে বিশ্বাস করেন (যেমন মৃত্যুর পর সমাধি থেকে যিশুর পুনরুত্থান), অথবা ইসলামী পুরাণ (যেমন পাখনাওয়ালা ঘোড়ায় চড়ে মুহম্মদের স্বর্গে আরোহন) অথবা মর্মন পুরাণ (যেমন জোসেফ স্মিথের স্বর্ণের প্লেট অনুবাদ)। আপনি কী মনে করেন এমন কিছু বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তারা কী সঠিক? গার্ডেন অব ইডেন বা নোয়া কিংবা জন ফ্রাম এবং কার্গো কাল্টের পুরাণের চেয়েও এগুলোকে বিশ্বাস করার কী কোনো ভালো কারণ আছে? আর যদি, আপনি আপনার ধর্মবিশ্বাসের কোনো পুরাণ বিশ্বাস করেন, যে ধর্মবিশ্বাসেই আপনি ঘটনাক্রমে প্রতিপালিত হোন না কেন, কেনই বা সেই পুরাণগুলো সত্য হবার সম্ভাবনা বেশি হবে অন্য বহু বিশ্বাসের কোনো পুরাণ থেকে, যা কিনা একই পরিমান উৎসাহের সাথে অন্য মানুষরা বিশ্বাস করেন?

বেশ, তাহলে বাইবেলকে প্রকৃত ইতিহাস ভাবার দাবীর অসারতা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এটি মূলত ইতিহাস নয়। আমরা বাইবেলকে পুরাণ হিসাবে বিবেচনা করেও আলোচনা করলাম। আর এর অধিকাংশ মূলত সেটাই এবং বিষয়টি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। পুরাণকে মূল্য দেবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু ভাইকিং, গ্রিক, মিশরীয়, পলিনেশীয় দ্বীপবাসী, অষ্ট্রেলিয় আদিবাসী এবং আফ্রিকা, এশিয়া আর উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার অগণিত গোত্রের পুরাণগুলোর যে-কোনোটির চেয়ে শুধু বাইবেলের পুরাণটিকে আলাদা করে বেশি মূল্যবান দাবি করার বিশেষ কোনো কারণ নেই। তবে, বাইবেলের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি আছে, এটি নিজেকে 'গুড বুক' হিসাবে দাবি করে, অর্থাৎ এটি নৈতিক প্রজ্ঞার একটি বই, একটি বই যা কিনা আমাদের ভালোভাবে জীবন কাটাতে সহায়তা করে বলে দাবী করা হয়। বহু মানুষ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে এমনকি বিশ্বাস করেন, আপনি এটি ছাড়া 'ভালো' মানুষ হতে পারবেন না।

বাইবেল কী 'গুড বুক' হিসাবে এর সততার সুনাম পাওয়া যোগ্য? আগামী অধ্যায়টি পড়ার পরে আপনি হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

৪ ‘ভালো’ বই?

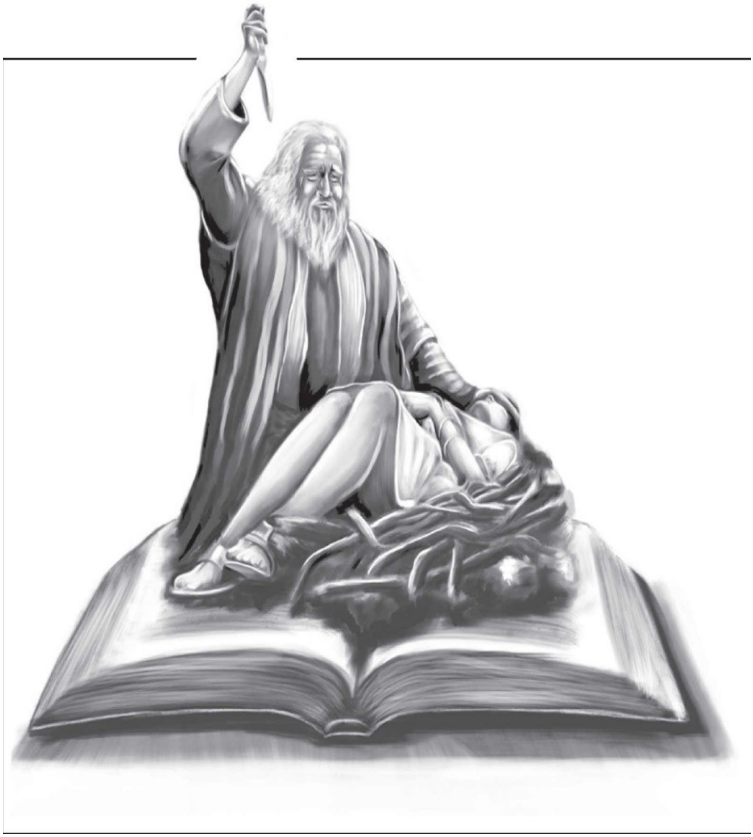

‘প্রাণীরা জোড়ায় জোড়ায় সেখানে প্রবেশ করেছিল’, আমরা নোয়ার সেই আর্কের গল্প ভালোবাসি। মিস্টার এবং মিসেস জিরাফ, মিস্টার এবং মিসেস হাতি, মিস্টার এবং মিসেস পেঙ্গুইন এবং আরো বহু যুগল, ধৈর্য্যসহকারে কাঠের পাটাতনের উপর দিয়ে হেঁটে বিশাল কাঠ-নির্মিত একটি জাহাজে প্রবেশ করছেন, যাদের স্বাগত জানাচ্ছেন উচ্ছসিত নোয়া দম্পতি। বেশ মধুর একটি দৃশ্য। কিন্তু একটু ভাবুন, সারা পৃথিবীব্যপী সেই মহাপ্লাবনটি আসলে কেন ঘটেছিল? ঈশ্বর মানুষের মধ্য পাপের বাহুল্য দেখে ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন। নোয়া ছাড়া বাকি সবার উপরে তিনি ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন, যে কিনা ‘ঈশ্বরের সুনজর’ অর্জন করেছিলেন। সেই কারণে ঈশ্বর প্রতিটি নারী, পুরুষ আর শিশু, এবং প্রাণীদের প্রতিটি প্রকারের এক জোড়া ছাড়া সবাইকে পানিতে নিমজ্জিত করে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর যা-ই হোক ঘটনাটি তেমন সুখকর মনে হচ্ছে না, তাই নয় কি?

ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে একটি কাল্পনিক চরিত্র কিনা সেটি নিয়ে আমরা যা কিছুই ভাবি না কেন, আমরা তারপরও তিনি ভালো, নাকি মন্দ একটি চরিত্র সেটি কিন্তু মূল্যায়ন বা বিচার করতে পারি, ঠিক যেভাবে আমরা লর্ড ভল্ডেমর্ট অথবা ডার্থ ভ্যাডার অথবা লং জন সিলভার অথবা প্রফেসর মরিয়ার্টি অথবা গোল্ডফিংগার অথবা ক্রয়েলা দ্য ভিলের চরিত্র মূল্যায়ন করতে পারি। সুতরাং এই পুরো অধ্যায় জুড়ে, যখন আমি বলবো, “ঈশ্বর এ কাজগুলো করেছিলেন”, তখন আমি বোঝাতে চাইছি “বাইবেল বলেছে যে, ঈশ্বর এসব কাজ করেছিলেন”। আর এই ঈশ্বর চরিত্রটি আসলেই ভালো একটি চরিত্র কিনা কিংবা তাকে নিয়ে প্রচারিত কাহিনীগুলো আসলে বাস্তব সত্য নাকি কল্পকাহিনী - সে বিষয়গুলো আমরা এসব বিবরণ থেকেই মূল্যায়ন করে দেখবো। আর আমি যখন মূল্যায়ন করবো, আর নিজ বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নিতে নিঃসন্দেহে নিজেকে আপনি আরো স্বাধীন অনুভব করতে পারবেন - এসব কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও আসলেই কী ঈশ্বরকে এখনো ভালোবাসা সম্ভব কিনা সেই বিষয়ে আপনি কী মনে করেন। বাইবেল বর্ণিত নিম্নলিখিত গল্পে জব নামক একজন ব্যক্তি যেভাবে করেছিলেন।

জব একজন খুবই ভালো এবং সৎ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন। এটি ঈশ্বরকে এতই তৃপ্ত করেছিল যে, তিনি জবকে নিয়ে শয়তানের সাথে এক ধরনের বাজি রেখেছিলেন। শয়তান ভেবেছিলেন জব ভালো এবং আচরণে সৎ কারণ তিনি খুবই ভাগ্যবান, ধনী এবং স্বাস্থ্যবান, যার ভালো একজন স্ত্রী এবং দশটি চমৎকার সন্তান আছে। ঈশ্বর শয়তানের সাথে বাজি রেখেছিলেন, জব তাকে ভালোবাসা এবং উপাসনা করা অব্যাহত রাখবেন এবং তার ভালোত্ব ও

সততা বজায় রাখবেন এমনকি যদি তিনি যদি তার সব সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হন। সবকিছু কেড়ে নিয়ে জবকে পরীক্ষা করে দেখতে ঈশ্বর শয়তানকে অনুমতি দিয়েছিলেন। এবং শয়তান সেই অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করেছিল। হতভাগা জব! তার সব গবাদী পশু আর ভেড়া মারা গিয়েছিল, তার ভৃত্যদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছিল, তার সব উটগুলো চুরি হয়ে গিয়েছিল, প্রবল বাতাসে তার বাড়ি ঝড়ে ধ্বসে পড়েছিল, এবং তার দশ সন্তানই মারা গিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর তার এই বাজিতে জিতে গিয়েছিলেন, এমনকি এই সব দুর্দশার শিকার হবার পরেও জন কখনোই ঈশ্বরের সাথে অভিমান করেননি, তাকে কখনোই ভালোবাসা এবং উপাসনা করা থামাননি।

যদিও শয়তান তার পরাজয় শিকার করেননি, সুতরাং জবকে আরো খানিকটা পরীক্ষা করে দেখতে তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন ঈশ্বর। এবার শয়তান জবের সারা শরীর বিষফোঁড়া দিয়ে আবৃত করে দিয়েছিল, সেই বিষফোঁড়াগুলোর মত যা ঈশ্বর মিশরীয়দের উপর আরোপ করেছিলেন (আর এর কারণ যে ব্যাকটেরিয়া সেটি আমরা এখন জানি, যদিও বুক অব জবের লেখক সেটি জানতেন না, এবং ধারণা করছি শয়তান আর ঈশ্বর সেটি জানতেন) কিন্তু তারপরও জবের বিশ্বাসে কোনো ফাটল ধরেনি। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা সামান্যতম কমে যায়নি। সুতরাং ঈশ্বর তাকে পুরষ্কৃত করেছিলেন সব বিষফোড়া নিরাময় করে এবং তাকে আরো অনেক বেশি পরিমানে সম্পদ দান করেছিলেন। তার স্ত্রী আরো অনেক সন্তানের জন্ম দিয়েছিল, এবং তারা সবাই সুখী একটি জীবন কাটিয়েছিলেন। সেই দশ মৃত সন্তানদের জন্যে দুঃখ করতে হয়, কারণ তাদের হত্যা করে হয়েছে ঈশ্বরে খামখেয়ালি একটি বাজির জন্যে কিন্তু - যেমন লোকে প্রায়শই বলে থাকেন, ডিম না ভেঙ্গে আপনি তো আর ডিমভাজি করতে পারবেন না।

নোয়ার পুরাণের মত, এটি শুধুমাত্র একটি গল্প, সুতরাং এটি আসলেই ঘটেনি। বাইবেলের বেশির ভাগ বইয়ের ক্ষেত্রে যেমন, আমরা জানি না কে 'বুক অব জব' বইটি লিখেছিলেন। আমরা জানি না লেখক নিজেই (নারী হবার চেয়ে যার সম্ভবত একজন পুরুষ হবার কথা) ভেবেছিলেন কিনা যে, আসলেই জব নামের সত্যিকারের কোনো একজন মানুষ ছিলেন। কিছু শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি হয়তো এই কাহিনীটি ব্যবহার করেছিলেন। এটির সম্ভাবনাই বেশি, কারণ বইটির অধিকাংশ অংশই মূলত জব এবং তার বন্ধুদের (জবের 'সান্ত্বনাদানকারী' নামে যারা পরিচিত) মধ্যে মূলত নৈতিক প্রশ্ন আর ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য নিয়ে দীর্ঘ কথোপকথনে পূর্ণ। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য যা-ই হোক না

কেন, প্রচুর পরিমানে ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান এবং ইহুদীরা এখনো মনে করেন যে এটি একটি সত্যি ঘটনা, অসুখ আর দুর্দশায় আক্রান্ত বাস্তবে অস্তিত্ব ছিল এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে যার নাম ছিল জব। ধর্মপ্রাণ মসুলমানরাও একই ভাবে এটি বিশ্বাস করেন, কারণ কুর'আনেও জবের গল্পের অনুরুপ গল্প আছে। এছাড়াও আছে নোয়ার গল্প। আর একই একই মানুষগুলো মনে করেন যে কীভাবে ভালো হওয়া যায় তার জন্যে ধর্মশাস্ত্র হচ্ছে আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ একটি নির্দেশিকা। এই সব ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো মনে করেন ঈশ্বর নিজেই সর্বোচ্চ মহান অনুকরণীয় একটি আদর্শ।

আরেকটি কাহিনী শোনা যাক, খানিকটা অস্বস্তিকর, এটিও ঈশ্বরকে আসলেই কেউ ভালোবাসছেন কিনা, ঈশ্বর কতৃক সেটি যাচাই করে দেখা সংক্রান্ত একটি কাহিনী। এখানে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন পরীক্ষাধীন ব্যক্তিটি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে (অর্থাৎ তাকে) ভালোবাসেন কিনা। কল্পনা করুন, যখন আপনি শিশু, আপনার বাবা একদিন সকালে আপনাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললেন, 'আজ খুব সুন্দর একটি দিন, তুমি কী আমার সাথে একটু বাইরে বেড়িয়ে আসতে চাও'? আপনার হয়তো প্রস্তাবটি পছন্দ হবে। সুতরাং চমৎকার একটি দিন কাটাতে প্রস্তুত হয়ে বের হলেন। কিছুক্ষণ পর যখন আপনার বাবা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে থামলেন, সেগুলো একত্রে একটি জায়গায় তিনি জড়ো করে রাখতে শুরু করেলেন এবং আপনিও তাকে সহায়তা করলেন কারণ আপনিও খোলা জায়গায় এভাবে আগুন জ্বালানো বা 'বন ফায়ার' পছন্দ করেন। কিন্তু যখনই 'বন ফায়ার' আগুন ধরানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে তখনই একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটলো। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার বাবা আপনাকে ধরে সেই কাঠের স্তূপের জোর করে শুইয়ে বেধে ফেললেন, যেন আপনি নাড়াচড়া না করেন। আপনি ভয়ে চিৎকার করতে থাকেন। আপনার বাবা কী আপনাকে আগুনের উপর জীবন্ত ঝলসাবেন? পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে থাকে। আপনার বাবা একটি ছুরি বের করেন, এবং সেটি তার মাথার উপরে উঁচু তুলে ধরেন, এবার কী ঘটতে যাচ্ছে সেই বিষয়ে আপনার মনে আর কোনো সন্দেহ থাকে না । আপনার বাবা আপনাকে এবার জবাই করতে যাচ্ছেন। তিনি আপনাকে হত্যা করে, তারপর আপনার শরীরে আগুন ধরিয়ে দেবেন: আপনার নিজের পিতা, যে পিতা যখন আপনি আরো ছোটো ছিলেন আপনাকে ঘুমাতে যাবার আগে গল্প বলতেন, তিনি আপনাকে ফুল আর পাখিদের নাম শিখিয়েছিলেন, আপনার প্রিয় পিতা যিনি আপনাকে উপহার দিয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন যখন আপনি অন্ধকারে ভয় পেয়েছেন। কীভাবে তিনি এমন একটি কাজ করতে পারেন?

কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি থেমে যান, তার মুখে অদ্ভুত একটি অভিব্যক্তি নিয়ে তিনি আকাশের দিকে তাকান। যেন তিনি তার নিজের মাথার মধ্যেই নিজের সাথে বাদানুবাদ করছেন। তিনি ছুরি সরিয়ে রাখেন, আপনার বাধন খুলে দেন, ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন কী ঘটেছে, কিন্তু আপনি তখন ভয়ে এতটাই অসাড় হয়ে আছেন আপনি তার কোনো কথাই বলতে গেলে শুনতে পারছিলেন না। কিছু সময় পরে তিনি আপনাকে সেটি বোঝাতে সক্ষম হন। এই সবই ছিল আসলে ঈশ্বরের নির্দেশ। ঈশ্বরই আপনার বাবাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনাকে হত্যা করতে এবং তার উদ্দেশ্যে বিসর্জন দিতে। কিন্তু পরে দেখা যায়, ঈশ্বর আসলে পরীক্ষা করছিলেন, ঈশ্বরের প্রতি আপনার বাবার আনুগত্যের একটি পরীক্ষা। আপনার বাবাকে প্রমাণ করতে হবে, তিনি ঈশ্বরকে এতটাই ভালোবাসেন যে, তিনি এমনকি এর জন্য আপনাকেও হত্যা করতে পারেন, যদি সেটি করতে ঈশ্বর তাকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি তার নিজের প্রিয় সন্তানকে যতটা ভালোবাসেন তারচেয়ে বেশি পরিমানে ঈশ্বরকে ভালোবাসেন। আর যখনই ঈশ্বর তার প্রমাণ পেয়েছিলেন যে এমন একটি কঠিন পরীক্ষা দেবার জন্যে আপনার বাবা আসলেই আসলেই প্রস্তুত, তিনি ঠিক সময়মত হস্তক্ষেপ করেছিলেন। হ্যাঁ.... আমি একটু ঠাট্টা করছিলাম! এপ্রিল ফুল! আমি আসলেই এমন কিছু করানোর কথা ভাবিনি। হ্যাঁ, দারুন একটি ঠাট্টা, তাই না?

কারো সাথে এর চেয়ে নিষ্ঠুর কোনো ঠাট্টা কী আসলেই কল্পনা করা সম্ভব হবে পারে? একটি কৌশল যা পরিকল্পিতভাবে একটি শিশুকে সারা জীবনের জন্যে ভয়াবহ একটি স্মৃতির ভারে ভারাবনত করে রাখবে, পিতা পুত্রের সম্পর্কটিকে বিষাক্ত করে তুলবে। কিন্তু ঠিক সেটাই বাইবেল বলেছে ঈশ্বর করেছিলেন। জেনেসিসের ২২ তম অধ্যায়ে পুরো গল্পটি পড়ে দেখুন। পিতাটি ছিলেন আব্রাহাম, আর শিশুটি তার ছেলে আইজাক।

একই গল্প কুর'আনেও বলা হয়েছে (৩৭:৯৯-১১১); তবে এখানে ছেলের নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে ইসলামের একটি ঐতিহ্য অনুযায়ী এটি ছিলেন আব্রাহামের অন্য ছেলেটি (ভিন্ন মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া) ইশমায়েল। কুর'আনের সংস্করণে, আব্রাহামের একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে তিনি নিজেকে তার ছেলেকে বিসর্জন দিতে দেখেছিলেন। একটি স্বপ্নই যথেষ্ট ছিল তাকে প্ররোচিত করতে যে, এটি নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্দেশ, এবং তিনি তার পুত্রের মতামত জিজ্ঞাসা করেছিলেন।আরেকটি ইসলামী ঐতিহ্য বলছে - এই সংস্করণটি মূল কুর'আনে নেই - শয়তান চেষ্টা করেছিলেন আব্রাহামকে

প্ররোচিত করতে যে, তিনি যেন এই ভয়ঙ্কর কাজটি না করেন। এই পরিস্থিতিটি দেখে অন্তত মনে হতে পারে শয়তান এই গল্পে ভালো একটি চরিত্র। কিন্তু আব্রাহাম, তার স্বপ্নকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে পাথর ছুড়ে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মসুলমানরা এখনো প্রতীকীভাবে ইদুল আজহার বাৎসরিক উৎসবে এই পাথর ছোড়ার বিষয়টি পুন-মঞ্চস্থ করে থাকেন।

আপনি যদি আইজাক (বা ইশমায়েল) হয়ে থাকেন, আপনি কী কখনো আপনার বাবাকে ক্ষমা করতে পারবেন? যদি আপনি আব্রাহাম হয়ে থাকেন, আপনি কী কোনোদিনও ঈশ্বরকে ক্ষমা করতে পারতেন? যদি এমন কিছু আধুনিক এই সময়ে ঘটতো, তার নিজের সন্তানের প্রতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর আচরণ করার জন্য আব্রাহামকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হতো। আপনি কী কল্পনা করতে পারছেন, বিচারক কী বলতে পারেন, যদি একজন ব্যক্তি তার আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে, 'কিন্তু আমি তো শুধুমাত্র ঈশ্বরের নির্দেশ মান্য করছিলাম'। 'কার নির্দেশ'? 'বেশ, ইয়োর অনার, 'আমি আমার মাথার মধ্যে সেই কণ্ঠস্বরটি শুনেছি', অথবা 'আমি এই স্বপ্নটি দেখেছিলাম'। আপনি কী ভাবতেন, যদি আপনি এই বিচারের একজন জুরি হতেন? আপনার কী এমন কিছু করার জন্যে এটিকে যথেষ্ট ভালো কোনো অজুহাত মনে হতো? অথবা আপনি কী আব্রাহামকে জেলে পাঠাতেন?

সৌভাগ্যজনকভাবে এমন কিছূ আসলে ঘটেছিল সেটি ভাবার কোনো কারণ নেই। বাইবেলের অধিকাংশ কাহিনীর মতোই, যেমন আমরা অধ্যায় ২ এব ৩ এ দেখেছি, এর পক্ষে কোনো ভালো প্রমাণের অস্তিত্ব নেই। আসলেই আব্রাহাম আর আইজাক, কারোরই আদৌ অস্তিত্ব ছিল কিনা তার সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। ধরুন এটি 'লিটল রেড রাইডিং হুডে'র গল্পের চেয়ে আদৌ বেশি কিছু না (এবং সেটি বেশি অস্বস্তিকর একটি গল্প, কিন্তু তারপরও সবারই জানা আছে যে এটি একটি কল্পকাহিনী)। কিন্তু এখানে মূল বক্তব্যটি হচ্ছে, কাহিনী বা বাস্তবতা যা-ই হোক না কেন, বাইবেলকে আমাদের সামনে এখনো একটি 'গড বুক' হিসাবে উপস্থাপন করা হয় । এবং এর কেন্দ্রীয় চরিত্র ঈশ্বরকে (বা গড) পরম শুদ্ধ আর শুভ একটি চরিত্র হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। বহু খ্রিস্টান এখনো বাইবেলকে আক্ষরিকভাবে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে বিবেচনা করেন। পঞ্চম অধ্যায়ে যেমন আমরা দেখবো, তারা মনে করেন ঈশ্বর-বিশ্বাস করা ছাড়া ভালো হওয়া অসম্ভব - এমনকি 'ভালো' বলতে কী বোঝায় সেটি অনুধাবন করাও অসম্ভব।

উভয় কাহিনীতে - ঈশ্বর আব্রাহাম আর জবকে পরীক্ষা করে দেখছেন - আমি অনুভব না করে পারছি না - এই ঈশ্বর চরিত্রটি শুধু নিষ্ঠুরই নন - এছাড়াও তিনি

ভয়ানক নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত। যেন ঈশ্বর হচ্ছেন কোনো একটি উপন্যাসে ঈর্ষাকাতর স্ত্রীর মত, যিনি তার স্বামীর বিশ্বস্ততা নিয়ে এতটাই অনিশ্চয়তায় ভুগছেন যে, তিনি পরিকল্পিতভাবে অবিশ্বস্ততার ফাঁদে তাকে আটকাতে চেষ্টা করেন: হয়তো কোনো আকর্ষণীয় নারী-বন্ধুকে প্ররোচিত করে রাজি করান তার স্বামীকে প্রলুব্ধ করতে, শুধুমাত্র নিজের কাছে প্রমাণ করতে যে, সব প্রলোভন সত্ত্বেও স্বামী তার প্রতি অনুগত থাকবেন। এবং যদি ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হয়ে থাকেন, আপনি হয়তো ভাবতেই পারেন, পরীক্ষা নেয়া হলে আব্রাহাম কীভাবে আচরণ করতে পারেন সেটি নিশ্চয়ই তার আগে থেকে জানার কথা।

বাইবেলে ঈশ্বর চরিত্র প্রায়শই নিজেকে ঈর্ষাকাতর একটি চরিত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। একটি জায়গায় তিনি এমনকি বলেছেন তার 'নাম' হচ্ছে 'ঈর্ষাকাতর'। কিন্তু যেখানে সাধারণ মানুষ তাদের রোমান্টিক বা ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে ঈর্ষাকাতর, ঈশ্বর অন্য ঈশ্বর বা দেব-দেবীদের নিয়ে ঈর্ষাকাতর ছিলেন। মাঝে মাঝে তার ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠার উপযুক্ত কারণও ছিল। প্রথম অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখেছিলাম, আদি হিব্রু গোষ্ঠীগুলো আধুনিক অর্থে সম্পূর্ণভাবে একেশ্বরবাদী ছিলেন না। তারা তাদের গোত্র দেবতা হিসাবে ইয়াওয়ের প্রতি অনুগত ছিলেন, কিন্তু তার মানে এই না যে, তারা প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলোর দেব-দেবীদের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতেন। তারা শুধু ভাবতেন যে, তাদের ইয়াওয়ে আরো বেশি শক্তিশালী, তাদের আরো বেশি সমর্থন ও ভক্তি পাবার যোগ্য। এবং মাঝে মাঝে তারা অন্য দেবতাদের উপাসনা করতেও প্রলুব্ধ হতেন - এবং এর পরিণতি ভয়ানক হতো যদি তাদের নিজস্ব ঈশ্বরের কাছে এ কাজ করার সময় তারা ধরা পড়তেন।

একটি ঘটনায়, বাইবেল যেভাবে আমাদের বলেছে, ইসরায়েলাইটদের কিংবদন্তী নেতা মোজেস ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে একটি পাহাড়ের উপর উঠেছিলেন। কিন্তু যখন মোজেস বেশ অনেক দিন ধরেই অনুপস্থিত ছিলেন, তার অনুসারীরা চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন যে, তিনি আর হয়তো কখনো ফিরবেন না। মোজেস যেহেতু অনুপস্থিত, তারা মোজেসের ভাই অ্যারোনকে প্ররোচিত করেছিলেন সবার কাছ থেকে প্রচুর পরিমানে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে, তারপর সেগুলো গলিয়ে তাদের একটি নতুন দেবতা গড়ে দিতে: একটি সোনালী বাছুর। তারা সেই বাছুরের সামনে মাথা নত করে সেটি উপাসনা করতে শুরু করেছিলেন। বিষয়টি অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু ষাড়সহ বিভিন্ন প্রাণী মূর্তি উপাসনা করা সে সময়ে স্থানীয় গোত্রগুলোর মধ্যে খুবই সাধারণ একটি বিষয় ছিল। মোজেস জানতেন না তার অনুসারীরা ঈশ্বরের সাথে প্রতারণা করছেন।

কিন্তু ঈশ্বর নিজে খুব স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছিলেন ইজরায়েলাইটরা কী করছিল, ঈর্ষায় উন্মত্ত হয়ে, এই উপাসনা বন্ধ করতে তিনি দ্রুত মোজেসকে পাহাড় চুড়া থেকে নীচে পাঠান। মোজেস দ্রুত নীচে নেমে আসেন এবং স্বর্ণ বাছুরটি নিজের দখলে নিয়ে এটিকে পুড়িয়ে পিষে পাউডারে পরিণত করেন, তারপর সেই পাউডার পানির সাথে মিশিয়ে তার অনুসারীদের পান করতে বাধ্য করেন। ইসরায়েলাইটদের একটি গোত্র ছিল লিভাইট, তারা এই সোনালী বাছুরের উপাসনায় নিজেদের প্রলুব্ধ হতে দেননি। সুতরাং মোজেসের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রতিটি লিভাইটকে তলোয়ার হাতে নিতে, এবং তাদের পক্ষে যতটা সম্ভব তত সংখ্যক অন্য গোত্রীয় সদস্যদের হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এই নির্দেশের পরিণতিতে মৃতে সংখ্যা দাড়িয়েছিল প্রায় তিন হাজার। কিন্তু এমনকি এটিও ঈশ্বরের উন্মত্ত ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারেনি। যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদের ধ্বংস করতে তিনি মড়ক পাঠিয়েছিলেন। আপনি যদি জানেন আপনার জন্যে কী ভালো, আপনি কখনোই এই ঈশ্বর চরিত্রটিকে ক্ষুদ্ধ করে তোলার মত কোনো কাজ করতে সতর্ক থাকবেন। সর্বোপরি, অন্য কোনো দেবতার (বা দেবী) দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পর্যন্ত করবেন না।

বেশ, পাহাড় চূড়ায় মোজেস ঈশ্বরের সাথে কী করছিলেন? অন্যান্য কাজের মধ্যে একটি ছিল সেখানে তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে বিখ্যাত ‘টেন কম্যান্ডমেন্টস’ (দশ নির্দেশ) গ্রহন করছিলেন, যে নির্দেশগুলো পাথরের চ্যাপটা খণ্ড বা ট্যাবলেটের উপর খোদাই করে করে লেখা ছিল। তিনি সেগুলো তার সাথে করে নীচে নেমে এসেছিলেন, কিন্তু স্বর্ণ বাছুরের পুজা করতে দেখতে তিনি এতই ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি সেই ট্যাবলেটগুলো হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলেন এবং ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। কোনো সমস্যা নেই: ঈশ্বর তাকে আরেক সেট কম্যান্ডমেন্ট দিয়েছিলেন, এবং বাইবেলের দুটি পৃথক জায়গায় আমাদের বলা হয়েছে, সেই পাথরের ট্যাবলেটে কী নির্দেশ খোদাই করা ছিল। আজ যদি আপনি কোনো খ্রিস্টানকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তারা ভাবেন যে তাদের ধর্ম একটি ভালো, আর শুদ্ধের সপক্ষে একটি শক্তি, তারা প্রায়শই টেন কম্যান্ডমেন্টসের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু যখন আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি এই দশটি কম্যান্ডমেন্টস আসলে কী ছিল, আমি দেখেছি, প্রায়শই তারা কেবল একটি নির্দেশ মনে করতে পারেন: ‘দাউ স্যাল নট কিল’ - তোমরা হত্যা করবে না।

আমি বলবো এই নির্দেশটি অবশ্যই খুব সুস্পষ্ট একটি নিয়ম নৈতিক আর ভালো একটি জীবনের পূর্বশর্ত। আর এমন একটি আইন, যা পাথরের উপর খোদাই

করে লিখে দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না বললেই চলে। কিন্তু, আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখবো, আসলেই এই নির্দেশটির মানে হচ্ছে শুধু 'তুমি তোমার নিজস্ব গোত্রের সদস্যকে হত্যা করবে না'। যদি আপনি ভিন্ন গোত্রের সদস্যদের কাউকে হত্যা করেন ঈশ্বরের কোনো সমস্যা নেই। আমরা এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে সেটি দেখবো, ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর সারাক্ষণই তার 'নির্বাচিত' জনগোষ্ঠীকে অন্য গোত্রের মানুষদের হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করতে ফেলার তাগাদা দিয়েছেন, এবং সেটি তিনি করতে বলেছেন রক্তপিপাসু নিষ্ঠুরতার সাথে - যার তুলনা কোনো কল্পকাহিনীর বইতেও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে যা-ই হোক না কেন, 'তোমরা হত্যা করবে না', ঈশ্বরের সেই দশটি নির্দেশের মধ্যে কোনো বিশেষ গৌরবময় অবস্থানে কিন্তু নেই। এই নির্দেশনাগুলো প্রকৃত অনুক্রম নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহ্যের ব্যাখ্যাগুলো পারস্পরিক খানিকটা ভিন্নতা প্রদর্শন করে, কিন্তু সেগুলোর প্রত্যেকটি প্রথম নির্দেশনার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে: 'আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো দেব-দেবী(রা) থাকবে না'। আবারও সেই ঈর্ষা।

> প্রভু একজন ঈর্ষাকাতর আর প্রতিশোধপরায়ন ঈশ্বর; ঈশ্বর প্রতিশোধ নেন এবং তিনি অত্যন্ত রাগী (নাহুম ১:২),
>
> আর কোনো দেবতা বা ঈশ্বরের উপাসনা করবে না, কারণ প্রভু, যার নাম ঈর্ষা, একজন ঈর্ষাকাতর ঈশ্বর (এক্সোডাস, ৩৪:১৪)।

বাইবেল অনুসারে ঈশ্বরের ক্ষুদ্র কৌশলগুলোর একটি হচ্ছে পুড়তে থাকা বা জ্বলন্ত মাংসের গন্ধের প্রতি তার ভালোবাসা: সাধারণত মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর মাংস, কিন্তু সবসময় না। যখন তিনি আব্রাহামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আইজাককে আগুনে পোড়াতে, এর কারণ হিসাবে আব্রাহাম বুঝেছিলেন, এটি ঈশ্বরের সুস্বাদু ধোয়ার দীর্ঘমেয়াদী ক্ষুধা। একেবারে শেষ মুহূর্তে আইজাককে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করার পর, ঈশ্বর একটি বড় ছাগলকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন যেন তার শিংগুলো নিকটবর্তীএকটি ঝোপের মধ্যে আটকে যায় । আব্রাহাম সেই বার্তাটি পড়তে পেরেছিলেন। তিনি সেই অসহায় প্রাণীটিকে হত্যা করেন এবং আইজাকের মাংসের ধোয়ার পরিবর্তে খাসির মাংসের ধোয়া দিয়ে তিনি ঈশ্বরের সেই নেশার চাহিদা মেটান। আনুষ্ঠানিক খ্রিস্ট ধর্মীয় 'রবিবারের' স্কুলের ব্যাখ্যায় এই ছাগলের হঠাৎ আবির্ভাব ছিল মানুষকে নির্দেশ দেবার ঈশ্বরের একটি উপায়, মানুষ বিসর্জন বন্ধ করে তার পরিবর্তে প্রাণী বির্জসন দাও। কিন্তু সেই দিনগুলোয় এই গল্পের ঈশ্বর চরিত্রের একটি অভ্যাস ছিল - তিনি মানুষের সাথে কথা বলতেন। কারণ আর যা-ই হোক না

কেন তিনি নিজেই কিন্তু আইজাককে হত্যা করতে আব্রাহামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং আপনি হয়তো ভাবতে পারেন তিনি সরাসরি শব্দে সবাইকে মানুষের বদলে বরং ভেড়ার বিসর্জন দেবার নির্দেশ দিতেই পারতেন। কেন বেচারা আইজাককে এই ভয়ঙ্কর নাটকে অংশ নিতে বাধ্য করা হলো? যদি আপনি বাইবেল পড়েন, আপনি দেখতে পাবেন যে, এখানে বার্তাগুলো সুস্পষ্ট আর সরলভাবে না বলে ঘুরিয়ে পেচিয়ে, প্রতীকী একটি উপায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমি না ভেবে পারছি না যে, একজন আসলেই ভালো ঈশ্বর এমনকি ভেড়া বিসর্জন দিতেও তাদের নিষেধ করতেন।

ঈশ্বর কেন আগের মত আর মানুষের সাথে কথা বলেন না, যেমন তিনি আব্রাহামের সাথে বলেছিলেন? ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু অংশে আমরা দেখি তিনি স্পষ্টতই তার মুখ বন্ধ করেই রাখতে পারেন না। তিনি সম্ভবত প্রায় প্রতিদিনই মোজেসের সাথে কথা বলেছিলেন। কিন্তু আজ কেউ তার থেকে সামান্যতম আওয়াজই শুনতে পান না, অথবা যদি তারা সেটি শোনেন, আমরা মনে করি তার মানসিক চিকিৎসার দরকার আছে। শুধুমাত্র এটা কী আপনাকে কখনো ভাবিয়েছে, আসলেই ঐসব প্রাচীন গল্পগুলো হয়তো সত্য নাও হতে পারে?

আরো একটি কাহিনী বর্ণনা করছি যা ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষ কতটা ভালো সেটি ভাবতে হয়তো আপনাকে বাধ্য করতে পারে। বুক অব জাজেসের এগারো অধ্যায়ে আমরা যেফতাহ নামক একজন ইসরায়েলাইট সেনাপতির দেখা পাই, আমোনাইটস নামে প্রতিদ্বন্দ্বী একটি গোত্রের সাথে যুদ্ধে তার একটি বিজয়ের খুব দরকার ছিল। একটি জয়ের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন যেফথাহ, সুতরাং তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমোনাইটদের বিরুদ্ধে যদি তিনি তাকে বিজয়ী করেন, তিনি যুদ্ধ শেষে বাড়িতে ফেরার পর প্রথম যে প্রাণীকে দেখবেন সেটিকে আগুনে পুড়িয়ে তার উদ্দেশ্যে বিসর্জন দেবেন। এবং প্রচুর পরিমানে রক্তপাতের পর যথারীতি ঈশ্বর তাকে বিজয় উপহার দিয়েছিলেন, যা তিনি চেয়েছিলেন। হতভাগ্য আমোনাইটরা, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন। কিন্তু পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছিল, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাড়িতে ফেরার পর প্রথম যে প্রাণীটি তাকে স্বাগত জানাতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল সে ছিল তার প্রিয় ও একমাত্র কন্যা। আনন্দে নাচতে নাচতে তার প্রিয় বিজয়ী পিতাকে স্বাগতম জানাতে সে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আর যেফতাহ ঈশ্বরের প্রতি তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে আতঙ্কে থমকে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার এর থেকে নিস্তার পাবার কোনো উপায় ছিল না। তার প্রিয় কন্যাকে অবশ্যই আগুনে পুড়িয়ে বিসর্জন দিতে হবে। ঈশ্বর তার জন্য প্রতিশ্রুত পোড়া মাংসের গন্ধের

জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তার কন্যা ভদ্রভাবেই এই বিসর্জনের শিকার হতে রাজী হয়েছিলেন, শুধুমাত্র তার কুমারীত্বের জন্য শোক করতে দুই মাসের জন্যে পাহাড়ে যাবার অনুমতি চেয়েছিলেন । দুই মাস পরে তিনি তার কর্তব্য পালন করতে ফিরে এসেছিলেন, যেফতাহ তার প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন, তার কন্যাকে আগুনে পুড়িয়ে বিসর্জন দিয়েছিলেন, যেন ঈশ্বর চমৎকার আর সন্তোষজনক মাংস পোড়ার গন্ধ নিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে ঈশ্বর আব্রাহাম আর আইজাকের গল্পের সেই শিক্ষার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, এবং কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করেননি। দুঃখিত, কন্যা, এত ভদ্রভাবে এটি মেনে নেবার জন্যে ধন্যবাদ, এবং ধন্যবাদ, একজন কুমারী হয়ে থাকার জন্যেও, কোনো বিচিত্র কারণ এটি এই বিসর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার ছিল (অনুচ্ছেদ ৩৯)।

কেনই বা যেফতাহ আমোনাইটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন আর কেনই বা ঈশ্বর তাকে জিততে সহায়তা করেছিলেন? এই ধরনের বহু রক্তপিপাসু যুদ্ধের কাহিনী দিয়ে ওল্ড টেস্টামেন্ট পূর্ণ। এবং যখনই ইজরায়েলাইটরা যুদ্ধ জয় লাভ করেছে, রক্তপিপাসু যুদ্ধের ঈশ্বরকে এর কৃতিত্ব দেয়া হয়েছে। বুক অব জশুয়া এবং জাজেস মূলত মিশরের বন্দীত্ব থেকে মোজেস তাদের পথ দেখিয়ে বের করে নিয়ে আসার পর ইসারায়েলাইটদের সামরিক অভিযানগুলোর কাহিনী নিয়ে রচিত। এই সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমিটির দখল নেয়া। এটাই ছিল ইসরায়েল, সমৃদ্ধি আর প্রাচুর্যের সেই দেশ –'মধু আর দুধ প্রবাহিত হয় যে দেশে'। আর সেখানে বহু আগে থেকে বসবাস করা অধিবাসীদের গণহত্যায় নিশ্চিহ্ন করে দেবার মাধ্যমে এর দখল নিতে ঈশ্বর তাদের সহায়তা করেছিলেন।এখানে ঈশ্বরের নির্দেশে আদৌ কোনো অস্পষ্টতা ছিল না, বরং সেগুলো ছিল খুবই ভয়ঙ্করভাবে সুস্পষ্ট:

> 'যখন তোমরা জর্ডান (নদী) অতিক্রম করে কানানে প্রবেশ করবে, তোমাদের সন্মুখের সেই দেশটি থেকে সব অধিবাসীদের বের করে দেবে। তাদের সব খোদাই করা ছবি আর বানানো মূর্তি আর পবিত্র স্থানগুলো ধ্বংস করবে। সেই ভূমির দখল নেবে, এবং সেখানে বসতি গড়বে, কারণ এই দেশটিকে তোমাদের নিজের করে নিতে আমি সেটি তোমাদের দান করেছি'। (নাম্বার্স ৩৩: ৫১-৩)।

'কারণ এই দেশটিকে তোমাদের নিজের করে নিতে আমি সেটি তোমাদের দান করেছি'.. কী..? যুদ্ধ করার জন্যে এটি কী কোনো ভালো উদ্দেশ্য হতে পারে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আডোলফ হিটলার পোল্যান্ড, রাশিয়া আর পূর্ব দিকের

অন্যদেশগুলোয় জার্মানির আগ্রাসনকে যুক্তিযুক্ত করেছিল এই বলে যে শ্রেষ্ঠতম জার্মান জাতির 'লেবেনসরাম' বা বসবাস করার জায়গা দরকার। আর ঠিক সেটাই ঈশ্বর তার 'নির্বাচিত জনগোষ্ঠীকে' যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের দাবি করে নেবার তাগাদা দিয়েছিলেন। যে গোত্রগুলোর সাথে তাদের দেখা হবে প্রতিশ্রুত ভূমিতে যাবার পথে, এবং যারা ইতোমধ্যেই প্রতিশ্রুত ভূমির অধিবাসী, এই দুটি গোত্রের মধ্যে বিভেদ করার ক্ষেত্রে ঈশ্বর যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথম গোত্রগুলোর (যাদের সাথে তাদের গন্তব্যে যাবার পথে দেখা হবে) ক্ষেত্রে প্রথমে শান্তি প্রস্তাব দিতে হবে, যদি তারা রাজি হয়, তাহলে অল্পেই তারা পার পেয়ে যাবে। আর সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র পুরুষদের হত্যা করা হবে আর নারীদের যৌনদাসী হিসাবে বন্দী করে রাখা হবে।

কিন্তু সেই হতভাগ্য গোত্রগুলো যারা সেই 'লেবেনসরামে' বসবাস করছিলেন তাদের নিয়তিতে অপেক্ষাকৃত কম মৃদু আচরণ অপেক্ষা করে ছিল, যে ভূখণ্ডটি অধিকার করতে ঈশ্বর তার নির্বাচিত জনগোষ্ঠীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন:

> তবে, সেই জাতিগুলোর শহরগুলো, যা তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের উত্তরাধিকার হিসাবে দান করছেন, যেখান শ্বাস নেয় এমন কিছুই তোমরা ছেড়ে দেবে না, পুরোপুরিভাবে তাদের ধ্বংস করবে - হিটাইট, আমোরাইট, কানানাইট, পেরিজাইট, হিভাইট আর জেবুসাইট - যেভাবে তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের এই নির্দেশ দান করেছেন (ডিউটেরোনমি, ২০:১৬)।

কী করতে হবে সেই বিষয়ে এখানে ঈশ্বর আসলেই সুস্পষ্টভাবেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং তার এই নিষ্ঠুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছিল। শুধুমাত্র প্রতিশ্রুত ভূমি বিজয়ের সময় নয়, পুরো ওল্ড টেস্টামেন্ট জুড়ে আমরা এটি দেখতে পাই:

> এখন যাও, আমালেকাইটদের আক্রমণ করো, তাদের যা কিছু আছে তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করো। তাদের কাউকে ছাড় দেবে না, নারী পুরুষ শিশু গবাদী পশু, ভেড়া, উট কিংবা গাধা, সব কিছু হত্যা করো। (১ স্যামুয়েল ১৫:২)।

এমনকি শিশুদের হত্যা করারও নির্দেশ দিয়েছলেন ঈশ্বর। বিশেষ করে ছেলে শিশুদের, মেয়ে শিশুদের বাঁচিয়ে রাখা সুবিধাজনক হতে হবে.. তাদের বাঁচিয়ে রাখার যৌক্তিকতা..... বেশ, আপনি নিজেই সেই বইটি পড়ে দেখুন, এবং আপনার কল্পনা ব্যবহার করুন (বেশি কল্পনা করার দরকার হবে না)।

> এখন সব বালকদের হত্যা করো। এবং সব নারীকে হত্যা করো যারা কোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গী হয়েছি, এবং তোমাদের জন্য সে সব প্রতিটি মেয়ে শিশুকে বাচিয়ে রাখো যারা কখনোই কোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গী হয়নি (নাম্বার্স ৩১: ১৭-১৮)।

এখন আমরা এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে জাতিগত বিশোধন এবং শিশু নির্যাতন হিসাবে চিহ্নিত করি।

ধর্মতাত্ত্বিকরা বাইবেলের এটি এবং এ ধরনের বহু অনুচ্ছেদ নিয়ে বিব্রত। তাদের কৃতজ্ঞ হবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা এবং গবেষণা ওল্ড টেস্টামেন্টের এইসব কাহিনীর কোনোটারই কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পায়নি।

ধর্মতাত্ত্বিকরা এইসব রক্তাক্ত ভয়াবহ কাহিনীগুলোকে 'প্রতীকী পুরাণ' হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, অনেকটাই যেন ইসপের উপকথাগুলোর মত নীতিগল্প, যার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ঠিক আছে, যদিও আপনি হয়তো ভাবতে পারেন এসব ভয়াবহ কাহিনীগুলোর মধ্যে কীভাবে আপনি শ্লীল কোনো নীতিবাক্য খুঁজে পেতে পারেন: সহিংসাপূর্ণ রক্তপিপাসু কাহিনী, লেবেনসরামের জন্যে যুদ্ধ, জাতিগত বিশোধনের জন্য গণহত্যা, নারী এবং মেয়ে শিশুদের পুরুষদের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করা, যারা ধর্ষণযোগ্য এবং যৌনদাসী হিসাবে ব্যবহার করা।

আধুনিক খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিকরা মাঝে মাঝে ওল্ড টেস্টামেন্টকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেন, তারা স্বস্তির সাথে নিউ টেস্টামেন্টের প্রতি মনোযোগ নির্দেশিত করেন, যেখানে যিশুকে তার ভয়ঙ্কর স্বর্গীয় পিতার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি নম্র এবং ভদ্র মনে হতে পারে। যিশু নিজে অবশ্য এই পার্থক্যের ব্যাপারে খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না। জনের গসপেলে আমরা তাকে বলতে শুনি, 'আমি এবং পিতা, দুজনেই এক' এবং 'আমার মধ্যেই আছেন পিতা, আর পিতার মধ্যেই আমি আছি' এবং 'যারাই আমাকে দেখেছে তারা পিতাকেও দেখেছে'। তবে যা-ই হোক না কেন, গসপেলে যিশু চরিত্রটি অনেক ভালো কথাই বলেছিলেন। বুক অব ম্যাথিউতে বর্ণিত সার্মন অন দ্য মাউন্ট প্রদর্শন করছে যে তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন, এবং তার সময়ের চেয়ে তার চিন্তায় অনেক অগ্রসর ছিলেন। অথবা যদি তার কোনো অস্তিত্ব না থেকে থাকে, সংখ্যালঘু কিছু গবেষকরা সাধারণত যা মনে করেন, যিশু নামের এই কাল্পনিক চরিত্রটি ভদ্র একটি চরিত্র ছিলেন। কিন্তু সার্মন অন দ্য মাউন্টে তার ভাবাবেগ যতই মহান

হোক না কেন, খ্রিস্টান ধর্মের কেন্দ্রীয় মতবাদ, যা সেইন্ট পল প্রচার করেছিলেন, সেই ধর্মের যিনি প্রধান স্থপতি, সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যাপার ছিল।

সেন্ট পলের খ্রিস্টধর্ম অর্থাৎ প্রায় সব আধুনিক খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা, আমি, আপনি, যারা কোনো এক সময় বেঁচে ছিলেন এবং যারা ভবিষ্যতে জন্মাবেন, সবাইকে জন্মপাপী (যারা পাপ নিয়েই জন্মগ্রহন করেন) হিসাবে বিবেচনা করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন আমরা দেখেছিলাম, মেরির 'ইমম্যাকিউলেট কনসেপশন' (পাপমুক্ত গর্ভধারণ) ইঙ্গিত করছে যে, একমাত্র তিনি এই পাপপূর্ণ জন্মের কলঙ্ক থেকে মুক্ত। পাপের ধারণাটি নিয়ে পল মূলত আচ্ছন্ন ছিলেন, আপনি তার লেখা পড়লে এমন একটি ধারণা পাবেন যে, তার নিজের সৃষ্টি করা এই সুবিশাল সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের অন্য যে-কোনো কিছুর তুলনায় ঈশ্বর ক্ষুদ্র একটি গ্রহে বসবাসকারী একটি প্রজাতির পাপ নিয়ে অতিমাত্রায় আগ্রহী। পল এবং আদি খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করতেন যে, আমরা সবাই ঈশ্বর সৃষ্ট প্রথম মানব আদমের পাপ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। কথা বলতে সক্ষম একটি সাপের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি করা প্রথম নারী হাওয়া আদমকে ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করতে প্রলুব্ধ করেছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখেছিলাম, তাদের পাপটি (ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করা) ছিল একটি ফল খাওয়া, যে ফল কখনোই স্পর্শ না করতে ঈশ্বর তাদের দুইজনকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই ভয়ঙ্কর পাপ, এতই ভয়ানক যে, ঈশ্বরকে সেটি এতই ক্ষুব্ধ করেছিল যে, তিনি তাদেরকে গার্ডেন অব ইডেন থেকে বের করে দিয়েছিলেন, এবং তাদের বংশধরদের কঠোর পরিশ্রমের একটি জীবনের দণ্ডে অভিশপ্ত করেছিলেন। আর ধারণা করা হয় আমরা সবাই উত্তরাধিকার সূত্রে এই 'ভয়ঙ্কর' পাপের কারণে পাপী। খ্রিস্টান ধর্মের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ধর্মতাত্ত্বিকদের একজন সেন্ট অগাস্টিনের মতে এই 'অরিজিনাল সিন' (আদি বা মূল পাপ) আদম থেকে তার পুরুষ বংশধররা শুক্রাণু বহনকারী বীর্যের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে পায়।

এমন কী সদ্যজাত একজন শিশু, কোনো কিছু করার জন্য যে কিনা খুবই ছোটো, ভুল কিছু করা তো দূরের কথা, এমনকি সেও তার ক্ষুদ্র কাধে এই আদি পাপের বিশাল বোঝা বহন করে জন্মগ্রহন করে। আপাতদৃষ্টিতে পল ও তার খ্রিস্টান অনুসারীরা মনে করেন, সিন (বড় হাতের 'এস' সহ) বা পাপ হচ্ছে বিশেষ কোনো এক ধরনের বিষণ্ন আত্মা: শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট কিছু মানুষের মাঝে মাঝে করা মন্দ কাজগুলো নয়, বরং অশুভ বংশানুক্রমে পাওয়া একটি কলঙ্ক। পাপ নিয়ে জন্ম নেয়ার পর, নরকের আগুনে পোড়ার চিরন্তন অভিসম্পাত থেকে এক

মাত্র যে উপায়ে আমরা পালাতে পারি, সেটি হচ্ছে 'ব্যাপটাইজ' করা (খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেয়া) এবং যিশুর আত্ম-বিসর্জনের মৃত্যুর দ্বারা 'পাপমুক্ত' হওয়া। যিশুর মৃত্যু ছিল একটি আত্মবিসর্জন, ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণিত আগুনে পুড়িয়ে ঈশ্বরের প্রতি নির্দেশিত অগণিত বিসর্জনগুলোর মত, এই আত্মত্যাগের কারণ ছিল ঈশ্বরকে তুষ্ট করা এবং মানব জাতির সব পাপ, বিশেষ করে স্বর্গোদ্যানে আদমের সেই আদি পাপ (অরিজিনাল সিন) ক্ষমা করে দেবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি একটি প্রার্থনা।

এখন আমরা জানি যে, আদমের কখনোই অস্তিত্ব ছিল না। পৃথিবীতে যাদের কখনো অস্তিত্ব ছিল তাদের সবারই এক জোড়া বাবা-মা ছিলেন, এবং প্র-প্র-প্র-প্র -পিতা/মাতা-মহীদের একটি দীর্ঘ বংশধারা নানা ধরনের নরবানর, আদি-বানর হয়ে মাছ, কেঁচো এবং ব্যাকটেরিয়া অবধি বিস্তৃত। কখনোই কোনো প্রথম দম্পতি ছিল না, কখনোই একজন আদম কিংবা হাওয়া ছিল না। তথাকথিত 'ভয়ঙ্কর' এই পাপ করার মত কখনোই কেউ ছিলেন না, যে পাপের জন্য আমাদের সামষ্ঠিকভাবে অপরাধবোধ ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এমনকি যদিও পল ও আদি খ্রিস্টানরা সেটি জানতেন না, কিন্তু ঈশ্বর সম্ভবত সেটি জানতেন। আর মানুষ কী আসলেই কথা বলতে পারে এমন সাপের অস্তিত্বে কখনো বিশ্বাস করেছে? আসলেই, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি অনেকেই সম্ভবত বিশ্বাস করেছিলেন, কারণ অস্বস্তিতে ফেলার মত বিশাল সংখ্যক মানুষ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে এখনো সেটি বিশ্বাস করেন। কিন্তু বিষয়টি যদি একপাশে সরিয়েও রাখি, যিশুর মৃত্যু হয়েছিল আদম থেকে শুরু করে সব মানুষের পাপের 'প্রায়শ্চিত্ত' অথবা তাদের সে পাপ থেকে 'মুক্ত' করতে - এ ধারণাটি নিয়ে আপনি কী ভাবছেন? এটাই সেই মূল ধারণা যা আসলেই পুরো খ্রিস্টান ধর্মের কেন্দ্রীয় মতবাদ, যিশু আমাদের পাপের জন্য মারা (নিজেকে বিসর্জন করেছিলেন) গিয়েছিলেন। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের মূল্য হিসাবে তিনি তার নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যেন ঈশ্বর আমাদের সব পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

'প্রায়শ্চিত্ত' মানে কোনো ভুল বা মন্দ কাজের জন্যে মূল্য পরিশোধ করা। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, ঈশ্বর যদি আমাদের ক্ষমা করতেই চাইতেন, তিনি কি শুধু আমাদের ক্ষমা করে দিলেই পারতেন না? কিন্তু না, ঈশ্বর চরিত্রটির জন্যে এটাই যথেষ্ট ছিল না। এর জন্যে কাউকে অবশ্যই গুরুতর শারীরিক যন্ত্রণা এবং প্রাণনাশী দুঃখভোগ করতে হবে। 'রক্তপাত ছাড়া কোনো ক্ষমা নেই', 'লেটার টু দ্য হিব্রুস' (৯:২২) পত্রে পল লিখেছিলেন। সেইন্ট পল প্রায়শই

ব্যাখ্যা দিয়েছেন, খানিকটা ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে, 'যিশু খ্রিস্ট আমাদের পাপের জন্যে মারা গেছেন' (১ করিন্থিয়ান ১৫:৩)।

ধারণাটি হচ্ছে এমন (আমাকে দায়ী করবেন না, আমি শুধু আনুষ্ঠানিক খ্রিস্টান বিশ্বাসের বিবরণ দিচ্ছি): ঈশ্বর মানবজাতির সব পাপ ক্ষমা কর দিতে চেয়েছিলেন, যার মধ্যে সেই বিখ্যাত পাপটিও অন্তর্ভুক্ত, যা আমরা আদম থেকে আদি পাপ হিসাবে বংশানুক্রমে পেয়েছি (আদমের কখনো অস্তিত্ব ছিল না)। কিন্তু ঈশ্বর (যদিও দয়াশীল) এমনিতেই ক্ষমা করতে পারেন না। কারণ মানবতার জন্যে সেটি খুব সহজ হয়ে যাবে, বেশি বোধগম্য (যা কোনো পরম দয়াশীলের কাছে প্রত্যাশিত) হবে। আত্মবিসর্জন দেবার মাধ্যমে কাউকে না কাউকে এই সর্বজনীন ক্ষমার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু মানবতার পাপ এতই দানবীয় পরিমানের ছিল, পাপমোচনের জন্য সাধারণ কোনো বলিদান ঈশ্বরের নিকট যথেষ্ট মনে হয়নি। নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে ঈশ্বরের নিজের পুত্রের যন্ত্রণাময় মৃত্যু ছাড়া আর কোনো কিছুই এই পাপমুক্তির চড়া মূল্য পরিশোধ করতে পারেনি। হ্যাঁ, সুনির্দিষ্টভাবে যিশু পৃথিবীতে নেমে ('নেমে'?) এসেছিলেন যেন তাকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা যেতে পারে, এবং যন্ত্রণাময় এক মৃত্যুর জন্য কাঠের ক্রুশের উপর তাকে পেরেক দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা যায়, এবং এভাবেই তিনি পুরো মানব জাতির পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। আর কিছুই নয়, শুধুমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরের রক্তাক্ত বিসর্জন - কারণ যিশুকে মানব রূপে ঈশ্বর মনে করা হয় - মানবতাকে ভারাক্রান্ত করে রাখা পাপের সে সুবিশাল ভার থেকে মুক্তি দেবার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছিল।

আমি জানি না এই বিষয়টি নিয়ে আপনার ভাবনা কী হতে পারে, কিন্তু আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, এটি আসলেই খুব জঘন্য একটি ধারণা। ক্রুশের উপর যিশুর মৃত্যুর আগে যে-কোনো মুহূর্তে সর্বশক্তিমান একজন ঈশ্বর সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন, যেমন তিনি করেছিলেন আব্রাহাম যখন আইজাককে বিসর্জন করতে উদ্যত হয়েছিলেন: 'আরো থামো, কী করছো তোমরা, ঠিক আছে, আমার প্রিয় সন্তানের হাতের মধ্য দিয়ে ঐ পেরেকটি হাতুড়ি দিয়ে ঢোকানোর কোনো দরকার নেই। যা-ই হোক না কেন আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিচ্ছি। আসো চিন্তামুক্ত হয়ে মানবতার পাপ থেকে এই বিশ্বজনীন মুক্তির ঘটনাটি আমরা সবাই মিলে উদযাপন করি'।

না স্পষ্টতই খুব সরলতম সমাধানটি ঈশ্বরের জন্য যথেষ্ট মনে হয়নি। আমি যদি এটি নিয়ে কোনো নাটক রচনা করতাম, তাহলে আমি ঈশ্বরের মুখ দিয়ে এই সংলাপটি উচ্চারণ করাতাম:

‘বেশ, দেখি আমি কী করতে পারি, আমি এমনি এমনি মানব জাতিকে ক্ষমা করতে পারি না, তাদের পাপ অনেক বিশাল। আমি যদি তাদের তিন হাজার জনকে হত্যা করি তাহলে কেমন হয়, যেমন আমি করেছিলাম তাদের সেই স্বর্ণ-বাছুর পুজা করা নিয়ে উদ্ভুত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সময়? না, এমনকি তিন হাজার এর জন্যে যথেষ্ট নয়, অবশ্যই তিন হাজার সাধারণ মানুষ তো নয়ই, কারণ পাপটি অনেক বিশাল, যা মাত্র তিন হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। আমি বরং ভাবছি, কেন তাহলে আমি আমার নিজের ছেলেকে মানুষে পরিণত করছি না, তারপর তাকে নির্যাতনের শিকার করে, সমগ্র মানবতার জন্য হত্যা করছি না? হ্যাঁ, এটাকেই আমি বলবো একটি উপযুক্ত আত্মাহুতি। শুধুমাত্র যে-কোনো মানুষকে কেন হত্যা করবো, বরং মানুষ-রূপী ঈশ্বরকে হত্যা করা.. এটাই হবে দারুণ একটি সমাধান। মানব জাতির সব পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এটাই যথেষ্ট বড় একটি বিসর্জন হবে। আদমের পাপসহ (ওহ - আমারই ভুল - আমি ওদের বলতে সব সময় ভুলে যাই, আদমের কখনো অস্তিত্ব ছিল না)। বেশ পুত্র, তাহলে কাজে নেমে পড়ো। খুবই দুঃখিত এর চেয়ে ভালো কোনো সমাধান আমি আর দেখছি না। আর হ্যাঁ, তুমি আগুনের রথ নিয়ে পৃথিবীতে নামতে পারবে না, আমি তোমাকে একজন নারীর জরায়ুর মধ্যে রাখবো, তোমাকে জন্ম নিতে হবে, প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত হতে হবে, বয়ঃসন্ধির সংকট ইত্যাদি ঐসব কিছুসহ। এগুলো ছাড়া তুমি পুরোপুরিভাবে মানুষ হতে পারবে না, আর আমি অনুভব করতে পারবো না যে, তুমি আসলেই মানবতাকে প্রতিনিধিত্ব করছো যখন অবশেষে তাদেরকে বাঁচাতে আমি তোমাকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারা ব্যবস্থা করবো। যা-ই হোক না কেন ভুলে যাবে না, এখানে আমি নিজেও ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছি কিন্তু, কারণ আমি হচ্ছি তুমি আর তুমি হচ্ছো আমি’।

পরিহাস করছি? হ্যাঁ। খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে? হতে পারে। অন্যায়? আমি সত্যি তা মনে করি না, এবং দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন কেন আমি ক্ষমা চাইবো না। এই প্রায়শ্চিত্ত করার মতবাদটি, যা খ্রিস্টানরা আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসাবে গ্রহন করেছিলেন, সেটি এত গভীরভাবে জঘন্য একটি ব্যাপার যে, আসলেই এটি খুব হিংস্রভাবে পরিহাসযোগ্য। ঈশ্বর নাকি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, তিনি এই সম্পসারণশীল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, সেই সব ছায়াপথ সৃষ্টি করেছেন যেগুলো পরস্পর থেকে দ্রুত বহু দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি বিজ্ঞানের সূত্র

জানেন, গণিতের সূত্র জানেন। আর যা-ই হোক তিনি সেগুলো আবিষ্কার করেছেন, এবং খুব সম্ভবত তিনি কোয়ান্টাম মাধ্যাকর্ষণ আর ডার্ক ম্যাটারও বোঝেন, যা অবশ্যই যে-কোনো বিজ্ঞানী অপেক্ষা বেশি পরিমানেই হওয়ার কথা। তিনি আইন তৈরি করেন। যিনি আইন তৈরি করেন, তার এই সব আইন ভঙ্গকারী যে কাউকে ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তারপরও আমাদের বিশ্বাস করতে বলা হয়, মানব জাতিকে তাদের পাপের (বিশেষ করে আদমের পাপ, যার কিনা কোনো অস্তিত্বই ছিল না, সুতরাং তার পক্ষে পাপ করাও অসম্ভব) জন্য ক্ষমা করতে নিজেকে - তার নিজেকে - প্ররোচিত করতে তিনি মাত্র এই একটি উপায় চিন্তা করে বের করতে পেরেছিলেন। আর সেই উপায়টি ছিল মানবতার নামে নিজের পুত্রকে (আবার একই সাথে যিনি তিনি নিজেও) নির্যাতিত ও ক্রুশবিদ্ধ হতে মরতে দেয়া। সুতরাং যদিও ওল্ড টেস্টামেন্ট অসংখ্য ভয়ঙ্কর কাহিনী দিয়ে সমৃদ্ধ, সংখ্যায় যা নিউ টেস্টামেন্টের চেয়ে পরিমানে অনেক বেশি, কিন্তু আপনি বলতে পারবেন, নিউ টেস্টামেন্টের কেন্দ্রীয় বার্তাটি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হবার সেই নির্মম মর্যাদা পাবার শক্তিশালী দাবিদার হতে পারে।

শিষ্য জুডাস যিশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। তিনি যিশুর নিকট পথ দেখিয়ে রোমের সৈন্যদের নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে চিহ্নিত করেছিলেন তার গালে একটি চুমু খেয়ে। কোনো রাজনীতিবিদ যদি তার দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহলে তাকে একজন জুডাস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জকে প্রাকৃতিক-ভারসাম্য নষ্টকারী আমদানীকৃত ছাগল থেকে মুক্ত করার অভিযানটি একটি বিশেষ কৌশল ব্যবহার করেছিল, যাকে ‘জুডাস গোট’ নাম দেয়া হয়েছিল - স্ত্রী ছাগল যাদের গলায় একটি বিশেষ ধরনের রেডিও কলার লাগানো থাকবে, যা সেই বিশেষ ছাগলদের পালের অবস্থান এর উচ্ছেদকারীদের জানিয়ে দেবে। বহু শতাব্দী ধরেই জুডাসের নামটি বিশ্বাসঘাতক কোনো কর্মের সাথে জড়িয়ে আছে। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করে আবার জিজ্ঞাসা করা যায়, আসলেই কী জুডাসের সাথে সুবিচার করা হয়েছিল? ঈশ্বরের পুরো পরিকল্পনাই ছিল যিশুকে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করবেন, সুতরাং এটি করতে হলে তাকে গ্রেফতার হতে হবে। জুডাসের এই বিশ্বাসঘাতকতা এই পরিকল্পনার অপরিহার্য একটি অংশ। তাহলে খ্রিস্টানরা কেনো এই জুডাস নামটিকে এত ঘৃণা করেন। তিনি মানব জাতিকে পাপমুক্ত করার ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি ক্ষুদ্র অংশে তার দ্বায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এমনকি আরো খারাপ, পুরো ইহুদী জনগোষ্ঠীকে বহু শতাব্দীব্যাপী নির্যাতন করা হয়েছে, কারণ যিশুর মৃত্যুর জন্য খ্রিস্টানরা তাদেরক দায়ী করেছিল। ১৯৩৮ সালেও পোপ দ্বাদশ পায়াস (পোপ হবার এক বছর আগে) ইহুদীদের বর্ণনা করেছিলেন এমন একটি জনগোষ্ঠী হিসাবে , 'যাদের ঠোঁট অভিশাপ (খ্রিস্টকে) দেয়, যাদের হৃদয় এমনকি আজও তাকে প্রত্যাখ্যান করে'। এর চার বছর পর, যুদ্ধের সময় (ইটালি তখন হিটলারের মিত্র), পোপ জেরুজালেম সম্বন্ধে বলেছিলেন, এখনো তাদের সেই 'একই অনমনীয় অন্ধত্ব আর একগুঁয়ে অকৃতজ্ঞতা আছে, যা একদিন 'ঈশ্বরকে হত্যা করার মত অপরাধের পথে' তাদের পরিচালিত করেছিল। আর শুধুমাত্র ক্যাথলিকরাই নয়, মার্টিন লুথার, প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্ট ধর্মের জার্মান প্রতিষ্ঠাতা, ইহুদী স্কুল আর সিনাগগে (ইহুদী উপাসনালয়) আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবার মতো কর্মকাণ্ড সমর্থন করেছিলেন। লুথারের সেই অসুস্থ মাত্রার ইহুদী বিদ্বেষ ১৯২২ সালে অ্যাডোলফ হিটলারের দ্বারা প্রতিধ্বনিত্ব হয়েছে:

'একজন খ্রিস্টান হিসাবে আমার অনুভূতি একজন যোদ্ধা হিসাবে আমার প্রভু এবং ত্রাণকর্তার প্রতি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে। এটি আমাকে নির্দেশিত করছে একটি মানুষের প্রতি, যিনি একবার একাকীত্বে তার অনুসারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এসব ইহুদীদের প্রকৃত স্বরুপটি শনাক্ত করেছিলেন এবং এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সবাইকে আহবান করেছিলেন, এবং ঈশ্বরের সত্য যে, তিনি যন্ত্রণাভোগকারী হিসেবে নয় বরং একজন যোদ্ধা হিসাবে মহান। একজন খ্রিস্টান হিসাবে সীমাহীন ভালোবাসা আর একজন মানুষ হিসেবে আমি সেই অনুচ্ছেদগুলো পড়ি যা আমাদের বলে, কীভাবে বিষধর সর্বশাবকদের হাত থেকে মন্দির মুক্ত করতে প্রভু অবশেষে তার শক্তি নিয়ে উঠে দাড়িয়েছিলেন আর চাবুক হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ইহুদী বিষের বিরুদ্ধে পৃথিবীর জন্যে তার যুদ্ধ কত অসাধারণ ছিল। আজ, দুই হাজার বছর পর, গভীর আবেগে সাথে আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে আরো অধিক তীব্রতার সাথে সেই বাস্তবতার সামনে দাড়িয়ে আমি শনাক্ত করতে পারি এই কারণে ক্রুশের উপর তাকে রক্ত দিতে হয়েছিল। আর একজন খ্রিস্টান হিসাবে আমার নিজেকে প্রতারিত হতে দেয়া আমার কর্তব্য নয়, কিন্তু সত্য আর ন্যায়বিচারের জন্যে একজন যোদ্ধা হওয়া আমার কর্তব্য ... আর যদি কোনো কিছু থাকে যা আমাদের প্রদর্শন করতে পারে আমরা সঠিকভাবে কাজ করছি, সেটি হচ্ছে সেই সংকটময় হতাশা যা প্রতিদিনই বাড়ছে। কারণ একজন খ্রিস্টান হিসাবে নিজের জনগোষ্ঠীর প্রতিও আমার একটি দায়িত্ব আছে'।

প্রসঙ্গক্রমে, নিজেকে খ্রিস্টান দাবী করার হিটলারের এই মন্তব্যটিকে বেশি গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নেই। অন্য যা কিছু হিটলার ছিলেন সেটি ছাড়াও তিনি নিয়মিত মিথ্যাবাদী ছিলেন। তার এই বক্তৃতায় তিনি নিজেকে খ্রিস্টান দাবি করছেন ঠিকই, কিন্তু তার তথাকথিত 'টেবল-টকে' তিনি প্রায়শই খ্রিস্ট-বিরোধী, যদিও কখনোই তিনি নাস্তিক ছিলেন না, এবং যে ধর্মে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন, তিনি কখনো সেই রোমান ক্যাথলিকবাদ প্রত্যাখ্যান করেননি। এমনকি যদিও তিনি আসলেই একজন আন্তরিক খ্রিস্টান নাও হয়ে থাকেন, কিন্তু তার এই বক্তৃতাগুলো জার্মান জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর আগ্রহী শ্রোতা-দর্শক খুঁজে পেয়েছিল, যারা ইতোপূর্বেই বহু শতাব্দীর ক্যাথলিক আর লুথারিয়ান ইহুদী-বিদ্বেষ দ্বারা পূর্ব-প্রস্তুত ছিলেন। এবং বাকি ইউরোপের যেমন ঘটেছিল, জার্মানিতেও সেটি শুরু হয়েছিল সেই কিংবদন্তীটি দিয়ে যে, যিশুর মৃত্যুর জন্যে ইহুদীরাই দায়ী।

রোমের যে গভর্নর অবশেষে যিশুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছিলেন, পন্টিয়াস পাইলেট এরপর পানি নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং জনস্বমক্ষে তার হাত ধুয়েছিলেন ইঙ্গিত করতে যে, এর জন্য তিনি কোনো দায়িত্ব নেবেন না। মনে করা হয় ইহুদীরা এর দায় নিয়েছিলেন যখন তারা চিৎকার করে বলেছিল, ‘তার রক্তের দাগ এখন আমাদের আর আমাদের সন্তানদের ওপরে’ (ম্যাথিউ ২৭:২৫)। পরবর্তীতে ইতিহাসব্যাপী ইহুদী জনগোষ্ঠীর সহ্য করা অধিকাংশ নির্যাতনের সূত্রপাত হয়েছিল এ শব্দগুলো থেকে। কিন্তু... আমার কী সে সেই বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করার আর দরকার আছে? - যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনাটি ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য একটি কেন্দ্রবিন্দু। ইহুদীরা, তার মৃত্যুর দাবি তোলার জন্য যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে, তারা শুধু সেই দাবি করেছিলেন কারণ আর যা-ই হোক না কেন স্বয়ং ঈশ্বরই চেয়েছিলেন এটি সেভাবে ঘটুক। প্রসঙ্গক্রমে, আপনার কী মনে হয়না, ‘তার রক্তের দাগ আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের উপরে’ এমন কথা সেখানে সেদিন কারো পক্ষে আসলেই বলার সম্ভাবনা খুব কম, এবং সন্দেহজনকভাবেই যেন এখানে পরে এটি যুক্ত করেছে কোনো ইহুদীবিদ্বেষী হাত?

এই পুরো অধ্যায়ে, আমি বার বার বলেছি যে, বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীগুলো সম্ভবত সত্য নয়। অধ্যায় দুইয়ে আমরা যেমন দেখেছিলাম, বাইবেলের বইগুলো লেখা হয়েছিল যে ঘটনাগুলো তারা বর্ণনা করেছে বলে দাবী করেছে, সে ঘটনাগুলো ঘটার বহু দিন পরে। যদি কোনো চাক্ষুষ সাক্ষী সেখানে থাকতেন,

অধিকাংশেরই ততদিনে মৃত্যু হবার কথা। কিন্তু সেটি এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্যটিকে পরিবর্তন করে না। ঈশ্বর একজন কাল্পনিক চরিত্র হোক বা না হোক, আমাদের অধিকার কাছে নির্বাচন করার যে তিনি কী সে ধরনের একটি চরিত্র যাকে আমরা অনুসরণ করতে আর ভালোবাসতে পারি, যেভাবে, ইহুদী, খ্রিস্টান আর মসুলমান নেতারা সবাই বলেন যে আমাদের করা উচিত। আপনি কী মনে করেন? আপনার কী নির্বাচন করবেন?

৫ ভালো হবার জন্য কী আমাদের ঈশ্বর দরকার?

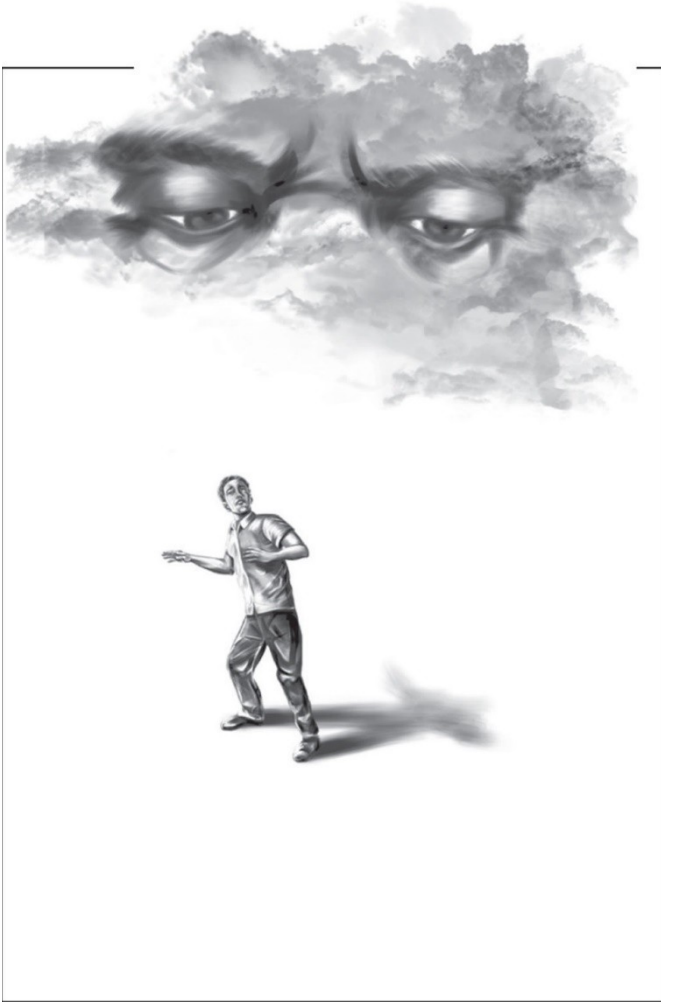

২০১৬ সালে, যুক্তরাষ্ট্রে বেশ ব্যতিক্রমভাবেই তীব্র নির্বাচনী প্রচারণার সময় ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তাদের দুই প্রধান প্রার্থী, বার্নি স্যান্ডার্স আর হিলারি ক্লিনটনের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নেবার চেষ্টা করছিল। দলটির একজন উর্ধতন কর্মকর্তা ব্রাড মার্শাল, হিলারিকে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী বার্নিকে মোকাবেলা করার জন্য তিনি একটি উপায় খুঁজে পেয়েছেন। তিনি সন্দেহ করেছিলেন, (যেন এটি অন্যায় কিছু) বার্নি আসলে একজন নিরীশ্বরবাদী (নাস্তিক)। তিনি দলটির অন্য দুই জন উর্ধতন কর্মকর্তাকে ইঙ্গিত করে লিখেছিলেন (হিলারি নিজে অবশ্য এই বিষয়ে কিছু জানতেন না) , তার ধর্ম কী সেটি জানাতে বার্নিকে জনসম্মুখে তাদের চ্যালেন্জ করা উচিত হবে। ইতোপূর্বে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উত্তরে বার্নি বলেছিলেন তিনি 'ইহুদী বংশ ঐতিহ্যের'। কিন্তু তিনি কী আসলেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? ব্রাড মার্শাল লিখেছিলেন:

> 'আমি মনে করি, তিনি একজন নাস্তিক, আমার এলাকায় ভোটারদের মধ্যে এটি বেশ কয়েক পয়েন্ট পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে। আর দক্ষিণাঞ্চলের ব্যাপ্টিস্ট এলাকাগুলোয় ভোটাররা একজন ইহুদী আর একজন নাস্তিকের মধ্যে বেশ বড় মাত্রায় পার্থক্য করবেন'।

তিনি এখানে কেন্টাকি আর পশ্চিম ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ভোটারদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। আর 'বেশ কয়েক পয়েন্ট পার্থক্য' মানে এই দুটি রাজ্যে সার্বিক ভোটের উপর বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য। তিনি ভেবেছিলেন (দুর্ভাগ্যজনকভাবে খুব বাস্তব কারণে) যে, বহু খ্রিস্টান একজন নাস্তিককে ভোট দেবার চেয়ে যে-কোনো একটি ধর্মে বিশ্বাসীকে কাউকে ভোট দিতে চাইবেন, এমনকি যদিও সেটি এমন কেউ হন, যার অনুসরিত ধর্মবিশ্বাস তাদের থেকে ভিন্ন, এই ক্ষেত্রে যেমন একজন ইহুদী। 'উচ্চতর কোনো শক্তির উপর' যে-কোনো প্রকারের বিশ্বাস হলেই চলবে, এমনকি যা তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের উচ্চতর শক্তি থেকে ভিন্ন। মতামত জরিপগুলো ইতোমধ্যেই এই বিষয়টি একাধিকবার প্রদর্শন করেছে। কিছু ভোটার আছেন, যিনি হয়তো একজন ক্যাথলিক অথবা মসুলমান কিংবা ইহুদী কোনো প্রার্থীকে ভোট দিয়ে অনিচ্ছুক হতে পারেন, কিন্তু তারপরও তারা কোনো একজন নাস্তিকের চেয়ে এদের মধ্যে যে কাউকেই শ্রেয়তর মনে করেন। আমার ভাবনায় এটি খুবই নিন্দনীয় একটি কাজ ছিল, কিন্তু বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই ব্রাড মার্শাল একজন মনোনয়ন প্রার্থীর কথিত নাস্তিকতাকে উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন, যে প্রার্থীকে তিনি সমর্থন করেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বলছে 'যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে কোনো পাবলিক ট্রাস্ট অথবা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা হিসাবে ধর্মীয় কোনো পরীক্ষার কখনো আর প্রয়োজন হবে না'। স্বীকার করতে হবে, মার্শাল নাস্তিকদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেয়ার উপর আইনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কোনো দাবি জানাননি, কারণ সেটি আসলেই যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পরিপন্থী হতো। ভোটাররা যখন ব্যক্তিগতভাবে তাদের নির্বাচিত কোনো প্রার্থীকে ভোট দেন, তখন অবশ্যই তাদের সেই প্রার্থীর ধর্মীয় বিশ্বাস কি, সেটি বিবেচনা করার অনুমতি আছে। কিন্তু মার্শাল বেশ পরিকল্পিতভাবে ভোটারদের পূর্বসংস্কারের প্রতি আবেদন করেছিলেন, যা সংবিধানের মূল ভাবনাটির বিরোধীতা করেছিল। খুব সরলভাবে অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুর উপর অবিশ্বাস হচ্ছে নাস্তিকতা। যেমন 'ফ্লাইং সসার' কিংবা পরীদের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করা। রাজনীতিবিদদের অর্থনৈতিক এবং পররাষ্ট্রনীতি, স্বাস্থ্য এবং সমাজকল্যাণ, আইন ও বিচার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাহলে অতিপ্রাকৃত কিছুর ওপর বিশ্বাস যে কাউকে উত্তম রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে, এমন কেন মনে করা উচিত?

আমি দুঃখের সাথেই বলছি বহু মানুষই মনে করেন, নৈতিক ও ভালো একজন মানুষ হবার কোনো সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে হলে আপনাকে জন্য অবশ্যই কোনো এক প্রকার ঈশ্বর অর্থাৎ যে-কোনো এক ধরনের 'উচ্চতর' শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। অথবা, কোনো একটি উচ্চতর শক্তির ওপর বিশ্বাস ছাড়া, ভালো এবং মন্দ, নৈতিকতা এবং অনৈতিকতার মধ্যকার পার্থক্য জানার কোনো উপায় অথবা ভিত্তি আপনার কাছে থাকবে না। এই অধ্যায়টি 'নীতি' এবং 'নৈতিকতা' বিষয়ক সম্পূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করবে: মন্দের বিপরীত ভালোর অর্থ আসলে কী? এবং ভালো বা নৈতিক হবার জন্য আমাদের কী ঈশ্বর বা দেব-দেবী কিংবা কোনো 'উচ্চতর' শক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন?

বেশ, তাহলে কেন কারো ভাবা উচিত, ভালো হতে হলে আপনার ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে? আমি শুধু দুটি কারণ ভাবতে পারি, এবং দুটোই খারাপ কারণ। একটি হচ্ছে যে, বাইবেল, কুর'আন বা অন্য কোনো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আমাদের বলে কীভাবে ভালো হতে হবে, এবং এই ধরনের কোনো নিয়মের বই ছাড়া কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ সেটি আমরা জানতে পারি না। আমরা সেই তথাকথিত 'গুড বুক' নিয়ে আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছিলাম, এবং এই অধ্যায়ে আমরা আবার সেই বইটি নিয়ে আলোচনায় ফিরে আসবো, সেগুলো আমাদের অনুসরণ করা উচিত হবে কিনা, সেই প্রশ্নটি করতে। আরেকটি সম্ভাব্য

কারণ হচ্ছে, মানুষ সম্বন্ধে সাধারণ মনে বিদ্যমান ধারণাটি এতই খারাপ ও নেতিবাচক যে, রাজনীতিবিদরাসহ, আমরা সবাই ভাবি, আমরা শুধুমাত্র ভালো আর নৈতিকভাবে আচরণ করি যখন 'কেউ' - আর যদি কেউ না হয়, তাহলে 'ঈশ্বর' - আমাদের উপর সতর্ক নজর রাখেন: আকাশবাসী মহান পুলিশ তত্ত্ব, অথবা, খানিকটা হালনাগাদ যদি করি, আকাশে থাকা মহান গোপন নজরদারি করার (বা সার্ভেইলেন্স) ক্যামেরা।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, হয়তো এখানে কিছু পরিমান সত্যতা আছে। প্রতিটি দেশই মনে করে যে, একটি নিয়মিত পুলিশ বাহিনী থাকা আবশ্যক। এবং অপরাধীদের চুরি কিংবা কোনো অপরাধ করার সম্ভাবনা কমে যায়, যদি তারা মনে করেন পুলিশ তাদের উপর সতর্ক নজর রেখেছে। ইদানীং আমাদের রাস্তাঘাট আর দোকানপাট এবং প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের গোপন ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে সজ্জিত, এবং এগুলো প্রায়শই সেই মানুষগুলোকে হাতেনাতে ধরে ফেলে, যখন তারা উচিত নয় এমন কিছু কাজ করে ফেলেন: যেমন দোকান থেকে কোনো কিছু চুরি করা। দোকান থেকে চুরি করতে উদ্যত কোনো চোর অবশ্যই এমন কিছু না করার চেষ্টা করবেন, যদি তিনি জানেন, কোনো ক্যামেরা তিনি কি করছেন তার ওপর নজর রাখছে। সুতরাং এখন কল্পনা করুন, একজন অপরাধী, যিনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, এবং তিনি জানেন, ঈশ্বর প্রতিটি দিনের প্রতিটি মিনিট তার প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজর রাখছেন। কারণ বহু ধার্মিক মানুষই বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর এমনকি আপনার চিন্তাও পড়তে পারেন, এবং আপনি যদি এমনকি কোনো খারাপ কাজ করার কথা শুধু খানিকটা ভেবেও থাকেন, ঈশ্বর সেটি আগে থেকেই বলতে পারবেন। আপনি হয়তো খানিকটা বুঝতে পারছেন, কেন ঐ মানুষগুলো ঈশ্বর অবিশ্বাসী বা নাস্তিক কোনো মানুষের চেয়ে ধার্মিক আর ঈশ্বরভীরু কোনো ব্যক্তির - ধর্মভীরু রাজনীতিবিদসহ - খারাপ কোনো কিছু করার সম্ভাবনা কম বলে মনে করে থাকেন। কারণ নাস্তিকদের আকাশে থাকা গোপন স্পাই-ক্যামেরার নিয়ে কোনো ভয় নেই। এই যুক্তিটি দাবী করে, তাদের শুধু সত্যিকারের ক্যামেরা আর পুলিশকে ভয় করতে হয়। আপনি সম্ভবত সেই নৈরাশ্যবাদী চালাক মন্তব্যটি আগেই শুনেছেন: 'বিবেক হচ্ছে জানা, কেউ নজরদারি করছে'।

যখন নজর রাখা হচ্ছে তখন ভালো হবার প্রবণতা এমনকি সম্পূর্ণ আদিম সহজাত একটি বিষয়ে পরিণত হতে পারে, যা আমাদের মস্তিষ্কের গভীরে প্রোথিত একটি তাড়না। আমার সহকর্মী অধ্যাপক মেলিসা বেটসন (অক্সফোর্ডে একসময় যিনি আমার আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্রী ছিলেন) এই বিষয়টি নিয়ে

চমৎকার একটি পরীক্ষা করেছিলেন। নিউ ক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বিজ্ঞান বিভাগে কফি, চা, দুধ আর চিনি ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের জন্য তহবিল সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে একটি 'হনেস্টি' বা সততার বাক্স রাখা হয়েছিল। এই জিনিসগুলো বিক্রয় করার জন্যে সেখানে কেউ ছিলেন না। দেয়ালে একটি দামের তালিকা ঝোলানো ছিল, শুধু বিশ্বাস করা হয়েছিল যে, আপনি সেখান থেকে যা কিছু নেবেন তার বিনিময়ে সঠিক মূল্যটি সেই বাক্সে রাখবেন। যখন কেউ নজর রাখছে তখন সততার সাথে আচরণ করার বিষয়টিতে বিস্ময়কর কিছু নেই। কিন্তু কী হতে পারে যদি সেখানে আপনি একা থাকেন? আপনি কী তাহলে সেই বাক্সে সঠিক পরিমানে টাকা রাখবেন, যখন কিনা আপনি জানেন, কেউ আপনার উপর নজর রাখছে না? আমি নিশ্চিত যে, আপনি সৎ আচরণ করবেন, কিন্তু সবাই এত ন্যায়পরায়ন নয়, আর এটাই এই পরীক্ষাটিকে সম্ভব করে তুলেছিল।

প্রতি সপ্তাহে মেলিসা কফি রুমে দামের একটি তালিকা ঝুলিয়ে রাখতেন। এবং প্রতি সপ্তাহের তালিকাটিকে এর উপরে একটি ছবি দিয়ে অলঙ্করণ করা হতো, মাঝে মাঝে সেই ছবিটি হতো ফুলের, যদিও সবসময় একই ফুলের নয়, কিন্তু ফুলের ছবি সেখানে থাকতো। অন্য কোনো সপ্তাহে সেখানে হয়তো এক জোড়া চোখের ছবি থাকতো, প্রতিবারে ভিন্ন এক জোড়া চোখের ছবি। আর বিস্ময়কর ফলাফল হচ্ছে এটি: যে সপ্তাহে এই মূল্য তালিকার কাগজের উপর এক জোড়া চোখের ছবি থাকতো, ব্যবহারকারীরা অপেক্ষাকৃত বেশি সততার সাথে আচরণ করতেন। সেই সপ্তাহগুলোয় সততা বাক্সে সংগ্রহের পরিমান অন্যান্য 'কন্ট্রোল' বা নিয়ন্ত্রিত সপ্তাহ থেকে প্রায় তিন গুণ পরিমানে বেশি হতো, আর কন্ট্রোল সপ্তাহ হচ্ছে সেই সপ্তাহগুলো যখন তালিকার উপর ছবি হিসাবে ফুল থাকতো অর্থাৎ খদ্দেরদের দিকে শুধুমাত্র ফুল 'তাকিয়ে' থাকতো। বিষয়টি খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে না? যদি এই চোখ সত্যিকারের গোপন ক্যামেরা হতো এটি খুব সহজেই বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল, কিন্তু যারা কফি পান করতে সেখানে আসতেন, তারা সবাই কিন্তু খুব ভালো করেই জানতেন যে ঐ 'চোখ' আসলে কাগজের উপর কালি ছাপ ছাড়া আর কিছু নয়। সেখানে কী ঘটছে সেটি এই চোখের ছবি, ফুলের ছবির চেয়ে আদৌ বেশি পরিমানে কিছু দেখতে পেত না। এটি কোনো যৌক্তিক হিসাব-নিকাশও নয় - আমার উপর যখন লক্ষ রাখা হচ্ছে, আমার সৎ হওয়াই তখন উত্তম। এটি ছিল অযৌক্তিক। যেমন আমি যখন কোনো নিউ ইয়র্কের স্কাই স্ক্র্যাপারের উপরের তলায় দাড়িয়ে নীচের দিকে তাকাই, আমি জানি আমি নীচে পড়ে যাবো না, কারণ আমি নিরাপদ পুরু কাচের পেছনে দাড়িয়ে আছি। কিন্তু তারপরও আমি ভয়ের একটি শিহরণ অনুভব করি, আমার শিরদাড়ায়, চামড়ায়।

এটি অযৌক্তিক, হয়তো এই ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো জিন আমার মস্তিষ্কে বিশেষভাবে পূর্বনির্দেশনা দিয়ে রেখেছে। যখন গাছে বহু উপরের ডালে বসবাস করার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থাকা আমাদের দরকার ছিল। এমনকি আপনার নিজেকে হয়তো এমন কিছু বলার কোনো দরকার নেই, 'ঈশ্বরের চোখ আমাকে দেখছে, সুতরাং আমি বরং ভালো আচরণ করি'। হয়তো স্বয়ংক্রিয় অবচৈতিক একটি প্রতিক্রিয়া, কাগজের উপর মেলিসার চোখের ছবির প্রভাবের মত (প্রসঙ্গক্রমে যদি আপনি ভেবে থাকেন, আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে মেলিসা প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ আর পরিসংখ্যান দিয়ে প্রদর্শন করেছিলেন এই প্রভাবটি শুধুমাত্র দৈবাৎ ঘটেনি।)

এটি অযৌক্তিক হোক বা না হোক, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর একটি আপাতগ্রাহ্যতা আছে। যদি কেউ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর তার প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজর রাখছেন, তার ভালো এবং নৈতিক হবার হয়তো বেশি সম্ভাবনা আছে। আমি অবশ্যই বলবো, আমি এই ধারণাটিকে ঘৃণা করি। আমি বিশ্বাস করতে চাই মানুষ এর চেয়ে ভালো। আমি বিশ্বাস করতে চাই কেউ আমাকে লক্ষ করুক বা না করুক - আমি সৎ।

কিন্তু যদি ঈশ্বর-ভীতি শুধুমাত্র ঈশ্বরকে হতাশ করার ভয় নয়, বরং আরো বেশি খারাপ কিছু হয়ে থাকে - অনেক বেশি খারাপ? খ্রিস্ট এবং ইসলাম, উভয় ধর্মই ঐতিহ্যগতভাবে শিক্ষা দেয়, পাপীদের মৃত্যুর পর তাদের অনন্তকালব্যাপী নরকে নির্যাতন করা হবে। 'বুক অব রিভিলেশন' বইয়ে 'জ্বলন্ত গন্ধক পাথরপুর্ণ একটি আগুনের হ্রদের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবী মুহম্মদের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তিনি বলেছিলেন, সেখানে সবচেয়ে সামান্যতম শাস্তি পাওয়া ব্যক্তিটির পায়ের নীচে জ্বলন্ত কয়লা রাখা হবে। 'তার মগজ এর কারণে ফুটতে থাকবে'। (কুর'আন, ৪:৫৬) এর শিক্ষাকে যারা অবিশ্বাস করে তাদের সম্বন্ধে বলেছে, 'যখন তাদের চামড়া পুড়ে খসে পড়বে, আমি নতুন ত্বক দিয়ে সেটি প্রতিস্থাপিত করবো, যেন তাদের সেই যন্ত্রণাটি অনুভব করা অব্যাহত থাকে'। বহু ধর্মযাজকদের মতে অনন্তকালের জন্য নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার জন্য আপনার এমনকি খারাপ কিছু করাও লাগবে না । শুধুমাত্র অবিশ্বাসী হওয়াই যথেষ্ট ! নরকের দুঃস্বপ্নময় বীভৎসতাকে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় আরো ভয়াবহ করে উপস্থাপন করতে বিখ্যাত কিছু চিত্রশিল্পী শিল্পী পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছেন। ইটালিয় ভাষায় সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত যে সৃষ্টিকর্মটি রচিত হয়েছিল, দান্তের 'ইনফার্নো', এটির মূল বিষয় ছিল নরক।

শৈশবে কী আপনাকে নরকের (দোযখ) আগুনের কথা বলে ভয় দেখানো, বা হুমকি দেয়া হয়েছিল? আপনি কী সত্যি সেই হুমকিগুলো বিশ্বাস করেছিলেন? আপনি কী আসলেই ভয় পেয়েছিলেন? আপনি যদি এইসব প্রশ্নগুলোর উত্তরে 'না' বলতে পারেন, তাহলে আপনি ভাগ্যবান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বহু মানুষই আমৃত্যু এই আতঙ্কে জীবন কাটান, এবং এটি তাদের জীবন এবং বিশেষ করে তাদের মৃত্যুর সময়টিকে বিভীষিকাময় করে রাখে।

শাস্তির হুমকি দেয়া নিয়ে আমার একটি তত্ত্ব আছে। কিছু হুমকির আপাতগ্রাহ্যতা আছে এবং যুক্তিযুক্ত। যেমন, যদি আপনি চুরি করার অপরাধে ধরা পড়েন, আপনাকে হয়তো জেলখানায় যেতে হতে পারে। কিছু হুমকি খুবই কম পরিমানে আপাতগ্রাহ্য, যেমন, যদি আপনি ঈশ্বর বিশ্বাস না করেন, যখন আপনি মারা যাবেন, একটি আগুনের হ্রদে আপনি অনন্তকাল কাটাবেন। আমার তত্ত্বটি হচ্ছে হুমকি যত বেশি আপাতগ্রাহ্য (যৌক্তিক কিংবা সম্ভাব্য) হবে, সেটি ততই কম ভয়ঙ্কর হলে চলবে। আপনার মৃত্যুর পর শাস্তির হুমকি এতই কষ্ট-কল্পিত যে, সেই শাস্তিটিকে আসলেই অতি মাত্রায় ভয়ঙ্কর হতে হবে সেই ঘাটতি পূরণ করতে: আগুনের একটি হ্রদ। যখন কিনা আপনি জীবিত, তখন শাস্তি পাবার হুমকির আপাতগ্রাহ্যতা অনেক বেশি (কারাগার বাস্তব একটি জায়গা), সুতরাং এর সাথে সেই চামড়া পুড়ানো আর পুরানো চামড়া পুনরায় প্রতিস্থাপিত করে আবার দগ্ধ হবার যন্ত্রণা অনুভব করানোর মত কোনো জঘন্যতম কুৎসিত শাস্তির বিবরণ এখানে জরুরী নয়।

আপনি সেই মানুষগুলো সম্বন্ধে কী ভাবেন, যারা তাদের শিশুদের মৃত্যুর পর অনন্তকাল আগুনে দগ্ধ হবার হুমকি দিয়ে থাকেন? বইয়ে আমি সাধারণত এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমার নিজের উত্তর দেই না। কিন্তু আমি এখানে ব্যতিক্রম না করে পারছি না। আমি বলবো, ঐ মানুষগুলো ভাগ্যবান যে নরক বলে এমন কোনো জায়গা আসলে নেই, কারণ সেখানে যাবার জন্য তাদের মত আর কেউ এত বেশি মাত্রায় যোগ্য আছেন বলে আমি চিন্তা করতে পারছি না।

নরক যতই ভয়ঙ্কর একটি জায়গা হোক না কেন, খুব একটা স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই যে, ধর্ম মানুষকে ভালো কিংবা মন্দভাবে আচরণ করাতে পারে। কিছু গবেষণা প্রস্তাব করেছে যে, ধর্মীয় মানুষরা কোনো দাতব্য খাতে দান করতে বেশি উদারতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। অনেকেই তাদের চার্চে 'টিথ' হিসাবে অর্থ দান করেন (অর্থাৎ তাদের আয়ের এক-দশমাংশ) এবং চার্চ প্রায়শই সেই টাকার কিছু অংশ গুরুত্বপূর্ণ পরহিতকর উদ্দেশ্যে দান করে, যেমন, দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ বিতরণ। অথবা কোনো সংকটকালীন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর

আহবানে সাড়া দেয়, যেমন ভূমিকম্প। কিন্তু চার্চের সংগ্রহ করা তহবিলের একটি বড় অংশ মিশনারীদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থায়ন করতেই ব্যবহৃত হয়। তারা এটিকে পরহিতকর কর্মে দান হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এটি কী আসলেই পরহিতকর্ম হতে পারে সে একই অর্থে, যেমন ধরুন দুর্ভিক্ষে ত্রাণ বিতরণ অথবা ভূমিকম্পের কারণে গৃহহীন মানুষদের সহায়তা? শিক্ষার বিস্তারের জন্যে অর্থ সহায়তা অবশ্যই ভালো একটি কাজ মনে হতে পারে। কিন্তু যদি সেই শিক্ষা মূলত সম্পূর্ণভাবে কুর'আন মুখস্ত করা ছাড়া আর কিছুই না হয়ে থাকে? অথবা সেই সব মিশনারীদের শিক্ষা কার্যক্রম, যেখানে শিশুদের নিজস্ব আদীবাসী ঐতিহ্য ভুলে বাইবেল শেখার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে?

অবিশ্বাসীরাও খুব উদার হতে পারেন। জনহিতৈষী কর্মসূচিতে দানের পরিমানের ভিত্তিতে পৃথিবীর প্রথম তিনজন ব্যক্তি হচ্ছেন বিল গেটস, ওয়ারেন বাফেট এবং জর্জ সরোস। এরা তিনজনই অবিশ্বাসী। ২০১০ সালে ইতোমধ্যে দরিদ্র দ্বীপ হাইতি ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয়েছিল। মানুষের দুর্গতি ছিল অবর্ণনীয়ভাবেই ভয়ঙ্কর একটি মাত্রায়। অর্থ এবং অন্যান্য সহায়তা দেবার জন্যে সারা পৃথিবীব্যাপী, ধার্মিক কিংবা নাস্তিক সবাই একত্র হয়েছিলেন। আমার নিজের দাতব্য প্রতিষ্ঠান রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশন ফর রিজন অ্যান্ড সায়েন্স, খুব দ্রুত একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেছিল, যার নাম আমরা দিয়েছিলাম, 'নন-বিলিভার্স গিভিং এইড' (এনবিজিএ)। আমরা আরো বহু সংখ্যক অবিশ্বাসী, ধর্মনিরপেক্ষ এবং সন্দেহবাদী প্রতিষ্ঠানকে একত্র করেছিলাম নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী এবং অন্যান্য অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে অর্থ তহবিল সংগ্রহ করতে। বহু সহস্র অবিশ্বাসীরা সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। মাত্র তিন দিনের মধ্যে এনবিজিএ ৩০০,০০০ ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছিল। আমরা সেই টাকার শেষ পেনি অবধি হাইতিতে পাঠিয়েছিলাম। একই সাথে অবশ্যই, ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোও দান সংগ্রহ করেছিল। বহু ভালো মানুষ হাইতিতে গিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবী হয়ে সহায়তা করতে। বিশ্বাসীদের চেয়ে অবিশ্বাসীরা আরো বেশি উদার সেই গর্ব করার উদ্দেশ্য আমি কিন্তু এনবিজিএ'র গল্পটি বলিনি । আমি আসলেই মনে করি যে, যখন কোনো সংকটের মুখোমুখি হই আমরা, পৃথিবী জুড়েই বহু মানুষই দয়ালু এবং উদার, তারা ধর্মবিশ্বাসী হোক কিংবা না হোক।

আকাশে 'দ্য গ্রেট সারভেইলেন্স' বা নজরদারি-ক্যামেরা সংক্রান্ত তত্ত্বটির এক ধরনের আপাতগ্রাহ্যতা আছে, যদিও এর প্রকৃতিতে এটি হতাশাজনক। হয়তো এটি আসলেই অপরাধ করতে অপরাধীদের নিরুৎসাহিত করতে পারে? আপনি

হয়তো এটি ভাবতে পারেন, যদি তাই হয়, তাহলে কারাগারে বন্দী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাসীদের শতকরা পরিমান সবচেয়ে বেশি হবার কথা। জুলাই ২০১৩ থেকে আসা কিছু পরিসংখ্যান এখানে উল্লেখ করা হলো। এই জরিপটির ফলাফল নির্দেশ করছে যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলোয় বন্দী অপরাধীরা নিজেদেরকে কোন ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করছেন। আটক বন্দীদের মধ্যে ২৮ শতাংশ প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টান, ২৪ শতাংশ ক্যাথলিক খ্রিস্টান, ৫ শতাংশ মসুলমান আর বাকিদের মধ্যে অধিকাংশ বৌদ্ধ, হিন্দু, ইহুদী, আদিবাসী আমেরিকান অথবা 'অজানা'। বেশ, তাহলে এদের মধ্যে নাস্তিকদের সংখ্যা কত? খুবই সামান্য - ০.০৭ শতাংশ। সুতরাং কারাদণ্ড পাওয়া কোনো অপরাধীর নাস্তিক হবার চেয়ে বরং খ্রিস্টান হবার সম্ভাবনা প্রায় ৭৫০ গুণ বেশি। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমরা সেই সংখ্যার কথা বলছি যারা নিজেদের খ্রিস্টান অথবা নাস্তিক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কে জানে নিজেদের ধর্ম 'অজানা' হিসাবে উত্তরদাতাদের মত কত সংখ্যা লুকিয়ে আছে? আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, যুক্তরাষ্ট্রে খ্রিস্টানদের মোট সংখ্যা অবশ্যই নাস্তিকদের মোট সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু অবশ্যই ৭৫০ গুণ বেশি নয়। আবারো খ্রিস্টানদের সংখ্যাটি হয়তো খানিকটা অতিরঞ্জিত হতে পারে সেই বাস্তবতার কারণে যে, বন্দীরা আগেই মুক্তি পেতে পারেন যদি তারা নিজেদের কোনো একটি ধর্মের অনুসারী হিসেবে দাবী করতে পারেন। এছাড়াও এমনকি আরো প্রস্তাব করা হয়েছে, কারাগার সংক্রান্ত উপাত্তগুলো শুধুমাত্র ঘটনাক্রমে ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা অথবা এর অভাব সংক্রান্ত। দরিদ্র অশিক্ষিত ব্যক্তিদেরই মূলত নিজেদের কারাগারে আবিষ্কার করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এবং স্বল্প শিক্ষিত মানুষের নাস্তিক হবার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু যেভাবেই আপনি দেখুন না কেন, এই সংখ্যাগুলো আকাশে থাকা মহান 'নজরদারি' ক্যামেরা তত্ত্বটির জন্য প্রতিশ্রুতিপূর্ণ নয়।

এমনকি যদিও আকাশের মহান নজরদারি ক্যামেরা তত্ত্বটিতে সামান্য কিছু সত্য থেকে থাকে, এটি অবশ্যই ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য ভালো কোনো কারণ নয়। কোনো কিছু বাস্তব সত্য হিসাবে বিশ্বাস করার একমাত্র ভালো কারণ হচ্ছে, প্রমাণ। আর আকাশে 'গোপন নজরদারি-ক্যামেরা' তত্ত্বটি হয়তো প্রত্যাশা করার মত এমন (বরং সন্দেহজনক?) ধরনের একটি কারণ যে, 'অন্য' মানুষগুলোও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করবেন। এটি হয়তো অপরাধ সংঘটনের হার কমাবে। এটি অবশ্যই সত্যিকারের গোপন ক্যামেরা স্থাপন করা, ও পুলিশি নজরদারি আরো বেশি পরিমানে বাড়াতে অর্থ ব্যয় করার চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়সাশ্রয়ী একটি পদ্ধতি। আমি আপনাদের কথা জানি না, তবে বিষয়টি আমার কাছে বরং অধস্তন হিসাবে বিবেচনা করে আমাদের পিঠ

চাপড়ে দেবার মতোই অপমানজনক একটি পদ্ধতি। 'অবশ্যই আমি কিংবা আপনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করার জন্য যথেষ্ট পরিমানে বুদ্ধিমান, কিন্তু আমরা মনে করি 'অন্যরা' যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাহলে সেটি উত্তম হবে'! আমার বন্ধু দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট এটিকে বলেছিলেন 'বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস'। ঈশ্বরকে বিশ্বাস নয়, কিন্তু এমন কিছু বিশ্বাস করা যে, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখা উত্তম একটি বিষয়। যখন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়েরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল বলতে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কিনা তা জানাতে, তিনি এর উত্তরে বলেছিলেন: 'আমি ইহুদী জনগণকে বিশ্বাস করি, এবং ইহুদী জনগন ঈশ্বর বিশ্বাস করেন'।

আকাশে থাকা 'মহান নজরদারি-ক্যামেরা' তত্ত্বটি নিয়ে এটুকুই যথেষ্ট। আমি এবার সম্ভাব্য অন্য কারণটি নিয়ে আলোচনা করবো, কেন অনেকেই নাস্তিককে ভোট দেবার বদলে কোনো ধার্মিক রাজনীতিবিদকে ভোট দেয়া শ্রেয়তর ভাবতে পারেন। এর কারণ আসলেই সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিছু মানুষ মনে করেন ধর্ম ভালো, কারণ বাইবেল আমাদের নির্দেশ দিয়েছে কীভাবে ভালো আর নৈতিকভাবে আচরণ করতে হয়। এই তত্ত্বটি প্রস্তাব করছে, নিয়ম আর অনুশাসনের একটি বই ছাড়া আমরা অনিশ্চয়তার একটি সাগরে ভাসমান। এছাড়া বাইবেলের অর্থ হচ্ছে কিছু অনুকরণীয় 'আদর্শ' চরিত্র আমাদের জন্য উপস্থাপন করা - ঈশ্বর বা যিশুর মত প্রশংসনীয় চরিত্রগুলো, আমাদের যাদের অনুকরণ করা উচিত।

কিন্তু সব বিশ্বাসীরা বাইবেল অনুসরণ করেন না। কারো কারো জন্য পবিত্র ধর্মশাস্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন অথবা আসলেই তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নেই। এখানে আমি শুধু ইহুদী ও খ্রিস্টান বাইবেল নিয়ে কথা বলবো। কারণ ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে শুধু এটি সম্বন্ধে আমার ভালো ধারণা আছে। কিন্তু কুর'আন সম্বন্ধে প্রায় একই ভাবে অনেক কিছু বলা যেতে পারে। আপনি কী মনে করেন এই ধরনের পবিত্র বইগুলো ভালো আর নৈতিক হবার জন্য ভালো কোনো নির্দেশিকা হতে পারে? আপনি কী মনে করেন, বাইবেলের ঈশ্বর একজন ভালো অনুকরণীয় আদর্শ কোনো চরিত্র? যদি তাই হয়, তাহলে আপনি চতুর্থ অধ্যায়টি আরো একবার পড়ে দেখতে পারেন। আর কুর'আন আরো খারাপ কারণ মসুলমানদের এটিকে আক্ষরিকভাবে গ্রহন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রায়শই টেন কম্যান্ডমেন্টসকে কীভাবে একটি ভালো জীবন কাটানো যেতে পারে তার একটি নির্দেশিকা হিসাবে দাবি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত 'বাইবেল' বলয়ে অবস্থিত বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য টেন কম্যান্ডমেন্টস নিয়ে তীব্র বিতর্কে বিভাজিত। এর একদিকে আছেন খ্রিস্টান রাজনীতিবিদরা, যারা

এটিকে সরকারী ভবনের দেয়ালে খোদাই করে রাখতে চান, যেমন আদালত ভবন। আর এই বিতর্কের অন্য পক্ষরা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে উদ্ধৃতি দেন। এই সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বলেছে: ধর্মীয় কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, কিংবা স্বাধীনভাবে কোনো ধর্ম চর্চা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এই ধরনের কোনো আইন কংগ্রেস প্রণয়ন করবে না।।

নির্দেশনাটি বেশ স্পষ্ট, আপনি কী তাই মনে করেন না? এই প্রত্যাদেশের মূল বক্তব্যটি হচ্ছে ধর্ম নিষিদ্ধ নয়। আপনার ইচ্ছামত যে-কোনো ধর্ম নিজস্ব উপায়ে আপনি পালন করতে পারবেন। সংবিধান শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠার করার লক্ষ্যে কোনো প্রচেষ্টা নিষিদ্ধ করেছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় যে কেউ তার নিজের বাড়ির দেয়ালে ব্যক্তিগতভাবে টেন কম্যান্ডমেন্টস ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। সংবিধান সঠিকভাবেই এই ধরনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। কিন্তু জনগণ থেকে সংগৃহীত রাজস্বে নির্মিত কোনো ভবন যেমন, রাজ্য-আদালতের দেয়ালে এমন কিছু খোদাই করা কী সাংবিধানিক হতে পারে? বহু আইন-বিশেষজ্ঞ তা মনে করেন না।

এই আইনি প্রশ্নটি একপাশে সরিয়ে রেখে, আসুন আমরা এই 'টেন কম্যান্ডমেন্টস'-এর দশটি ঐশ্বিক নির্দেশের (দশ আজ্ঞা) দিকে তাকাই। আসুন আলোচনা করে দেখি এগুলো সম্বন্ধে আমরা কী চিন্তা করি। আসলেই কী এটি কীভাবে ভালো হওয়া যায় আর কীভাবে খারাপ না হওয়া যায় তার একটি মূল্যবান নির্দেশিকা হতে পারে? বাইবেলে টেন কম্যান্ডমেন্টসের দুটি সংস্করণ আছে। একটি আছে বুক অব এক্সোডাসে, আরেকটি আছে ডিউটেরোনমিতে। মূলত দুটি সংস্করণই একই, কিন্তু ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো (ইহুদী, রোমান ক্যাথলিক, লুথারিয়ান ইত্যাদি) এগুলোকে খানিকটা ভিন্ন ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করেছে। এছাড়াও, মোজেস, যিনি স্বর্ণের বাছুর উপাসনা করতে দেখে রাগে উন্মত্ত হয়ে মূল পাথরের ট্যাবলেটগুলো হাত থেকে ফেলে দিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন, পরে ঈশ্বর আবার তাকে নতুন এক সেট পাথরের ট্যাবলেট দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশনাগুলোর একটি সংস্করণ উল্লেখ করা হলো, যা মোজেসের হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে যায়নি। এক্সোডাসের বিশতম অধ্যায়ে তালিকাটিকে আমরা এভাবেই দেখি । ঈশ্বর এই ঘোষণা দেবার সময় বেশ বড় মাপের একটি নাটকীয়তার আয়োজন করেছিলেন। তিনি সবাইকে মাউন্ট সাইনাই পর্বতের নীচে একত্র করেছিলেন, তূর্যধ্বনির উচ্চনাদসহ একটি বজ্রমেঘের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। উল্লেখিত প্রতিটি কম্যান্ডমেন্টের

নীচে আমি আমার নিজস্ব মন্তব্য যুক্ত করছি, সম্ভবত আপনিও নিজের মন্তব্য সেখানে যুক্ত করতে চাইতে পারেন।

> আমি হচ্ছি তোমাদের প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। মিশর থেকে, দাসত্বের সেই রাজ্য থেকে তোমাদের যে মুক্ত করে নিয়ে এসেছে।

ইহুদীদের জন্যে এটাই হচ্ছে প্রথম কম্যান্ডমেন্ট, যদিও এটি শুনলে নির্দেশের চেয়ে বরং একটি ভূমিকা বা প্রাককথন মনে হতে পারে। খ্রিস্ট ধর্মানুসারীদের জন্য এটি হচ্ছে দশটির নির্দেশনার একটি ভূমিকা:

প্রথম আদেশ: আমি ছাড়া তোমাদের জন্যে আর কোনো দেব-দেবী থাকবে না (কিংবা আমার পরিবর্তে তোমরা কোনো দেব-দেবীর উপাসনা করতে পারবে না।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখেছিলাম এবং যেভাবে ঈশ্বর প্রায়শই নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি হচ্ছেন একজন 'ঈর্ষাকাতর ঈশ্বর'।

ওল্ড টেস্টামেন্টে ঈশ্বর চরিত্রটি খুব অসুস্থভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বর/দেব-দেবীদের নিয়ে ঈর্ষায় আবিষ্ট হয়ে আছেন। তিনি তীব্র একটি আবেগের সাথেই এসব প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘৃণা করেন, এবং তার উপাসনাকারীরা অন্য দেব-দেবীদের উপাসনা করতে হয়তো প্রলুব্ধ হতে পারে এই আতঙ্ক যাকে সর্বক্ষণ গ্রাস করে আছে। প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বর/দেব-দেবীদের প্রতি সমরূপী আবিষ্ট করে রাখা একটি উন্মত্ত ঘৃণা যিশুর সময়ের পরেও আরো কয়েক শতাব্দী টিকে ছিল। সম্রাট কনস্টান্টিনের অধীনে খ্রিস্ট ধর্ম যখন রোম সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক ধর্ম হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল, অতি উৎসাহী আদি খ্রিস্টানরা পুরো সাম্রাজ্য জুড়েই ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিলেন, যখন তারা তাদের দৃষ্টিতে উপাসনার মূর্তি এবং আজ আমরা যেগুলোকে অমূল্য শিল্পকর্ম হিসাবে বিবেচনা করি সেগুলো ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছিল [বিস্তারিতভাবে এ ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে ক্যাথেরিন নিক্সের 'দ্য ডার্কেনিং এজ' বইটিতে (লন্ডন, ম্যাকমিলান,২০১৮)]। বর্তমান সিরিয়ায় অবস্থিত একটি প্রাচীন রোমান শহর পালমিরায় দেবী অ্যাথিনার সুবিশাল মূর্তিটি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া শুধু একটি মাত্র উদাহরণ। আর এসব কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী সবচেয়ে কুখ্যাত ব্যক্তিটি ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের অতি সন্মানিত ধর্মতাত্ত্বিক সেন্ট অগাস্টিন। আদি খ্রিস্টানদের এভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী দেব-দেবীর মূর্তি আর ছবি ধ্বংস করার উন্মত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার তুলনা মেলে বর্তমান যুগের আইসিস আর আল-কায়েদার মসুলমান ধর্মান্ধতায় ।

দ্বিতীয় আদেশ: তোমরা উপরের আকাশ, নীচে পৃথিবী অথবা পানির নীচে কোনো কিছুর রূপে কখনোই (উপাসনা উদ্দেশ্যে) তোমাদের জন্যে কোনো ধরনের মূর্তি নির্মাণ করবে না।

আবারও প্রতিদ্বন্দ্বী দেব-দেবী নিয়ে ঈশ্বর ঈর্ষাই মূল বিষয় এখানে। বহু প্রতিদ্বন্দ্বী দেব-দেবী, প্রতিবেশী গোত্রগুলো যাদের উপাসনা করতেন সেগুলো সাধারণত ছিল মূর্তি। বাইবেলে এই বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট করা হয়ে এর পরের অনুচ্ছেদে:

> তোমরা কখনোই তাদের সামনে নত হবে না অথবা উপাসনা করবে না। কারণ আমি, তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের ঈশ্বর, একজন ঈর্ষাকাতর ঈশ্বর, যারা আমাকে ঘৃণা করে আমি তাদের পিতার পাপের জন্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্মের সন্তানদেরও শাস্তি প্রদান করি।

শেষ বাক্যটি পড়ে আপনার কী মনে হচ্ছে? ঈশ্বর এতটাই হিংসুটে যে, যদি আপনি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতার উপাসনা করেন, শুধুমাত্র আপনি নয়, আপনার সন্তান, আপনার সন্তানদের সন্তান, আপনার সন্তানদের, সন্তানদের সন্তানকেও তিনি শাস্তি দেবেন। আপনি যখন সেই পাপটি করেছিলেন, তখন এমনকি তাদের জন্মই হয়নি, অসহায় নিষ্পাপ নাতি-নাতনিরা।

তৃতীয় আদেশ : তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের নামের অপব্যবহার করবে না। কারণ তার নামের অপব্যবহার করে এমন কেউই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিরপরাধ নয়।

এর অর্থ আপনি অবশ্যই ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে কোনো গালি দেবেন না। যেমন, 'গড ড্যাম ইট' অথবা, 'ডোন্ট বি সাচ এ গড-ড্যাম ফুল'। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এমন কিছু ঈশ্বর হয়তো অপছন্দ করতে পারেন, কিন্তু এটি খুব ভয়ানক কোনো অপরাধ মনে হয় না। তাই নয় কী? আদালতের দেয়ালে লাগানোর জন্য উপযুক্ত কিছু নয়। আর যা-ই হোক না কেন এটি শুধুমাত্র 'তোমরা কখনোও গালি দেবে না', আর অধিকাংশ দেশে এটি আইনের চোখে অপরাধ নয়।

চতুর্থ আদেশ : পবিত্র রাখার মাধ্যমে তোমরা সাবাথের দিনটিকে স্মরণ করবে।

আসলেই ঈশ্বর এই আদেশটির ওপর বেশ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বুক অব নাম্বারস বইটির পনেরোতম অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, সাবাথের দিনে কাঠ কুড়ানোর অপরাধে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছিল। জ্বালানীর কাঠ কুড়ানো ! খুবই

সাধারণ একটি অপরাধ, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন। কিন্তু যখন মোজেস ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই অপরাধের শাস্তি কী হতে পারে, তখন এটিকে তুচ্ছ ভাবার মত মেজাজ ঈশ্বরের ছিল না:

> তারপর প্রভু মোজেসকে বলেছিলেন: 'এ ব্যক্তিকে অবশ্যই মরতে হবে। বসতিস্থানের বাইরে, সবাই একত্রে তাকে পাথর ছুড়ে অবশ্যই হত্যা করবে'।

ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর একটি বিচার, আপনারও কী সেটি মনে হচ্ছে না? যদিও আপনি কী ভাবছেন সেটি আমি জানিনা, কিন্তু আমি মনে করি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা, মৃত্যুদণ্ড দেবার বিশেষভাবে নিষ্ঠুর একটি উপায়। এটি শুধু যন্ত্রণাদায়কই নয়, এখানে আরো কিছু অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতাও আছে, যখন পুরো গ্রামবাসী একত্রে একজন অসহায় ব্যক্তির উপর এভাবে চড়াও হয়, কোনো খেলার মাঠে ঘৃণ্য উৎপীড়কদের মত। এবং বেশ কিছু মসুলমান দেশে এটি এখনো করা হয়, বিশেষ করে যখন কোনো তরুণীকে স্বামী নয় এমন কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলার মত অপরাধে অভিযুক্ত করা হয় (রক্ষণশীল কিছু মসুলমানরা আসলেই এটিকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়)।

খ্রিস্টান-প্রধান কোনো দেশেই এখন পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড দেবার বিধান নেই। কেউ এমনকি দুষ্টামি করে বলতে পারেন, খ্রিস্টানরা এখন তাদের পবিত্র গ্রন্থটির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, যখন কিনা মসুলমান পাথর নিক্ষেপকারীরা এখনো তাদের ধর্মগ্রন্থটিকে আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করছেন। কিন্তু আপনি কী মনে করেন, চতুর্থ এই আদেশটি কোনো আদালতের দেয়ালের খোদাই করে রাখার মত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, যেন এটি দেশের আইনগুলোর মধ্যে একটি?

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলো চতুর্থ আদেশটিকে যুক্তিযুক্ত করতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর নিজেই মহাবিশ্ব আর মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করার সেই ব্যস্ত ছয় দিন পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

'ছয় দিন তোমরা পরিশ্রম করবে এবং তোমরা তোমাদের সব কাজ করবে, কিন্তু সপ্তম দিন হচ্ছে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের জন্য একটি 'সাবাথ' (হিব্রু সাবাত থেকে, যার অর্থ বিশ্রাম নেয়া)। এই দিন তোমরা কোনো ধরনের কাজ করবে না, তুমি কিংবা তোমার পুত্র কিংবা কন্যা কেউ নয়, এমন কি তোমার গৃহভৃত্য অথবা গৃহভৃত্যা কিংবা তোমাদের পালিত পশু , তোমাদের সীমানায় আসা কোনো আগন্তুকও কোনো কাজ করবে না। কারণ ছয় দিন ধরে প্রভু আকাশ, পৃথিবী,

সমুদ্র আর এর মধ্যে যা কিছু আছে সেই সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন। আর সেই কারণে প্রভু সাবাথের দিনটিকে আশীর্বাদপুষ্ট এবং পবিত্র ঘোষণা করেছেন।

এটি 'অ্যানালজি' (সাদৃশ্য) বা অনুরূপ উদাহরণের মাধ্যমে ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিপ্রক্রিয়ার জন্য বৈশিষ্ট্যসূচক - 'প্রতীকীভাবে' যুক্তি উপস্থাপন করা। বহু দিন আগে এভাবে এটি ঘটেছিল, সুতরাং এখনো তা একই ভাবে ঘটবার জন্য কারণ হিসাবে এটি যথেষ্ট । প্রকৃতপক্ষে, অবশ্যই যদিও এইভাবে প্রথমবারও ঘটেনি, কারণ মহাবিশ্ব ছয় দিনে সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু তখন এই "দিন' গুনছিল কে?

<u>পঞ্চম আদেশ</u>: তোমাদের পিতা-মাতাকে সন্মান করো, যেন তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বর যে দেশ তোমাদের দান করেছেন, সেখানে দীর্ঘদিন বাঁচতে পারো।

এটা বেশ ভালো একটি আদেশ, পিতামাতাকে সন্মান করা অবশ্যই ভালো। তারা আপনাকে এই পৃথিবীতে এনেছেন, খাইয়েছেন, দেখাশুনা করেছেন, স্কুলে পাঠিয়েছেন, এবং আরো অনেক কিছুই করেছেন।

<u>ষষ্ঠ নির্দেশ</u> : তোমরা হত্যা করবে না।

অপেক্ষাকৃতভাবে পুরানো কিং জেমস বাইবেলে সংস্করণের ভাষায় এটি এত সুপরিচিত যে, আধুনিক কোনো অনুবাদ ব্যবহার করার পরিবর্তে আমি এখানে এবং পরবর্তী আদেশগুলোর ক্ষেত্রে কিং জেমস বাইবেলের অনুবাদগুলো ব্যবহার করবো। আমরা সবাই হয়তো একমত হতে পারবো, ঈশ্বরের ভালো আদেশগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। হয়তো সেই কারণে এটি একমাত্র নির্দেশ যা বহু মানুষ যারা কিনা টেন কম্যান্ডমেন্টসকে শ্রদ্ধা করেন বলে দাবি করে থাকেন, তারা আসলেই সেটি স্মরণ করতে পারেন। স্পষ্টতই কোনো জোরালো বিরোধীতা হবে না, যদি এটিকে আদালতের দেয়ালে খোদাই করে রাখা হয়, কারণ হত্যা, সর্বোপরি প্রতিটি দেশের আইনেই নিষিদ্ধ একটি অপরাধ। বাস্তবিকভাবেই ষষ্ঠ নির্দেশটি মনে পারে একটু বেশি মাত্রায় সুস্পষ্ট। পাথরের ট্যাবলেটগুলো নিয়ে যখন মোজেস পর্বত চূড়া থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন, আপনি কী কল্পনা করতে পারেন সেই দৃশ্যটি, যখন সবাই সেগুলো পড়ে বলছেন, 'ওহ, তোমরা খুন করবে না? কী আশ্চর্য, আমরা কখনোই এভাবে চিন্তা করে দেখিনি, কল্পনা করে দেখুন, তোমরা হত্যা করবে না। বেশ, বেশ, বেশ। ঠিক আছে, আমরা এটা মনে রাখবো, আজ থেকে তাহলে আর কোনো মানব হত্যা নয়'।

যদিও খুব স্পষ্ট মনে হতে পারে, কিন্তু এ ষষ্ঠ আদেশটি যুদ্ধের সময় অমান্য করা হয়, অতি বিশাল মাত্রায়, এবং সেটি ধর্মযাজকের আশীর্বাদসহ করা হয়। সেটি কীভাবে ঘটে বাইবেলে বর্ণিত নানা কাহিনীতে আমরা তা ইতোমধ্যেই দেখেছি। 'লেবেনসরামের' জন্য তাদের যুদ্ধে ইসরায়েলাইটরা সেই সব দুর্ভাগা গোত্রের জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এটি অমান্য করেছিল, যারা আগে থেকেই তাদের ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত ভূমিতে বসবাস করছিলেন, আর ঈশ্বরের সুস্পষ্ট নির্দেশে তারা সেই কাজটি করেছিলেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের জার্মান সৈন্যদের হত্যা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং আর তাদের শত্রুদের হত্যা করতে জার্মান সৈন্যদের অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। উভয় পক্ষই ভেবেছিল ঈশ্বর তাদের সেটি করতে উৎসাহিত করছেন, যা কবি জে. সি. স্কোয়ারকে অনুপ্রাণিত করেছিল লিখতে:

> ঈশ্বর যুদ্ধে প্রস্তুত জাতিগুলোর সঙ্গীত আর চিৎকার শুনেছিলেন:
> 'ঈশ্বর ইংল্যান্ডকে ধ্বংস করো' আর 'ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করো'!
> ঈশ্বর এটা করো, ঈশ্বর সেটা করো, কিংবা ঈশ্বর অন্য কোনো কিছু ...
> 'আশ্চর্য'!, ঈশ্বর বলেন, 'আমাকে কাজ তো বেশ কঠিন হয়ে গেল!

আপাতদৃষ্টিতে পুরো ইতিহাসজুড়ে যুদ্ধের সময় ঈশ্বরের আশীর্বাদসহ সৈন্যদের হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে খানিকটা চিন্তা করে দেখুন। যুক্তরাষ্ট্রের যে অঙ্গরাজ্যগুলোয় খুনিদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, অভিযুক্তকে একটি বিচারের মুখোমুখি করা হয়: এটি বহু সপ্তাহ কিংবা বহু মাসব্যাপী স্থায়ী হতে পারে, এবং বাদীপক্ষের আইনজীবিকে এই অপরাধটি 'ন্যুনতম যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ' ছাড়া একটি জুরির সদস্যদেরকে বিশ্বাস করাতে হবে। সত্যিকারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার আগে অসংখ্য আবেদন নানা স্তরের আদালতে জমা হয়। পরিশেষে একটি মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশে স্বাক্ষর করেন রাজ্যের গভর্নর, যিনি সাধারণত এই দায়িত্বটি খুব গুরুত্বের সাথে নিয়ে থাকেন। এবং তারপর, মৃত্যুদণ্ডের দিন সকালে অনুষ্ঠিত হয় দণ্ডপ্রাপ্তের প্রিয় প্রাতরাশ খাবার একটি ভয়ঙ্কর আচার । কিন্তু যখন কোনো ব্রিটিশ সৈন্য কোনো জার্মান সৈন্যকে যুদ্ধের সময় হত্যা করেন, সেই জার্মান সৈন্যটি - যতদূর ব্রিটিশ সৈন্যের জানার কথা- কোনো অপরাধ করেননি। তাকে কোনো আদালতে বিচার করা হয়নি, তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়নি, তিনি কোনো আইনজীবিকে তার পক্ষে লড়ার জন্য ডাকতে পারবেন না, তার রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করারও কোনো সুযোগ নেই। তিনি এমনকি হয়তো স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেননি, বরং সরকারী নির্দেশ ইচ্ছার

বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করেছে। এবং তারপরও আমরা শত্রু পক্ষের সৈন্যদের হত্যা করতে নির্দেশ দিচ্ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের বিমান সেনাদের বহু সহস্র বেসামরিক নাগরিক হত্যা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আবারো কোনো বিচার ছাড়া: 'তোমরা হত্যা করবে না'?

ব্রিটেনে সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদান করার নির্দেশ থেকে আপনি ক্ষমা পেতে পারেন এমন কিছু ঘোষণা করে: আপনি বিবেকের কারণে হত্যা করতে অস্বীকার করছেন - কিন্তু সেটি করতে হলে আপনার হত্যা-বিরোধী অবস্থানটিকে যুক্তিযুক্ত করতে একটি আদালতের সামনে দাড়াতে হবে, এবং বিচারকদের বিশ্বাস করানো অবশ্যই কষ্টসাধ্য একটি কাজ। কিন্তু যুদ্ধ না করার অনুমতি পাবার সহজ একটি উপায় ছিল পিতা-মাতার দুজনের অন্তত একজনকে 'শান্তিবাদী' কোনো ধর্মের (যেমন কোয়েকার) অনুসারী হতে হবে। কিন্তু আপনি যদি কারণগুলো নিজেই ভেবে থাকেন, এমনকি যুদ্ধের অনৈতিকতা নিয়ে একটি পিএইচডি থিসিসও লিখে থাকেন, তারপরও সেই আদালতের সদস্যদেরকে বিশ্বাস করাতে হবে, আপনাকে সেনাবাহিনীর বাইরে থাকার অনুমতি দেয়া উচিত। যদি আপনি সেটি করতে সফল হন, এর পরিবর্তে আপনি একটি অ্যাম্বুলেন্স চালাতে পারেন। আমি নিজে সম্ভবত এমন আদালদের বিচারকদের কিছু বিশ্বাস করাতে ব্যর্থ হতাম। কিন্তু আমি গোপনে ইচ্ছা করেই ভূল নিশানায় গুলি চালাতাম।

ষষ্ঠ আদেশটি যা মূলত বোঝাচ্ছে সেটি হচ্ছে, 'তোমরা তোমাদের নিজস্ব গোত্রের সদস্যদের হত্যা করবে না (অবশ্যই যদি না তারা সাবাথের দিনে কাঠ কুড়ায়, অথবা ক্ষমার অযোগ্য কোনো অপরাধ করে!)। আমরা সেটি জানি কারণ ঈশ্বর চরিত্রটি বেপরোয়া নিষ্ঠুরতা এবং আগ্রহের সাথে তার নির্বাচিত জনগোষ্ঠীর সদস্যদের অন্য গোত্রের মানুষদের হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

<u>সপ্তম আদেশ</u>: তোমরা ব্যভিচার করবে না।

এটিও খুব সুস্পষ্ট একটি আদেশ। এমন কারো সাথে যৌনমিলন করবে না, যদি আপনাদের মধ্যে কেউ অন্য কারো সাথে বিবাহিত হয়ে থাকেন। কিন্তু আপনি এমন কিছু পরিস্থিতি কল্পনা করতে পারেন যখন এটি শিথিল করা উচিত। যেমন যখন অসুখী এবং দীর্ঘদিন আগেই ভেঙ্গে যাওয়া বিবাহিত জীবনে বন্দী এমন কেউ অন্য কারো গভীর প্রেমে পড়েন। আমরা যেমন পরে দেখবো, কেউ কেউ নৈতিক নিয়মগুলোকে চূড়ান্ত এবং যে-কোনো পরিস্থিতিতে অলঙ্ঘনীয় ভাবেন। অন্যরা মনে করেন, সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই নিয়মগুলো

শিথিল বা নমনীয় করা উচিত। যা-ই হোক না কেন, অনেকেই হয়তো বলেন, প্রত্যেকের ভালোবাসার জীবন ব্যক্তিগত একটি ব্যাপার, আদালতের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা মত কোনো আদেশ নয়, যেন এটি সে দেশের কোনো আইন।

অষ্টম আদেশ: তোমরা চুরি করবে না।

'তোমরা হত্যা করবে না'- এই আদেশটির মত, এটিও কোনো আদালতে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রতিরোধের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা কম। হত্যা করার মতোই সব দেশের আইনে চুরি করা একটি অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত।

নবম আদেশ : তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে তুমি মিথ্যা কোনো সাক্ষ্য দেবে না।

হ্যাঁ, আসলেই। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া, অর্থাৎ প্রতিবেশী হোক বা না হোক এমন যে কারো বিরুদ্ধে কোনো কিছু নিয়ে মিথ্যা বলা। আবারও, সাক্ষীরা হচ্ছেন আইনের একটি ভিত্তি, বিশেষ করে যখন তারা শপথ নিয়ে বলেন, তারা অবশ্যই 'সত্য বলবেন, সম্পূর্ণ সত্য, এবং সত্য ছাড়া আর কিছু নয়'।

দশম আদেশ : তোমরা তোমার প্রতিবেশী বাড়ি নিয়ে লোভ করবে না, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীকে যেমন কামনা করবে না, তেমনি তার দাস কিংবা দাসী এবং তার ষাড়, কিংবা তার গাধা, তোমার প্রতিবেশীর কোনো কিছুর উপরেই লোভ করবে না।

অনুবাদে যে ইংরেজি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে - 'কভেট', সেটি ইংরেজি 'এনভি' (বা পরশ্রীকাতরতা) শব্দটির অপ্রচলিত একটি সমার্থক শব্দ, ঈর্ষাকাতর করে তোলা সেই জিনিসটি কিংবা ব্যক্তিকে নিজের অধিকারে আনতে চাওয়া এর সাথে যুক্ত হয়েছে। আপনার চেয়ে ভাগ্যবান এমন কারো প্রতি ঈর্ষাকাতর অনুভব না করা বেশ কঠিন একটি কাজ হতে পারে। কিন্তু এটি নিশ্চয়ই আইনের বিষয় নয়, যতক্ষণ না অবধি আপনি যে জিনিসটিকে কামনা করছেন সেটি জোরপূর্বক কারো নিকট থেকে কেড়ে নেবেন। কিছু রাজনৈতিক বিপ্লবীদের মতে এমনকি সেটিও যুক্তিযুক্ত হতে পারে। যেমন তাদের একটি অংশ মনে করেন রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করে সবার কল্যাণে সেটি ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত। আমি কমিউনিস্ট কিংবা নাস্তিবাদী নই, কিন্তু হয়তো আপনি বুঝতে পারছেন সেগুলো কোথা থেকে আসছে? অন্যরা, যারা নিজেদের 'লিবার্টারিয়ান' বলেন, তারা এর বিপরীত চূড়ান্ত অবস্থানটি নেয়। তারা মনে করেন এমনকি কর আদায় করাও এক ধরনের রাষ্ট্রীয় চুরি, এবং তারা ধনীদের থেকে কেড়ে নিয়ে যা

দরিদ্রদের সহায়তায় ব্যবহার করেন। কিংবদন্তীর তীরান্দাজ রবিন হুড ঠিক তাই করেছিলেন, এবং তার আরো আধুনিক সমতুল্য ওয়াইল্ড ওয়েষ্টের জেসি জেমস এবং আইরিশ হাইওয়েম্যান উইলি ব্রেনানের মত কিছু মানুষের কাছে এর রোমান্টিক একটি আবেদন আছে ।

প্রসঙ্গক্রমে, লক্ষ করুন বাইবেল বর্ণিত দশটি আদেশ প্রতিবেশীর স্ত্রী এবং তার দাস-দাসীদেরকে বাড়ি কিংবা গবাদী পশুর মত তার নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করেছে। একজন নারী কোনো পুরুষের সম্পত্তি: তার মালিকানধীন জিনিসগুলোর একটি – একটি 'জিনিস' যার স্বত্তাধিকারী একজন পুরুষ - এ ধারণাটি নিয়ে আপনার মতামত কী? আপনি কী মনে করেন? আমি মনে করি এটি জঘন্য একটি ধারণা, কিন্তু দীর্ঘ সময়ব্যাপী বহু সংস্কৃতির গভীরে এ ধারণটি প্রোথিত হয়ে আছে এবং পাকিস্তান কিংবা সৌদি আরবের মত দেশগুলোয় আমরা এখনো এটি দেখতে পাই, যেখানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম দ্বারা এটি অনুমোদিত। কিছু মানুষ (আমি না) মনে করেন যে, ধারণাটি 'শ্রদ্ধা' পাওয়া জন্য এটাই যথেষ্ট ভালো একটি কারণ। আপনি হয়তো সেই বাক্যটি শুনেছেন, 'এটি তাদের সংস্কৃতির একটি অংশ', এই প্রস্তাবনাটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আমাদের এটি শ্রদ্ধা করতে হবে। আমি যখন লিখছি, সৌদি আরব নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি দিয়ে কেবলই একটি আইন অনুমোদন করেছে। একজন বিবাহিত নারীর জন্য এখনো তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা সেখানে নিষিদ্ধ। যার বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি নেই যদি না তার স্বামী অথবা কোনো পুরুষ আত্মীয় সঙ্গ থাকেন – সঙ্গী একটি ছেলে শিশু হলেও যথেষ্ট। দৃশ্যটি কল্পনা করুন: একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী, হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত, বাড়ির বাইরে বের হতে হলে তার আট বছরের পুরুষ শিশুটিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং অবশ্যই পুরুষ 'রক্ষক' হিসাবে তাকে সাথে নিয়ে বের হতে হবে। এসব নারী-বিদ্বেষী আইনগুলোকে অনুপ্রাণিত করেছে ইসলাম।

আমি কল্পনা করতে পারছি যে, যদি দশম আদেশটি আমেরিকার আদালতগুলোর দেয়ালে খোদাই করা হয়, নারীদের এই বিষয়ে প্রতিবাদ করার যথেষ্ট কারণ থাকবে। অন্তত পক্ষে আমরা হয়তো যোগ করতে পারি, সাম্যতার খাতিরে (এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবার খাতিরে), 'তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীর স্বামীকে কামনা করবে না, কিংবা তার জাগুয়ার গাড়ি, বা তার ডক্টরেট ডিগ্রীর ওপরে লোভ করবে না'।

বেশ, অবশ্যই এই দশটি ঐশ্বিক নির্দেশ বেশ সময় অনুপযোগী। সুতরাং বাইবেলকে সমালোচনা করা খানিকটা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাবে, কারণ এটি লেখা

হয়েছে হাজার বছর আগে যখন পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের মালিক ছিলেন, এবং দাস-দাসীরা ছিল তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। অবশ্যই আমরা সেই খারাপ পুরানো দিন বহু দিন আগেই ফেলে এসেছি। আর এটাই কী মূল বক্তব্য নয়? হ্যাঁ, সেই প্রাচীন খারাপ দিনগুলো থেকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। আর সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক সেই কারণেই বাইবেল থেকে আমাদের নৈতিকতা, 'ন্যায়-অন্যায়', 'কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়' সংক্রান্ত ধারণাগুলো আমাদের গ্রহন করা উচিত নয়। এবং বাস্তবিকভাবেই আমরা সেগুলো বাইবেল থেকে পাই না। যদি আমরা সেটি পেতাম, তাহলে সাবাথের দিনে কাজ অথবা ভুল ঈশ্বরকে উপাসনার করার মত অপরাধে আমরা এখনো পাথর নিক্ষেপ করে মানুষ হত্যা করতাম।

'কিন্তু' কেউ হয়তো বলতে পারেন, 'এটি শুধু ওল্ড টেস্টামেন্ট'। আসুন এর বদলে নিউ টেস্টামেন্ট থেকে আমরা আমাদের নীতিবোধগুলো গ্রহন করি'। হ্যাঁ, অপেক্ষাকৃতভাবে সেটি ভালো একটি ধারণা হতে পারে। যিশু বেশ কিছু ভালো কথা বলেছেন, যেমন, সার্মন অন দ্য মাউন্টে। ওল্ড টেস্টামেন্টের যে-কোনো কিছু থেকে যা অবশ্যই খুবই ভিন্ন। কিন্তু আমরা কীভাবে জানতে পারি, বাইবেলের কোন বার্তাটি ভালো আর কোনটি মন্দ? কীভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি? সেই সিদ্ধান্তটির ভিত্তি হতে হবে এমন কিছু, যা বাইবেলে বাইরে অবস্থিত: নয়তো এটি চক্রাকার একটি যুক্তি, যদি না আপনি এমন কোনো নিয়ম উদ্ভাবন করে নেন, যেমন, বাইবেলে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলো এর আগের অনুচ্ছেদগুলো স্থান অধিকার করবে'। প্রসঙ্গক্রমে, ইসলামে কিন্তু আসলেই সে নিয়মটি আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটির পরিণতি হচ্ছে এটি ভুল দিকে পরিচালিত করে। মক্কায় থাকার সময় নবী মুহম্মদ বেশ কিছু ভালো কথা বলেছিলেন, কিন্তু পরে মদিনায় হিজরত করার পর, ঐতিহাসিক কিছু পরিস্থিতির কারণে তিনি আরো বেশি যুদ্ধপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ইসলামের নামে করা বহু নৃশংস ঘটনাকে কুর'আনে পরবর্তীতে আসা 'মদিনা' আয়াতগুলোর মাধ্যমে যুক্তিযুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো পূর্ববর্তী এবং অনেক বিনম্র 'মক্কা' আয়াতগুলোকে বিরোধীতা ও প্রতিস্থাপিত করেছে আনুষ্ঠানিক মতবাদ অনুযায়ী।

খ্রিস্টান বাইবেলে ফিরে আসি, সেখানে কিন্তু এমন কিছু কখনো বলা হয়নি, 'ওল্ড টেস্টামেন্টের কথা তোমরা ভুলে যাও, ন্যায় অথবা অন্যায় অনুসন্ধান করতে শুধু নিউ টেস্টামেন্ট অনুসরণ করো'। যিশু এমন কোনো নির্দেশ দিতে পারতেন। বাস্তবিকভাবে (ম্যাথিউ ৫:১৭) তিনি ঠিক এর বিপরীতটাই বলেছিলেন:

> ‘ভেবো না যে আমি ‘আইন’ অথবা নবীদের বাতিল করে দিতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল নয় বরং পূর্ণ করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্য বলছি, এ আকাশ আর পৃথিবী যত দিন অপসারিত না হবে, ক্ষুদ্রতম বর্ণ, কলমে সামান্য একটি আঁচড়, কোনোভাবেই ‘আইন’থেকে অদৃশ্য হবে না যতক্ষণ না সবকিছু সম্পন্ন হয়’।

এছাড়াও ল্যুকেও আমরা দেখি (১৬:১৭),

> ‘আইন’ থেকে কলমের একটি আঁচড় ঝরে পড়া অপেক্ষা আকাশ আর পৃথিবীর বিলুপ্ত হওয়া সহজতর’।

যিশুর মত একজন ইহুদীর কাছে ‘আইন’ (‘দ্য ল’), হচ্ছে ওল্ড টেস্টামেন্টের সুনির্দিষ্ট কিছু বই। ওল্ড টেস্টামেন্ট নিয়ে যিশু স্পষ্টতই বেশ আশাবাদী একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করে নিয়েছিলেন। ম্যাথিউর (৭:১২) বিবরণে আমরা তাকে বেশ ভালো একটি মূলনীতি উল্লেখ করতে দেখি , ‘গোল্ডেন রুল’ হিসাবে যা আমাদের কাছে পরিচিত (অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করুন, যে আচরণ আপনি অন্যদের কাছ থেকেও প্রত্যাশা করেন) এবং তারপর তিনি ওল্ড টেস্টামেন্টের কেন্দ্রীয় বার্তাটির সারসংক্ষেপ করেছিলেন:

> ‘সুতরাং সর্বক্ষেত্রে, অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করবে, তোমার সাথে তারা যেভাবে আচরণ করবে বলে তুমি নিজে প্রত্যাশা করো, কারণ এটাই ‘আইন’ আর নবীদের শিক্ষার মূলসার’।

এটি সত্য যে, আপনি ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত এই গোল্ডেন রুলের মত প্রায় একই রকম কিছু অন্য কোথাও খুঁজে পেতে পারেন (আপনি গোল্ডেন রুলের আরো প্রাচীন, আরো সুনির্দিষ্ট একটি সংস্করণ খুজে পেতে পারেন প্রাচীন মিশর,ভারত, চীন এবং গ্রিসের কোনো পাণ্ডুলিপিতে):

> ‘তোমাদের স্বজাতির কারোর উপর প্রতিশোধ অথবা কোনো ক্ষোভ পুষে রেখো না, বরং তোমাদের প্রতিবেশীদের ভালোবাসো, যেভাবে তোমরা নিজেদেরকে ভালোবাসো, আমি তোমাদের প্রভু (লেভিটিকাস, ১৯:১৮)’।

কিন্তু এটিকে ওল্ড টেস্টামেন্টের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হিসাবে দাবী করা হচ্ছে বেশি মাত্রায় অতিরঞ্জন। যেমন, আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখেছি, স্বয়ং ঈশ্বরই অসন্তোষ, বা ঈর্ষা আক্রোশ পুষে রাখার ক্ষেত্রে আরো বেশী মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের বহু অনুচ্ছেদে আছে, যেগুলো প্রতিহিংসা প্রচার করে।

> ‘যদি কেউ তার প্রতিবেশীর কোনো ক্ষতি করে, সে যা কিছু করেছে তার সাথে ঠিক সেটাই অবশ্যই করতে হবে: হাড় ভাঙ্গার বদলে হাড় ভাঙ্গা, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। সে যেভাবে অন্যকে আহত করেছে, তাকেও সেই ভাবে আহত করতে হবে (লেভিটিকাস, ২৪:১৯)’।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার, এই নির্দেশনাটিও আরো একটি বিষয় সরাসরি যা ব্যাবিলন থেকে এসেছে, এই ক্ষেত্রে ‘কোড অব হাম্মুরাবি’ (হাম্মুরাবির নির্দেশনা) থেকে। হাম্মুরাবি ব্যাবিলনের সুপরিচিত একজন রাজা ছিলেন, এবং তার নিদের্শগুলো লেখা হয়েছিল ওল্ড টেস্টামেন্ট লেখারও প্রায় এক হাজার বছর আগে।

বাইবেল থেকে আরো একটি সংস্করণ এখানে উল্লেখ করছি, এটি এসেছে বুক অব ডিউটেরোনমি থেকে:

> ‘কোনো করুণা প্রদর্শন করবে না: জীবনের বিনিময়ে জীবন, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা (ডিউটেরোনমি, ১৯:১২)’।

হয়তো আপনি এটিকে পরিচিত ‘গোল্ডেন’ রুল বা আইনটির এক ধরনের নেতিবাচক সংস্করণ মনে করতে পারেন। নেতিবাচক দিক থেকে দেখলে এটি আর তেমন ভালো মনে হয় না, তাই না?। যিশু নিজেই (ম্যাথিউ ৫:৩৮) এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে এর বিপরীতটাই বলেছিলেন, এমনকি ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই বিশেষ বাক্যটি উদ্ধৃত করে:

> ‘তোমরা শুনেছো যে, বলা হয়েছিল: ‘চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত’, কিন্তু আমি তোমাদের বলবো, কোনো অশুভ ব্যক্তিকে প্রতিরোধ কোরো না, যদি কেউ তোমাকে ডান গালে আঘাত করে, তার দিকে অন্য গালটিও পেতে দাও। এবং যদি কেউ তোমার বিরুদ্ধে মামলা করে এবং তোমার পরণের কাপড়ও নিয়ে নেয়, তোমার অন্য কাপড়ও তাকে দিয়ে দাও, যদি কেউ তোমাকে তার সাথে এক মাইল যেতে বাধ্য করে, তার সাথে তুমি দুই মাইল যাও’।

আমার মনে হয়না প্রতিশোধ নেবার ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে কখনোই এর চেয়ে আরো সুস্পষ্ট আর উদার কোনো প্রস্তাবনার অস্তিত্ব থাকতে পারে। এটি যিশুকে তার সময়ের চেয়ে বহু অগ্রসর সময়ের একটি অবস্থানে

স্থাপন করেছিল, অবশ্যই ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর চরিত্রটির চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর।

কিন্তু তারপরও যিশু নিজে প্রতিহিংসার উর্ধে ছিলেন না। টমাসের সেই ইনফ্যান্ট (শিশু) গসপেলকেও যদি বাতিল করে দেয়া হয়, ম্যাথিউ এবং মার্কের দুটি স্বীকৃত গসপেলই একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে, যেখানে তিনি খুব ক্ষুদ্র মাত্রায় একটি প্রতিশোধ নিয়েছিলেন, তাও আবার একটি ডুমুর গাছের উপর:

> একদিন বেশ সকালে, যখন তিনি শহর থেকে ফিরছিলেন, তখন তিনি বেশ ক্ষুধা অনুভব করেছিলেন। রাস্তার পাশে একটি ডুমুর গাছ দেখে তিনি সেটির দিকে এগিয়ে যান, কিন্তু পাতা ছাড়া সেখানে আর কিছু তিনি পাননি, তারপর তিনি এটিকে বলেন, 'আর কখনোই যেন তুমি ফলবতী না হও', তাৎক্ষণিকভাবে সেই গাছটি শুকিয়ে ঝরে পড়েছিল (ম্যাথিউ (২১:১৮)।

মার্কের সংস্করণটি (১১:১৩) যুক্ত করেছিল যে, গাছটিতে কোনো ডুমুর না থাকার কারণ ছিল তখন বছরের কেবল শুরু, অসহায় ডুমুর গাছটিতে ফল হবার ঋতু তখনও শুরু হয়নি।

বোধগম্য কারণে খ্রিস্টানরা ডুমুর গাছের এই গল্পটি নিয়ে বিব্রত বোধ করেন। কেউ বলেন এটি কখনোই ঘটেনি, যেমন, টমাসের শিশু গসপেলের কাহিনীগুলোর মতোই। অন্যরা শুধু এটিকে উপেক্ষা করেন এবং নিউ টেস্টামেন্টের ভালো অংশগুলোর উপর নজর দেন। কিন্তু তারপরও কেউ কেউ এটিকে 'প্রতীকী' বলে দাবী করেন। আসলেই সেখানে সত্যিকারের কোনো ডুমুর গাছ ছিল না, এটি ইসরায়েল জাতির একটি রুপক। এটি ধোকা দেবার উদ্দেশ্যে ধর্মতাত্ত্বিকদের খুব প্রিয় একটি কৌশল, আপনি কী কখনো সেটি লক্ষ করেছেন? যদি আপনি বাইবেলে আছে এমন কিছু পছন্দ না করেন, শুধু বলতে হবে, এটি শুধু 'প্রতীকী', আসলেই এমন কিছু কখনো ঘটেনি, গুরুত্বপূর্ণ কোনো বার্তা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হওয়া একটি রুপক। এবং অবশ্যই কোন অনুচ্ছেদটিকে রুপক আর কোনটি আক্ষরিকভাবে গ্রহন করতে হবে সেটি তারা নিজেরাই বাছাই করেন।

আনুষ্ঠানিক গসপেলগুলোয় অন্য আরো কিছু জায়গা আছে যেখানে যিশু নিজেও ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত তার পিতার মতোই নিষ্ঠুর রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। যেমন ল্যুক ১৯:২৭ এ তিনি সেই মানুষগুলো সম্বন্ধে বলেছিলেন যারা তাকে তাদের রাজা হিসাবে গ্রহন করতে অস্বীকার করেছিল, তিনি বলেছেন, তাদের

নিয়ে আসো ‘এখানে, এবং আমার সামনে তাদের হত্যা করো’। রোমান ক্যাথলিকদের যিশুর মা মেরিকে উপাসনা করার বাস্তবতা সত্ত্বেও যিশু বিস্ময়করভাবেই নিজে কিন্তু তার মায়ের সাথে তেমন ভালো আচরণ করেননি। তার প্রথম অলৌকিক কাণ্ডটি ঘটানোর সময় - একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যেখানে তিনি পানিকে মদে পরিণত করেছিলেন - সেখানে যখন তার মা তার কাছে এসেছিলেন, যিশু তাকে বলেছিলেন, ‘নারী, তোমার সাথে আমার কী করার আছে? কিং জেমস বাইবেলের সংস্করণে যখন এটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় তার চেয়ে হয়তো মূল আরামায়িক ভাষায় এটি অপেক্ষাকৃত কম নিষ্ঠুর শোনায়। আধুনিক অনুবাদগুলোর একটিতে, নিউ ইন্টারন্যাশনাল সংস্করণটিতে নারী শব্দটির আগে একটি ‘প্রিয়’ যুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যা অন্তত এ বাক্যটির মেজাজ পূর্বাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম নিষ্ঠুর করেছে। (একজন ক্ল্যাসিকাল পণ্ডিত বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, গ্রিক যে শব্দটি এখানে ‘নারী’ বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দটির বদলে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি কখনো কখনোও একটি অন্তরঙ্গ ‘প্রিয়’ ধরনের কোনো অর্থ থাকতে পারে)। এবং নিরপেক্ষ হয়েও যদি বলা হয়, যেহেতু পানিকে মদে পরিণত করার এই কাহিনী অবশ্যই সত্য নয়, তখন খুবই ভালো সম্ভাবনা আছে যে, বিয়ের সে অনুষ্ঠানে মেরিকে যিশুর অপমান করার ঘটনাটিও আসলে ঘটেনি।

এটি ঘটুক কিংবা না ঘটুক, এটি একমাত্র গল্প নয় যেখানে যিশুকে পারিবারিক মূল্যবোধের একজন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে নির্বাচনের বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হতে পারে: ‘যদি কেউ আমাকে অনুসরণ করতে আসে এবং তারা যদি তাদের বাবা-মা, তার স্ত্রী এবং সন্তান, তার ভাই এবং বোনদের ঘৃণা না করে - হ্যাঁ, এমনকি তার নিজের জীবনকেও - সে আমার শিষ্য হতে পারবে না। (ল্যুক ১৪:২৬)।

আরেকটি বিবরণে, যিশু একটি জমায়েতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, এবং তখন তাকে বলা হয়েছিল যে তার সাথে কিছু কথা বলার আশায় তার মা এবং ভাইরা অপেক্ষা করছেন, আবারো সেই প্রত্যাখ্যান:

> কেউ তাকে বলেছিলেন, ‘আপনার মা এবং ভাইরা বাইরে দাড়িয়ে আছেন, আপনার সাথে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করছেন’, তিনি এর উত্তরে তাকে বলেছিলেন, ‘কে আমার মা, আর কারা আমার ভাই’? এবং তিনি তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে বলেন, ‘এরাই হচ্ছে আমার মা এবং আমার ভাই (ম্যাথিউ ১২:৪৮)।

অন্য একটি ঘটনায়, যিশুকে যতটা না খারাপ মনে হয়েছে তার চেয়ে বেশি অজ্ঞ মনে হয়েছে এবং সেটি খুব ভালো উপায়ে নয়। গাডারিন এলাকায়, যিশুর সাথে দুজন ব্যক্তির দেখা হয়েছিল, বলা হয়েছিল তাদের উপর 'অশুভ আত্মা' 'ভর' করেছে (ম্যাথিউ ৮)। 'তারা এতই হিংস্র ছিল যে সেখান দিয়ে কেউ যেতে পারতো না'। সম্ভবত স্কিৎসোফ্রেনিয়া, অথবা অন্য কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত কেউ, কিন্তু যিশু তার সময়ের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসই অনুসরণ করেছিলেন, সেই 'দানবীয় অশুভ আত্মা'য় বিশ্বাস। তিনি সেই ব্যক্তিদের শরীর থেকে দানবগুলোকে বের হয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপর সেই দানবদের অন্য কোথাও যাবার জায়গা ছিল না, সুতরাং নিকটেই অবস্থান করা একদল শূকরের শরীরে তিনি তাদের প্রবেশ করতে বলেছিলেন। সে দানবগুলো সেটাই করেছিল এবং অসহায় শূকরগুলো (প্রবাদে যারা বিখ্যাত গাডারিন সোয়াইন নামে) উন্মত্ত হয়ে তাদের নাক বরাবর দৌড়াতে শুরু করেছিল, এবং একটি খাড়া পাহাড়ের ঢাল থেকে নীচে পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিল। খুব একটা ভালো গল্প নয়। অবশ্যই আমি প্রথম শতাব্দীর কাউকে মানসিক অসুস্থতা সম্বন্ধে কিছু না জানার জন্য দোষী হিসাবে চিহ্নিত করবো না। নিজের সময়ের মানদণ্ড দিয়ে পূর্ববর্তী কোনো সময়ের মানুষকে বিচার করার কাজটি কোনো ভালো ইতিহাসবিদই করেন না। কিন্তু যিশু তো কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের কী আরো ভালো জানা উচিত নয়?

যিশু খারাপ মানুষ ছিলেন না, শুধুমাত্র তিনি তার সময়ের একজন মানুষ। কল্পনা করুন কত অসাধারণ একটি বিষয় হতো, যদি যিশু বলতেন: 'আমি নিশ্চিতভাবেই তোমাদের বলছি, দানব/প্রেতাত্মা ইত্যাদি কিছু নেই, এমন কিছু নেই যা কিনা মানুষের শরীর থেকে উড়ে শূকরের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এই মানুষটির অসুস্থতা তার মস্তিষ্কে। কোনো দানবই কোথাও নেই'। এমন কী আরো উত্তম, কল্পনা করুন আমরা ঠিক কী পরিমানে বিস্মিত হতাম যদি যিশু তার শিষ্যদের বলতেন, 'সূর্যের চারপাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে, এবং সব জীবই পরস্পরের আত্মীয়, এবং পৃথিবীর বয়স কয়েক হাজার কোটি বছর, এবং মিলিয়ন বছর সময়ের পরিক্রমায় পৃথিবীর মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছে'। কিন্তু না, তার প্রজ্ঞা, বহু উপায়ে সেটি প্রশংসনীয় হতে পারে, সেই প্রজ্ঞা তার সময়ের কোনো ভালো মানুষের প্রজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয়, সে প্রজ্ঞা কোনো ঈশ্বরের হতে পারে না, শুধু একজন মানুষের, যদিও সে ভালো মানুষ।

কল্পনা করুন আমরা ঠিক কতটা বিস্মিত হতাম যদি নবী মুহাম্মদ, তার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করে বলতেন, 'হে বিশ্বাসীরা, আকাশে আর যে-কোনো নক্ষত্রের মতোই সূর্যও একটি নক্ষত্র, অন্যগুলো অপেক্ষা যা শুধু আমাদের অনেক নিকটবর্তী। মনে হতে পারে যে, এটি পূর্ব দিকে উদিত হচ্ছে এবং সারাদিন ধরে আকাশ অতিক্রম করে এটি পশ্চিমে অস্ত যায়। কিন্তু সত্যিকারভাবে আমাদের কাছে এমন কিছু মনে হবার কারণ হচ্ছে পৃথিবীর নিজের ঘুর্ণন'। না, দুর্ভাগ্য যে, তিনি এমন কিছু বলেননি, বরং তিনি আসলেই বলেছিলেন, 'সূর্য একটি জলায় অস্ত যায়'।

অথবা কল্পনা করুন - এলাইজা, অথবা ইসাইয়া বলছেন, 'শোনো, ও ইসরায়েল, আমাদের প্রভু ঈশ্বরের কথা শোনো। একটি স্বপ্নের মাধ্যমে ঈশ্বর আমার কাছে উন্মোচন করেছেন যে, কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি দ্রুতগামী নয়'। কিন্তু এর পরিবর্তে আমরা তাদের কাছ থেকে যা শুনি তা হচ্ছে - একজন ঈশ্বরের উপাসনা, কীভাবে জীবন কাটাতে হবে সে সম্বন্ধে বহুবিধ নিয়ম অনুসরণ করার নির্দেশ – সেই সবকিছু যা তাদের সময়ে অন্যদের হয়তো মনে হয়েছিল।

বাইবেলে আপনি সুন্দর কিছু অনুচ্ছেদ খুঁজে পেতে পারেন, কিছু এমনকি ওল্ড টেস্টামেন্টেও - আমার অভিজ্ঞতা বলছে যদিও সংখ্যায় খুব বেশি নয় । কিন্তু আমরা কীভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি কোন অনুচ্ছেদটি উপেক্ষা করতে হবে, কারণ সেগুলো খারাপ এবং কোন অনুচ্ছেদগুলো সমর্থন করতে হবে, কারণ সেগুলো ভালো? এর উত্তর অবশ্যই হতে হবে যে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমাদের কাছে অন্য কিছু মানদণ্ড আছে, একটি মানদণ্ড যা দিয়ে আমরা কোনগুলো ভালো আর কোনগুলো খারাপ সেটি বিচার করতে পারি। এই যুক্তি প্রক্রিয়াটি বাইবেল থেকে আসে না, কিন্তু তারপরও, এ মানদণ্ডটি যা-ই হোক না কেন, কেন আমরা সেটি সরাসরি ব্যবহার করছি না? বাইবেলের কোন অংশগুলো ভালো আর কোন অংশগুলো খারাপ সেগুলো নির্বাচন করার জন্য যদি আমাদের কাছে স্বতন্ত্র কোনো মানদণ্ড থেকে থাকে, তাহলে এই বাইবেল নিয়ে আদৌ আমাদের এত ভাবনা কেন?

কিন্তু আপনি হয়তো বলতে পারেন, এই সব স্বতন্ত্র স্বাধীন মানদণ্ড নিয়ে কথা বলা বেশ ভালো, আসলেই এর অস্তিত্ব আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু সেটি আসলে কী? প্রকৃতপক্ষে কীভাবে আমরা আসলেই সিদ্ধান্ত নেই কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ (ঘটনাক্রমে সেই কারণে পবিত্র বইগুলোর কোন অনুচ্ছেদগুলো ভালো আর কোনগুলো মন্দ)? আর সেটাই হবে পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়।

৬ কীভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেই কোনটা ভালো?

অন্য সব প্রাণীদের মতো আমরা মানুষরাও বহু শত মিলিয়ন বছরের বিবর্তনের সৃষ্টি। শরীরের অন্যান্য অংশের মতো আমাদের মস্তিষ্কও বিবর্তিত হয়েছে। আর এর অর্থ হচ্ছে যা কিছু আমরা করি, যা কিছু আমরা করতে পছন্দ করি, আমাদের যা সঠিক কিংবা ভুল মনে হয়, সেটিও বিবর্তিত হয়েছে। পূর্বসূরিদের কাছ থেকে আমরা মিষ্টি খাবারের প্রতি আকর্ষণ,পচনশীল কিছু থেকে আসা দুর্গন্ধের প্রতি 'বিবমিষা' প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। আমরা বিবর্তিত যৌন কামনা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। এই সব কিছু বোঝা খুব সহজ মনে হতে পারে। পরিমিত পরিমানে চিনি বা শর্করা আমাদের জন্যে ভালো, যদিও অতিরিক্ত বেশি পরিমানে যা ক্ষতিকর। বর্তমানে আমরা এমন একটি পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে অতি বেশি পরিমানে শর্করা খুব সহজেই আমাদের জন্য লভ্য। কিন্তু আফ্রিকার সাভানায় আমাদের পূর্বসূরিদের জন্য এটি সত্য ছিল না। তাদের জন্য শর্করার ভালো একটি উৎস ছিল ফল, এবং বহু ফলেই পরিমিত পরিমানে শর্করা আছে। তাদের জন্য খুব বেশি পরিমানে শর্করা পাওয়া তাই আসলেই অসম্ভব ছিল। সুতরাং আমরা এর জন্যে প্রায় সীমাহীন একটি চাহিদা নিয়েই বিবর্তিত হয়েছি। পচনশীল কিছুর দুর্গন্ধ ভয়ঙ্কর ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি ইঙ্গিত করে। পচনশীল মাংস না খেয়ে এড়িয়ে যাওয়া আমাদের পূর্বসূরিদের সুবিধা দিয়েছিল, এবং এর সাথে এই ধরনের গন্ধের প্রতি এক ধরনের অসহনীয় বিতৃষ্ণাও যুক্ত হয়েছিল। বিপরীত লিঙ্গের কোনো সদস্যদের প্রতি আমাদের আকর্ষণ আর কামনা বিবর্তনের কারণ খুব সুস্পষ্ট । যৌন কামনা একটি পর্যায়ে শিশুর জন্ম দেয়, আর ঐসব শিশুরা সেই জিনগুলো বহন করে , যে জিনগুলো এর বাহক প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের ক্ষেত্রেও যৌন কামনা সৃষ্টি করে। আমরা সবাই পূর্বসূরিদের অবিচ্ছিন্ন একটি বংশধারা থেকে এসেছি, যারা তাদের বিপরীত লিঙ্গের কোনো সদস্যদের সাথে মিলিত হয়েছিল, আর আমরাও সেই কাজটি করতে তাদের সেই কামনাটিও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

কিন্তু এবার এমন কিছু বিষয় যা বোঝা খুব সহজ নয়। মনে করা হয় অন্যদের সাথে ভালো আচরণ একটি ইচ্ছাও আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। যেমন, অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব, তাদের সাথে সময় কাটানো, তাদের সহযোগিতা করা, বিপদে তাদের সহমর্মী হওয়া এবং প্রয়োজনের সময় তাদের সহায়তা করা। আর ভালো আচরণ করার বিবর্তনীয় কারণগুলো ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন, এবং বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা অধ্যায়গুলোর পরে অবশ্যই এগারো অধ্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ইতোমধ্যে আমি শুধু আপনাদের মেনে করে নিতে

অনুরোধ করতে পারি, বিশেষভাবে সীমিত একটি প্রকারে ভালো আচরণ করার এই প্রবণতাটি আমাদের বিবর্তনীয় বংশঐতিহ্যের একটি অংশ, যেভাবে যৌন কামনা আমাদের বিবর্তনীয় বংশঐহিত্যের একটি অংশ। এটি সম্ভবত আমাদের ন্যায় আর অন্যায় সংক্রান্ত ধারণাগুলো গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান দেয়। আমাদের সেই সব বিবর্তিত নৈতিক মূল্যবোধগুলো আছে, যেগুলো বহু দূরবর্তী পূর্বসূরিদের কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

এবং তারপরও সেটি এই অধ্যায়ের শিরোনামে থাকা প্রশ্নটির শুধু আংশিক উত্তর হতে পারে। আর অবশ্য এটি এমনই হবার কথা, যদি শুধু বিবেচনা করা হয়, শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়া সাথেই ন্যায় আর অন্যায় সংক্রান্ত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়, ইতিহাসের সময়-মাত্রায় এই পরিবর্তনগুলো এত দ্রুত যে, এটি কোনো বিবর্তনীয় পরিবর্তনকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনা।

দশক অতিক্রান্ত হলে আপনি নিজেও সেটি লক্ষ করতে পারেন। এটি প্রায় 'কিছু একটা যেন ঘটতে যাচ্ছে' এমন একটি অনুভূতি। অবশ্যই আক্ষরিকার্থে এটি বাতাসে ভাসমান এমন কিছু নয়। এটি বহু বিষয়ের একটি সংমিশ্রণ, অথবা মনে হতে পারে যেন এটি আসন্ন কিছু - কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে - কারণ কোনো একটি মাত্র এলাকায় এটি নির্দিষ্ট করা যায় না। যে শতাব্দীতে আমরা এখন বাস করছি - যদি আমরা এক শতাব্দী আগের কোনো সময়ের সাথে এটি তুলনা করি, একবিংশ শতকের প্রভাবশালী নৈতিক মূল্যবোধগুলো লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন। এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রচলিত মূল্যবোধগুলো থেকে এগুলো এমনকি আরো বেশি ভিন্ন। সেই সময় ক্রীতদাস রাখা প্রায় সবার কাছেই স্বাভাবিক একটি বিষয় ছিল - এমনকি জ্যামাইকায় আমার পূর্বসূরিরাও সেটি করেছিলেন। আমি দুঃখের সাথেই বলছি - এবং তারা ভাবতেন ক্রীতদাসদের যদি স্বাধীনতা দেয়া হয়, তাহলে পুরো সভ্যতাই ধ্বসে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মূল রচয়িতা মহান টমাস জেফারসন নিজেও দাস-মালিক ছিলেন, প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনও তাই ছিলেন। আসুন অন্ততপক্ষে আশা করা যাক - তারা (এবং আমার পূর্বপুরুষরাও) পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাসদের বহন করে আনা জাহাজগুলোর ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

প্রসঙ্গক্রমে, শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় আর আমেরিকানরাই আফ্রিকা থেকে দাস ছিনতাই করে আনেনি। যখন ইউরোপীয়রা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে দাস

সংগ্রহ করছিল, আরবরা তখন দাস সংগ্রহ করছিল পূর্ব আফ্রিকা থেকে। সুয়াহিলি, যা ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রধানতম একটি ভাষায় পরিণত হয়েছিল, সেটি বিকশিত হয়েছিল আরব দাস বানিজ্যের ভাষা হিসাবে। এর মধ্যে বহু শব্দ আছে, যার উৎস আরবী ভাষা। আফ্রিকার রাজা কিংবা গোত্র প্রধানরা নিজেরাও দাস রাখতেন, এছাড়াও তারা আফ্রিকাবাসীদের অপহরণ করে আরব এবং ইউরোপীয় দাসব্যবসায়ীদের কাছে তাদের বিক্রয় করতেন। বিস্ময়কর নয়, যেহেতু বাইবেলের নৈতিকতাগুলো এটি নিজস্ব সময়ে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানেও এই দাস প্রথাকে নিন্দা করা হয়নি। এমনকি নিউ টেস্টামেন্টে বিশেষ কিছু অনুরোধে দিয়ে পূর্ণ, যেমন:

> ‘দাসগন, তোমরা তোমাদের পার্থিব মনিবকে শ্রদ্ধা, ভয় ও হৃদয়ের আন্তরিকতাসহ মান্য করো, ঠিক যেভাবে তোমরা খ্রিস্টকে মান্য করো। তাদের মান্য করো শুধু তাদের নিকট থেকে সুবিধা আদায় করতেই নয়, যখন তাদের দৃষ্টি তোমার উপরে, বরং খ্রিস্টের দাসের মত, হৃদয় থেকে, যেভাবে তোমরা ঈশ্বরের নির্দেশ মত কাজ করো’ (এফেসিয়ানস ৬:৫)।

আরো একটি যেমন:

> ‘সবাই যারা দাসত্বের জোয়ালের অধীনে বন্দী, তারা তাদের মনিবদের পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে বিবচেনা করো, যেন ঈশ্বরের নাম এবং আমাদের শিক্ষার বদনাম কেউ করতে না পারে (১ টিমোথি, ৬)’।

দাসত্বের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া যা আজ আমরা দেখি সেটিও শুধু সেই পরিবর্তনের একটি উদাহরণ, যা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে আসন্ন অনুভূত হয়েছিল। আমেরিকার সবচেয়ে সন্মানিত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন চার্লস ডারউইনের সমসাময়িক ছিলেন, ১৮০৯ সালের একই দিনে তাদের জন্ম হয়েছিল। ডারউইন খুব তীব্রভাবে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন, আর লিংকন আসলেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে দাসপ্রথা বিলোপ ও দাসদের মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তারপরও ডারউইন কিংবা লিংকনের কাছে মনে হয়নি যে আফ্রিকাবাসীরাও সেই সব জাতির সমকক্ষ হতে পারে, যারা তাদের ভাষায় ছিল ‘সভ্য জাতি’। ডারউইনের বন্ধু টমাস হেনরি হাক্সলি এমনকি যিনি স্পষ্টভাবেই আরো বেশি অগ্রসরমনস্ক একজন উদারনীতিবাদী চিন্তাবিদ ছিলেন, তা সত্ত্বেও ১৮৭১ সালে তিনি লিখেছিলেন:

> ‘কোনো যৌক্তিক মানুষ, বাস্তব তথ্যসমূহে অবগত হয়ে, বিশ্বাস করতে পারেন না যে, গড়পড়তা কোনো ‘নিগ্রো’ (কৃষ্ণাঙ্গ) শ্বেতাঙ্গ কারো সমকক্ষ কিংবা আরো অসম্ভব এমন কিছু ভাবা যে, তারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হতে পারে। আর যদি এটি সত্য হয়, এটি শুধুমাত্র অবিশ্বাস্য, যখন তার সব প্রতিবন্ধিতা দূর হয়ে যাবে এবং সামনে দিকে বেরিয়ে থাকা নিচের চোয়ালসহ আমাদের আত্মীয়রা একটি নিরপেক্ষ মাঠ পাবে এবং যেখানে কেউই বিশেষ সমর্থন পাবে না, সে সাথে কোনো শোষকও সেখানে থাকবে না, সাফল্যের সাথে সে আরো বড় মস্তিষ্ক আর ছোটো চোয়ালের প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে এমন একটি প্রতিযোগিতায় যা পরিচালিত হবে কামড় নয় বরং চিন্তার দ্বারা। সভ্যতার প্রাধান্যপরম্পরায় সর্বোচ্চ অবস্থানটি নিশ্চিতভাবে আমাদের কৃষ্ণবর্ণের জ্ঞাতিভাইদের হাতের নাগালের বাইরেই আছে’।

এবং ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট লিংকন বলেছিলেন:

> ‘তাহলে আমি বলবো, এখন কিংবা কখনোই আমি কোনোভাবেই শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গ জাতির মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যতা আনা, এবং এখন কিংবা কখনোই আমি নিগ্রোদের ভোটার কিংবা জুরি সদস্য বানাবার পক্ষে ছিলাম না, কিংবা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে তাদের যোগ্য ঘোষণা করা এবং শ্বেতাঙ্গদের বিবাহ করার অনুমতি দেবার পক্ষেও আমি নই। এবং আমি বলবো, এছাড়াও শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণের সদস্যদের মধ্যে শারীরিক একটি পার্থক্য আছে, আমি বিশ্বাস করি যা এই দুটি বর্ণকে সামাজিক আর রাজনৈতিক সাম্যে একত্রে বসবাসের ক্ষেত্রে চিরকালের জন্যই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। আর যেহেতু তারা এই ভাবে জীবন কাটাতে পারবে না, কিন্তু যখন তারা একত্রে থাকবে, তখন অবশ্যই উৎকৃষ্ট আর অধস্তন অবস্থান থাকতে হবে, এবং আর যে-কোনো ব্যক্তির মতোই আমিও শ্বেতাঙ্গ জাতিকে উৎকৃষ্ট অবস্থানটি দেবার পক্ষে অবস্থান করছি’।

আসলেই উনবিংশ শতাব্দীতে যা কিছুই সেই ‘আসন্ন’ বা বাতাসে ভাসমান বলে মনে করা হোক না কেন, বর্তমানে খুব ভিন্ন কিছু আমরা সেখানে ভাসতে দেখি। অসতর্ক ইতিহাসবিদরাই কেবল লিংকন, ডারউইন আর হাক্সলীকে বর্ণবিদ্বেষী হিসাবে চিহ্নিত করবেন। তাদের সময়ে যতটুকু সম্ভব হয়েছিল তারা ঠিক ততটুকুই বর্ণবাদ-বিরোধী হবার প্রান্তটির নিকটবর্তী হয়েছিলেন। তারা উনবিংশ

শতাব্দীর মানুষ ছিলেন, যদি আর দুই শতাব্দী পরে তারা জন্মগ্রহন করতেন, দুজনেই এই দুটি উদ্ধৃতি পড়ে হতবাক হয়ে যেতেন।

নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন লক্ষ করার জন্যে আমাদের এমনকি এক শতাব্দী অবধি অপেক্ষা করার দরকার নেই। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা বোমারুদের বৈমানিকদের সে বিষয়টি বিবেচনা করেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যারা উভয় পক্ষের অগণিত বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে হত্যা করেছিলেন। আর শুরুতেই, এই বোমা হামলা মূলত সুনির্দিষ্ট ছিল ব্রিটেইনের কভেন্ট্রি এবং জার্মানীর এসেনে মত শিল্পকারখানা প্রধান এলাকায়, যেখানে সমরাস্ত্র তৈরি করা হচ্ছিল। সেই দিনগুলোয় বোমা হামলা তাদের নিশানা খুঁজে নেবার জন্যে খুব বেশি নির্ভুল ছিল না এবং পরিণতিতে ব্যাপক সংখ্যক বেসামরিক জনগোষ্ঠী হতাহত হয়েছিল, এবং যে ক্ষতিটি অনিবার্য ছিল। উভয় পক্ষই বেসামরিক জনগোষ্ঠীর মৃত্যু সহজে মেনে নিতে পারেনি, তারা পরস্পরের বদলা নিয়েছে, বোমার আক্রমণের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়েছে। বেসামরিক হতাহতের এই ব্যাপারটি অনিচ্ছাকৃত একটি পার্শপ্রতিক্রিয়া থেকে মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ১৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী এই দুই দিনে ৭২২ টি ব্রিটিশ আর ৫২৭ টি আমেরিকান বোমারু বিমান বিশেষ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আর আগুন বোমা ব্যবহার করে প্রাচীন এবং সুন্দর জার্মান শহর ড্রেসডেনকে সম্পূর্ণভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। ঠিক কত সংখ্যক বেসামরিক ব্যক্তি এই আক্রমণে প্রাণ দিয়েছিলেন সেই প্রকৃত সংখ্যাটি কখনোই হয়তো জানা সম্ভব হবে না, কিন্তু বাস্তবসম্মত একটি আনুমানিক ধারণা হিসাবে এটি লক্ষাধিক ছিল। এটি আগষ্ট ১৯৪৫ সালে হিরোশিমা আরা নাগাশাকি ধ্বংস করা পারমাণবিক বোমার কারণে হতাহতের সংখ্যার সাথে তুলনাযোগ্য।

যদি আরো অর্ধ শতাব্দী আমরা এগিয়ে আসি, দুঃখজনকভাবে এখনো যুদ্ধ চলমান। কিন্তু সেগুলো দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার তুলনায় তেমন কিছু নয়। দুটি উপসাগরীয় যুদ্ধে, যদিও বহু বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেগুলোকে দুর্ভাগ্যজনক ভ্রান্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। রাজনীতিবিদরা তার জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন, এবং ব্যাখ্যা করেছেন কেন এগুলো কোল্যাটেরাল বা সমপার্শ্বিক, বৈধ সামরিক নিশানায় আক্রমণের উপজাত ক্ষতি। আংশিকভাবে এর কারণ ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি এখন অনেক অগ্রসর হয়েছে। উপগ্রহ এবং অন্য কোনো নেভিগেশন বা দিক-নির্দেশনা পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র বেশ নির্ভুলভাবেই এর জন্যে নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট নিশানা বরাবর যেতে পারে, যে বিশেষ ঠিকানাটি এর সাথে বহন করা কম্পিউটারে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়।

ড্রেসডেন, লন্ডন কিংবা কভেন্ট্রি শহরের উপর নির্বিচারে বোমা মেরে ধ্বংস কর থেকে এটি খুবই ভিন্ন। কিন্তু নৈতিক যে মুল্যবোধের পরিবর্তন আমরা 'আসন্ন' অনুভব করেছিলাম সেটিও আরো অগ্রসর হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, হিটলার এবং রয়াল এয়ার ফোর্সের মার্শাল স্যার আর্থার 'বোম্বার' হ্যারিস সুস্পষ্টভাবেই বেসামরিক মানুষ হত্যা করতে চেয়েছিলেন। বোম্বার হ্যারিসে আধুনিক সমতুল্য (রাজকীয় বিমান বাহিনীতে তার সেই সময়কার অপেক্ষাকৃত কুখ্যাত ডাকনাম ছিল - 'বুচার হ্যারিস') কেউ ভুল নিশানায় আঘাত হানা কোনো মিসাইলের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আসলেই আন্তরিক প্রচেষ্টা করেন।

আপনি কী বিশ্বাস করতে পারবেন কত সম্প্রতি নারীরা প্রথম তাদের ভোটাধিকার অর্জন করতে পেয়েছিলেন ? ব্রিটেইনে নারীরা পুরুষদের মত একই ভোটাধিকার পেয়েছিলেন ১৯২৮ সালে। ১৯১৮ সাল অবধি, কোনো নারীরই ভোট দেবার অধিকার ছিল না, তারপর শুধুমাত্র তারা যাদের বয়স ত্রিশ কিংবা তার বেশি এবং কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করা সাপেক্ষে, যেমন, সম্পত্তির মালিকানা এবং/অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতা। সে সময়ে পুরুষরা ভোট দেবার অধিকার পেতেন ২১ বছর পূর্ণ হলে। ১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র নারীদের ভোটাধিকার দিয়েছিল (অবশেষে ইউনিয়নের কিছু অগ্রসর একক অঙ্গরাজ্যের উদাহরণ অনুসরণ করে)। ১৯৪৫ সালের আগে ফরাসী নারীদের ভোট দেবার অধিকার ছিল না, আর সুইস নারীদের ভোট দিতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯৭১ সাল অবধি। আর সৌদি আরব, দয়া করে জিজ্ঞাসা করা দরকার নেই! মূল বিষয়টি হচ্ছে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, কিছু ধারণা বিস্তার লাভ করছিল এমন ভাবে যে, দশক পেরিয়ে গেলে মানুষের কাছে এই পরিবর্তনগুলো গ্রহনযোগ্য হয়ে ওঠেছিল। নাটকীয়ভাবে বেশ দ্রুত। ব্রিটেইনের নারীরা ভোটাধিকার পাবার আগেই, ভদ্র, উদার পুরুষদের মুখে আপনি শুনতে পেতেন, 'মেয়েরা সুন্দর আর নম্র, সবই ঠিকই আছে, কিন্তু তারা যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু চিন্তা করতে পারে না। তাদের অবশ্যই ভোট দেবার অনুমতি দেয়া উচিত নয়'। আপনি কী কল্পনা করতে পারেন এই ধরনের কথা ইদানীং কেউ বলছেন?

আমার বন্ধু এবং মনোবিজ্ঞানী স্টিভেন পিংকার 'দ্য বেটার অ্যাঞ্জেলস অব আওয়ার নেচার' (এই শিরোনামটি আব্রাহাম লিংকনের একটি উদ্ধৃতি) নামে অসাধারণ একটি বই (উভয় অর্থেই) লিখেছেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, কীভাবে সময়ের সাথে, বহু শতাব্দী, সহস্রাব্দ ধরে, আমরা আরো বেশি ভালো, দয়ালু, কম হিংস্র এবং কম নিষ্ঠুর হয়ে উঠছি। আর এই পরিবর্তনের সাথে জিনগত বিবর্তন এবং ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। যে পরিবর্তনগুলো আমরা 'আসন্ন' বলে

অনুভব করেছিলাম, আমরা দেখেছি সেগুলো শতাব্দী থেকে শতাব্দী মোটামুটি একই দিক বরাবর অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রেখেছে।

এটি একই দিক বরাবর অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু এটি কী 'সঠিক' দিক? বেশ, আমি সেটাই মনে করি, এবং আশা করছি আপনিও তাই ভাবছেন। আমরা একবিংশ শতাব্দী মানুষ, এটাই কি একমাত্র কারণ? এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্বটি আমি আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে যখন আমরা ওল্ড টেস্টামেন্টে ঈশ্বর চরিত্রটির বিচার করেছিলাম, আমরা তাকে আমাদের শতাব্দীর মানদণ্ডে বিচার করেছিলাম। ঠিক যেভাবে একজন ভালো ইতিহাসবিদ তার বর্ণবাদী সংস্কারগুলোর জন্য আব্রাহাম লিংকনকে খারাপভাবে দেখবেন না, একইভাবে আসলেই ভয়ঙ্কর সব জঘন্য কাজ করার জন্য ইতিহাসবিদরা হয়তো ঈশ্বর সম্বন্ধে খুব খারাপ কিছু ভাবতে ইতস্তত বোধ করতে পারেন। যেমন তিনি তাদের পিতাদের মাধ্যমে আইজাক এবং সেনাপতি জেফথাহের কন্যার সাথে করেছিলেন। এছাড়া সেই সমৃদ্ধ 'দুধ আর মধু প্রবাহিত' হওয়া দেশের হতভাগ্য অধিবাসী আমালেকাইট এবং আরো গোত্রের জনগোষ্ঠীর সাথে করেছিলেন - যখন তিনি সেই ভূখণ্ডটিকে দখল করতে তার নির্বাচিত জনগোষ্ঠী ইজরায়েলাইটদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের বইগুলোয় বর্ণিত এই ঈশ্বর চরিত্রটি শুধুমাত্র সেই সময়ের নৈতিক মূল্যবোধ মেনেই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যা সেই সময়ের বাতাসে ভাসছিল। কিন্তু যদিও আমরা তার নৈতিক মূল্যবোধগুলোর জন্য হয়তো তাকে কিছুটা ছাড় দিতে পারি (অথবা, বরং ব্যবিলনের সেই ইহুদীদের নৈতিক মূল্যবোধগুলো, যারা ওল্ড টেস্টামেন্টের বইগুলো লিখেছিলেন), কিন্তু সেটি আমাদের সময়ে এই কাজগুলো ভিন্নভাবে করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে আমাদের বাধা দিচ্ছে না। এবং সেই সব মৌলবাদীদের বিরোধীতা করার অধিকার আছে আমাদের, যারা টেনে হেচড়ে আমাদেরকে আবার সেই সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

তাহলে, আসন্ন পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে নৈতিক মূল্যবোধ শতাব্দী থেকে শতাব্দী, এমনকি দশক থেকে দশকে পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু আমাদের বিবর্তনীয় অতীত ছাড়াও সেগুলো আসলেই কোথা থেকে আসছে? আর কেন সেগুলো পরিবর্তিত হতে থাকে? আংশিকভাবে পরিবর্তনগুলো আসে ক্যাফে, পানশালা, রাতের বেলায় খাবার টেবিলে চারপাশে খুব সাধারণ কিছু কথোপকথন থেকে। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে শিখি। আমাদের মুগ্ধ আর আলোড়িত করে এমন মানুষগুলোর কাহিনী আমরা শুনি এবং তাদের অনুকরণ করতে প্রতিজ্ঞা করি। আমরা উপন্যাস অথবা সংবাদপত্রে মতামতের

কলামগুলো পড়ি, পডকাস্ট অথবা ইউ টিউবে কোনো বক্তৃতা শুনি এবং আমাদের মন পরিবর্তন করি। সংসদে নানা প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক হয় এবং আইন পরিবর্তিত হয় ধাপে ধাপে। বিচারপতিরা যেভাবে আইন ব্যাখ্যা করেন সেটি দশক অতিক্রান্ত হলে পরিবর্তিত হয়।

১৯৬৭ সালের আগে, একান্তে সমকামী আচরণের কারণে ব্রিটিশ নাগরিকদের কারাগারে যেতে হতো। দীর্ঘস্থায়ী একটি সংস্কারের বিরুদ্ধে বহু দশকে সংগ্রামের পরে সমকামিতা এখন স্বাভাবিক একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে, এবং সমকামীরা অন্য সবার মতোই একই শ্রদ্ধা দাবি করতে পারেন। সংসদ সদস্যদের ঐক্যমতের ভোট (নারীদের ভোটাধিকার আদায়ে 'সাফ্রেজ' আন্দোলনকারীদের দীর্ঘ কঠোর সংগ্রামের পর) যা নারীদের ভোটাধিকার দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীজুড়েই একের পর এক দেশ নারীদের এই অধিকার নিশ্চিত করেছিল। যেমন আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে এইসব সংসদে সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের পাঠানো চিঠিগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সময়ের সাথে, দশক থেকে দশকে বিচারক এবং জুরিদের নেয়া আদালতের সিদ্ধান্তগুলো একইভাবে মতামত পরিবর্তনের পরিবেশটিকে আরো অগ্রসর কোনো স্তরে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। গুরুত্বপূর্ণ বই, গবেষণা গ্রন্থ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার কথা ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না। গবেষকরা যারা নৈতিক মূল্যবোধ, ভালো আর মন্দের সেই জ্ঞানটি নিয়ে অধ্যয়ন করেন, তারা নৈতিক দার্শনিক এবং সময়ের 'আসন্ন' পরিবর্তনগুলো যারা প্রভাবিত করেন। এই অধ্যায়ে নৈতিক দর্শন নিয়ে আমি আরো খানিকটা আলোচনা করতে চাই।

নৈতিক দর্শনে বেশ কিছু চিন্তার ধারা আছে। আমি সেগুলোর মধ্য থেকে মাত্র দুটি নিয়ে আলাপ করবো: 'অ্যাবসল্যুইস্ট' এবং 'কনসিকোয়েন্সিয়ালিস্ট' (অর্থাৎ নৈতিক পরমবাদ আর নৈতিক পরিণতিবাদ)। নৈতিক বিচার কীভাবে করতে হয় সেই বিষয়ে এই দুটি চিন্তাধারার দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। নৈতিক পরমাবাদীরা ভাবেন - কিছু জিনিস সঠিক আর কিছু জিনিস ভুল, এবং এখানে তর্কের কোনো অবকাশ নেই। এই ন্যায় আর অন্যায়ের বিষয়টি বাস্তব ও বিশুদ্ধ একটি সত্য, স্বতঃসিদ্ধ যেমন জ্যামিতির সেই প্রস্তাবনাটি: সমান্তরাল রেখাগুলো কখনো পরস্পরের সাথে মিলিত হয় না। একজন নৈতিক পরমবাদী হয়তো বলতে পারেন, 'আরেকজন মানুষকে হত্যা করা সুস্পষ্টভাবে অন্যায়, এটি সবসময় অন্যায়, সবসময় এটি অন্যায়ই ছিল, এবং সবসময়ই এটি অন্যায় হবে'। এই ধরনের পরমবাদীরা হয়তো বলতে

পারেন গর্ভপাত হচ্ছে হত্যা, কারণ ভ্রূণ হচ্ছে মানুষ। কিছু পরমবাদী এমনকি এই যুক্তিটি নিয়ে যাবেন একটি নিষিক্ত ডিম্বাণু অবধি, একটি একক কোষ।

নৈতিক পরিণতিবাদীরা ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ আর উচিত-অনুচিত বিষয়গুলো ভিন্নভাবে বিচার করেন। আপনি এই দৃষ্টিভঙ্গির নাম থেকে অনুমান করতে পারছেন যে তারা কোনো কাজের পরিণতিগুলোর উপর মূলত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যেমন, গর্ভপাতের কারণে সৃষ্ট পরিণতিগুলোর জন্য কার মূলত ভোগান্তি সহ্য করতে হয়? অথবা গর্ভপাত করাতে না দেবার কারণে সৃষ্ট পরিণতিগুলোর জন্য কার ভোগান্তি হয়? আসুন একজন পরিণতিবাদী (কনি) আর একজন পরমবাদীর (অ্যাবি) মধ্যকার একটি কথোপকথন আমরা কল্পনা করি। কীভাবে নৈতিক দার্শনিকরা চিন্তা ও যুক্তি উপস্থাপন করেন, এটি আমাদের সেই বিষয়ে একটি ধারণা দেবে। প্লেটো থেকে হিউম হয়ে আজ অবধি দার্শনিকরা কাল্পনিক বিতার্কিকদের মধ্যে এই ধরনের কল্পিত সংলাপ সৃষ্টি করতে বেশ পছন্দ করেন এবং আমি তাদের উদাহরণই অনুসরণ করছি। যখন আলোচনা আরো অগ্রসর হবে, লক্ষ করবেন দার্শনিকরা কত দ্রুত বাস্তবতা থেকে 'চিন্তা-পরীক্ষা'র জগতে প্রবেশ করেন।

> অ্যাবি: 'তোমরা কোনো মানুষকে হত্যা করবে না। একটি নিষিক্ত ডিম্বাণু হচ্ছে একটি মানুষ। সেই কারণে, গর্ভপাত, এমনকি যদিও সেটি একটি নিষিক্ত ডিম্বাণু কোষও হয়ে থাকে, সেটি হবে হত্যা। আমি আমার এক নারী বন্ধুকে বলতে শুনেছি, 'একজন নারী তার শরীর নিয়ে কী করতে চায় সেই বিষয়ে তার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং চূড়ান্ত অধিকার আছে। আর একটি ভ্রূণ হত্যা করাও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যা তার শরীরের মধ্যে অবস্থান করে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা ও অধিকার শুধু তারই আছে, এটি আর কারো ভাবনার বিষয় নয়'। কিন্তু ভ্রূণ হচ্ছে আরেকটি মানুষ। সেটিরও নিজস্ব কিছু অধিকার আছে, এমনকি যদিও সেটি সেই নারীর শরীরের মধ্যে অবস্থান করছে।
>
> কনি: তোমার মতোই তোমার নারী বন্ধুর যুক্তিটি হচ্ছে একটি নৈতিক পরমবাদী যুক্তি। তিনি তার শরীরের উপর অর্থাৎ এর মধ্যে যা কিছু আছে তার উপর একটি চূড়ান্ত অধিকার দাবী করেন। এটি হচ্ছে পরমবাদ (অ্যাবসোল্যুটিজম), যদিও তোমার পরমবাদ থেকে সেটি খানিকটা ভিন্ন। আর তুমি এবং তোমার মেয়ে বন্ধুটি সম্পূর্ণ বিপরীত উপসংহারে এসে পৌঁছেছো। কিন্তু আমি পরিণতিবাদী। আমি জিজ্ঞাসা করবো, কে কষ্টটি সহ্য করছে - ভোগান্তি কার হচ্ছে। তুমি চাইলে

নিষিক্ত একটি ডিম্বাণুকে ‘মানুষ’ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারো। কিন্তু এর কোনো স্নায়ুতন্ত্র নেই, সুতরাং এটি কোনো কষ্ট অনুভব করতে পারে না। এটি জানে না যে তাকে গর্ভপাত করানো হচ্ছে, পরিণতিতে এটি কোনো ভয় বা অনুশোচনাও অনুভব করে না। একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর স্নায়ুতন্ত্র আছে। তাকে অনেক ভোগান্তি সহ্য করতে হতে পারে যদি তাকে সন্তান প্রসব করতে বাধ্য করা হয়, যে সন্তানকে সে চাইছে না, এবং সেই সন্তানকে প্রতিপালন করার মত যার সামর্থ্য নেই। তুমি এবং তোমার নারী বন্ধুটি দুজনেই পরমবাদী। সে হচ্ছে ‘নারী অধিকারের পরমবাদী’ আর তুমি (আমি সন্দেহ করছি) একজন ‘ধর্মীয় পরমবাদী’। আমি তার উপসংহারের সাথে একমত, তবে ভিন্ন একটি কারণে। তার কারণটি হচ্ছে পরমবাদী: তার নিজের শরীরের সাথে কী ঘটবে না ঘটবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একজন নারীর চূড়ান্ত অধিকার। আমার কারণটি হচ্ছে পরিণামবাদী। একটি ভ্রূণ ‘কষ্ট’ সহ্য করতে পারে না, কিন্তু একজন নারী সেটি পারে - নারীকে এর পরিণতির ভোগান্তি সহ্য করতে হয়।

অ্যাবি: বেশ, আমিও তোমার সাথে একমত যে, একটি এককোষী ভ্রূণের কোনো ‘কষ্ট’ সহ্য করতে পারার ক্ষমতা নেই - তার কোনো ভোগান্তি নেই, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক একটি মানুষ হয়ে ওঠার জন্য সব ‘সম্ভাবনা’ এটি কিন্তু ধারণ করে। আর গর্ভপাত এটিকে তার সে সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। তুমি কী সেটিকে ‘পরিণতি’ হিসাবে চিহ্নিত করবে না? হয়তো আমিও এক ধরনের পরিণমাবাদী? আর যা’ই হোক না কেন অন্তত আমার সেই নারী বন্ধুর তুলনায় অবশ্যই বেশি!

কনি: হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি যে ভবিষ্যত জীবন থেকে কোনো একটি ভ্রূণকে বঞ্চিত করা হচ্ছে একটি ‘পরিণতি’। কিন্তু যেহেতু কোষটির সেই বিষয়ে কিছু জানা নেই এবং এটি কোনো ধরনের কষ্ট বা অনুশোচনা অনুভব করে না, তাহলে এটি নিয়ে চিন্তা কেন? এছাড়া, প্রতিবারই যখনই তুমি যৌন মিলন করতে অস্বীকৃতি জানাও তুমি সম্ভাব্য একটি ভবিষ্যত মানুষকে তার জীবন লাভ করা থেকে বঞ্চিত করছো। তুমি কী সেই বিষয়টি নিয়ে কখনো ভেবেছো?

অ্যাবি: প্রথম দৃষ্টিতে এই যুক্তিটি কিন্তু খুব একটা মন্দ নয়। কিন্তু তারপরও, শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হবার আগে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। আর যৌন মিলন এড়িয়ে যাবার মাধ্যমে, তুমি কোনো একক সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার অস্তিত্ব থেকে বঞ্চিত করছো না, কারণ বহু মিলিয়ন শুক্রাণু আর বহু মিলিয়ন সম্ভাব্য ব্যক্তি সেখানে আছেন। একবার যখন শুক্রাণু ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করে, সুনির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির জীবন সেখানে শুরু হয়। অন্য যে-কোনো ব্যক্তি নয়। সেই মুহূর্তের আগে বহু মিলিয়ন জীবন সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা সেখানে ছিল, সুতরাং তুমি বলতে পারবে না, তুমি কোনো একজন মানুষকে তার অস্তিত্ব লাভ করা থেকে বঞ্চিত করছো।

কনি: কিন্তু যদি তুমি কোনো একটি নিষিক্ত ডিম্বাণুকে 'একজন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি' হিসাবে ভেবে কথা বলো, তাহলে তুমি একটি 'অবিভাজ্য সত্তা' ইঙ্গিত করছো। তুমি কী হুবহু যমজদের চেনো? তারাও কিন্তু একটি নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে তাদের জীবন শুরু করেছিল। তবে পরে তারা বিচ্ছিন্ন হয় এবং দুই জন ব্যক্তি হিসাবে তাদের জন্ম হয়েছিল। পরের বার যখন তোমার কোনো হুবহু যমজদের সাথে দেখা হবে, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখো, তাদের মধ্যে কোন জন 'ব্যক্তি' আর কোন জন 'জম্বি'।

অ্যাবি: হুম, ঠিক আছে, তুমি কী বোঝাতে চাইছো আমি সেটি বুঝতে পারছি। এটি আশঙ্কাজনকভাবেই ভালো একটি যুক্তি। এই মুহূর্তের আলোচনায় হয়তো এই বিষয়টি পরিবর্তন করাই উত্তম হবে। যদি তুমি শুধুমাত্র তোমার কাজের পরিণতি হিসাবে কে কষ্ট ভোগ করছে - কার ভোগান্তি হচ্ছে - সেটি বিবেচনা করো, তাহলে মানুষের মাংস বা নরমাংস খাবারে বাধাটা কোথায়? আমি নিশ্চিত যে, খাওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি কাউকে হত্যা করবে না, তাহলে যে ইতোমধ্যে মারা গেছে তার মাংস খাওয়ার ব্যাপারে কী সমস্যা আছে, সে তো আর কোনো কষ্ট ভোগ করছে না?

কনি: তার বন্ধু এবং স্বজনরা কিন্তু সেটি ঘৃণা করবেন। সেটি একটি পরিণতি ! খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিণতি। মানুষের অনুভূতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধুমাত্র যাদের স্নায়ুতন্ত্র আছে তাদেরই অনুভূতি - অনুভব করার ক্ষমতা - আছে। মরিয়া হয়েই আরেকটি বাচ্চা কামনা করছেন না এমন

কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারীর অনুভূতি আছে। তার ভিতরে থাকা ভ্রূণের সেই অনুভূতি নেই।

অ্যাবি: আমার 'নরমাংস' খাওয়া উদাহরণটিতে যদি থাকি, মনে করো সে মৃত ব্যক্তির কোনো বন্ধু কিংবা স্বজন নেই। তুমি যদি তাকে খাও তার পরিণতি হিসাবে কেউ কোনো 'কষ্ট' অনুভব করবে না।

কনি: বেশ, এখন আমরা সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছি যাকে আমরা বলি, 'স্লিপারি স্লোপ' বা পিচ্ছিল ঢালের যুক্তি। বেশ খাড়া উঁচু কোনো পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে তুমি হয়তো নিরাপদ অনুভব করতে পারো, কিন্তু যদি সেই পাহাড়ের ঢালটি পিচ্ছিল হয়ে থাকে এবং তুমি যদি সেখানে একটি পা রাখো, কী ঘটছে বোঝার আগে, তুমি পিছলে নীচে পড়ে যাবে, যেখানে তুমি অবশ্যই থাকতে চাইবে না। তুমি ঠিক বলেছো, কেউই কষ্ট পাবেনা যদি আমি এমন কোনো মৃত ব্যক্তিকে খাই যার কথা ভাবার মত কোনো বন্ধু বা স্বজন নেই। এটি সেই পিচ্ছিল ঢালের শীর্ষ বিন্দু। কিন্তু নরমাংস খাবার ব্যাপারে আমাদের সমাজে গভীর আর সুপ্রতিষ্ঠিত নিষেধাজ্ঞা আছে। এই ধারণাটি আমাদের মধ্যে তীব্র একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রস্তাবনাটি ভাবলেই আমাদের সেই পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ার একটি ঝুঁকি থাকে। আর কে বলতে পারে, কোথায় সেটি শেষ হবে? নরমাংস খাবারের বিরুদ্ধে প্রতিষিদ্ধতা উপযোগী, খুব খাড়া বিপজ্জনক ঢালসহ পাহাড়ের উপরে থাকা নিরাপত্তা বেষ্টনীর মত সেটি কাজ করে।

অ্যাবি: বেশ, গর্ভপাতে ক্ষেত্রেও আমি এই পিচ্ছিল ঢালের যুক্তিটি ব্যবহার করতে পারি। আমি একমত যে, শুরুর পর্যায়ের একটি ভ্রূণ ভয় বা কষ্ট কিংবা দুঃখ অনুভব করতে পারে না যখন এটিকে গর্ভপাতের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। কিন্তু সেই পিচ্ছিল ঢাল কিন্তু জন্মের মুহূর্ত এবং এমনকি তার পর অবধি বিস্তৃত হয়ে আছে। যদি তুমি গর্ভপাত করার অনুমতি দাও, তাহলে পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে জন্মের মুহূর্ত অতিক্রম করে কী এটির গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে না? আমরা কী এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারি না - যখন কিনা সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে এক বছর বয়সী শিশুদেরও আমরা হত্যা করতে শুরু করবো? তারপর দুই বছরের শিশুদের। এভাবে ক্রমশ আরো ...?

কনি: হ্যাঁ, অবশ্যই আমি বলবো, এটি শুনলে আপাতদৃষ্টিতে বেশ যুক্তিসঙ্গত একটি প্রস্তাবনা মনে হতে পারে। কিন্তু জন্ম মুহূর্তটি খুব ভালো সুনির্দিষ্ট একটি সীমানা - একটি খুব ভালো 'নিরাপত্তা বেষ্টনী, যা শ্রদ্ধা করার জন্য আমরা বিশেষভাবে অভ্যস্ত। যদিও সবসময় এমন ছিল না। প্রাচীন গ্রিসে একটি শিশুর জন্ম হওয়া অবধি অপেক্ষা করা হতো, তারপর তাকে এক নজর দেখে এই শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখা হবে কিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। যদি তারা না রাখার সিদ্ধান্ত নিতেন, মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে তারা শিশুটিকে পাহাড়ের নীচে ঠাণ্ডায় রেখে আসতেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এমন কিছু এখন আর করি না। প্রসঙ্গক্রমে, তোমাকে বলা দরকার যে, গর্ভাবস্থার শেষে দিকে গর্ভপাত খুবই দুর্লভ ঘটনা, শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজনে সেটি করা হয়, সাধারণত যখন মায়ের জীবন বাঁচানো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। অধিকাংশ গর্ভপাতই ঘটে গর্ভাবস্থার বেশ আগের পর্যায়ে। আর তুমি কী সে বিষয়টি কখনো অনুধাবন করেছো - বহু ভ্রূণই কিন্তু স্বতস্ফূর্তভাবে গর্ভপাতের মাধ্যমে বের হয়ে যায়, এমনকি সেই নারী নিজেই জানেন না যে তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন?

যদিও আমি এই মাত্র 'স্লিপারি স্লোপ' যুক্তি ব্যবহার করেছি, কিন্তু আসলে আমি অবশ্যই স্বীকার করছি যে, সব বেষ্টনী আর সীমারেখা সরিয়ে ফেলাই আমি শ্রেয়তর মনে করবো। তোমরা পরমবাদীরা মানুষ আর মানুষ-নয় এমন জীবের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কঠোর সীমানা স্থাপন করতে চাও। নিষিক্ত হবার সেই মুহূর্তে একটি ভ্রূণ কী মানুষে পরিণত হয়, যখন শুক্রাণু প্রথমবারের মত ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়? অথবা জন্মের মুহূর্তে সেটি ঘটে? অথবা, এর মধ্যবর্তী কোনো একটি সময়ে, সেই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কখন সেটি ঘটছে? আমি ভিন্ন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা শ্রেয়তর মনে করছি। 'কখন এটি মানুষে পরিণত হচ্ছে'? নয়, বরং 'কখন এটি ব্যাথা বা কোনো ধরনের আবেগ অনুভব করার সক্ষমতা অর্জন করে'? আর এমন কোনো আকস্মিক একটি মাত্র মুহূর্ত নেই যখন কিনা এসব কিছু ঘটে। এটি ধীর একটি প্রক্রিয়া।

বিবর্তনীয় সময়ের ক্ষেত্রে এটি একইভাবে সত্য। আমরা খাদ্য হিসাবে মানুষ হত্যা করি না, তবে আমরা শূকর ও অন্য প্রাণীদের হত্যা করি তাদের মাংস খেতে। যদিও আমরা শূকরদের বিবর্তনীয় আত্মীয়, যার অর্থ হচ্ছে, যদি আমরা আমাদের আর শূকরদের পূর্বসূরিদের অতীত

অভিমুখে অনুসরণ করি, কোনো একটি পর্যায়ে আমরা আমাদের দুটি প্রজাতির সাধারণ পূর্বসূরির দেখা পাবো। আমাদের পারিবারিক বৃক্ষে অতীত বরাবর ভাবুন, শূকরদের সাথে ভাগ করে নেয়া আমাদের পূর্বসূরির কাছে যাবার পথে, আমরা নরবানর, বানর সদৃশ প্রাণী ইত্যাদি নানা প্রাণী অতিক্রম করবো। এখন, কল্পনা করুন ঐসব নরবানর প্রজাতিগুলোর কথা যারা এখনো বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ঠিক কোন মুহূর্ত থেকে আপনি বলবেন, ব্যাস, এ পর্যন্ত, এখন আগের কোনো প্রাণীকে আর আমরা মানুষ বলবো না? তুমি পরমবাদী, যে কিনা চাইছে মানুষ আর প্রাণীদের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় বিভেদরেখা আঁকতে। কিন্তু আমি একজন পরিণতিবাদী যে কিনা যদি সম্ভব হয় তাহলে কোনো ধরনেরই সীমারেখা চিহ্নিত করতে পছন্দ করে না। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন 'এই প্রাণীটি কি মানুষ?' হবে না, বরং সেটি হবে 'এ প্রাণীটি কী কষ্ট অনুভব করতে পারে'? প্রসঙ্গক্রমে, আমার অনুমান যে কিছু প্রাণী অন্যদের তুলনায় বেশি পরিমানে কষ্ট অনুভব করতে সক্ষম, যার মধ্যে শূকর অন্তর্ভুক্ত।

অ্যাবি: তোমার নৈতিক প্রস্তাবনাগুলোকে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু এমনকি তোমাকেও এক ধরনের পরমবাদী বিশ্বাস নিয়ে শুরু করতে হবে। তোমার ক্ষেত্রে তুমি এটি শুরু করতে পারো শুধু এমন কিছু বলে, 'কষ্ট ভোগ করানোর কোনো কারণ হওয়া অন্যায়'। তুমি এর জন্যে কোনো যৌক্তিকতা কিন্তু দেখাওনি।

কনি: হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি সেটি। কিন্তু আমি এখনো মনে করি আমার পরমবাদী বিশ্বাস - 'কাউকে কষ্ট ভোগ করানো অন্যায়' - তোমার পরমবাদী বিশ্বাসটির - 'আমার পবিত্র ধর্মগ্রন্থে এভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে' - চেয়ে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ। আমি মনে করি যদি কেউ তোমাকে নির্যাতন করতো তুমি বেশ দ্রুত একমত হতে।

আপনি নিজেই কনি আর অ্যাবির এই যুক্তিতর্কটিকে অব্যাহত রাখতে পারেন। আমি আশা করছি এটি আমি সেই দূরত্ব অবধি নিয়ে গেছি, যা আপনাকে দেখাচ্ছে কীভাবে নৈতিক দার্শনিকরা বিতর্ক করে থাকেন। আপনি সম্ভবত অনুমান করতে পেরেছেন, নৈতিক পরমবাদীরা প্রায়শই ধার্মিক হয়ে থাকেন, যদিও এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। টেন কম্যান্ডমেন্টস স্পষ্টভাবেই

পরমবাদী। একগুচ্ছ অলঙ্ঘনীয় নিয়ম মেনে জীবন কাটানোর ধারণাটিও সাধারণত তাই।

তবে ধর্মীয় নন এমন দার্শনিকদের পক্ষেও কিন্তু নির্দেশ-নির্ভর নৈতিকতা প্রবর্তন করা সম্ভব। 'ডিঅন্টোলজিস্ট' নামে পরিচিত নৈতিক দার্শনিকরা বিশ্বাস করেন শুধুমাত্র পবিত্র গ্রন্থে বার্তা অনুসন্ধান করা ছাড়াও আপনি কিছু আইন বা নিয়ম যুক্তিযুক্ত করতে পারেন ভিন্ন কোনো নৈতিকতার ভিত্তি ব্যবহার করে। যেমন, বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট একটি সূত্র প্রস্তাব করেছিলেন, যাকে বলে 'ক্যাটেগরিকাল ইম্পেরাটিভ': 'শুধুমাত্র সেই নীতি অনুযায়ী আচরণ করুন, যেন আপনি একই সাথে সেই ইচ্ছা পোষণ করতে পারেন, সে নীতিটির সর্বজনীন একটি মূলনীতি হওয়া উচিত'। অর্থাৎ এমন ভাবে আচরণ করুন, যেন আপনার আচরণটি সবার জন্য, সর্বত্র, সব পরিস্থিতিতে সাধারণীকরণ করা যায়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হচ্ছে 'সর্বজনীন'। যেমন ধরুন চুরি করতে উৎসাহিত করা একটি আইন এই নৈতিক ছাকুনী দ্বারা নাকচ হয়ে যায়, আর এর কারণ হচ্ছে যদি এটাই সর্বজনীন মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হয়, অর্থাৎ যদি সবাই চুরি করেন তাহলে কেউ লাভবান হবেন না: চোররা শুধু সেই সমাজেই সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারবেন যেখানে তাদের সৎ শিকাররা প্রাধান্য বিস্তার করে থাকেন। যদি সবাই সব সময় মিথ্যা বলেন, মিথ্যা বলা এর অর্থ হারাবে, কারণ এর সাথে তুলনা করে দেখার মত কোনো নির্ভরযোগ্য সত্য থাকবে না । একটি আধুনিক 'ডিঅন্টোলজিকাল' তত্ত্ব প্রস্তাব করছে যে, অজ্ঞতার একটি পর্দার (ভেইল অব ইগনোর‍্যান্স) পেছনে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধগুলো পরিকল্পনা করা উচিত। কল্পনা করুন আপনার জানা নেই আপনি দরিদ্র নাকি ধনী একজন ব্যক্তি, আপনি প্রতিভাবান নাকি প্রতিভাহীন সাধারণ একজন মানুষ, সুন্দর নাকি কুৎসিত। ঐ বাস্তব সত্যগুলো লুকিয়ে থাকে একটি কাল্পনিক অজ্ঞতার চাদরের পেছনে। এবার মূল্যবোধের একটি পদ্ধতি পরিকল্পনা করুন, যে কাঠামোর অধীনে আপনি বসবাস করতে চান, যখন আপনার জানা নেই আপনি সেই পরিকল্পিত সমাজের উপরের স্তরে নাকি নীচের স্তরে থাকবেন। 'ডিঅন্টোলজি' বেশ কৌতূহলদ্দীপক, ধর্ম নিয়ে লেখা এই বইয়ে বিষয়টি আমি আর বেশি কিছু বলবো না।

গর্ভকালীন অবস্থায় কখন একজন 'ব্যক্তি'র সূচনা হয় সেই সংক্রান্ত যুক্তটি খুব বেশি মাত্রায় ধর্মীয় একটি যুক্তি। বহু ধর্মীয় ঐতিহ্য মনে করে মাতৃগর্ভে খুব সুনির্দিষ্ট একটি মুহূর্তে অমর আত্মা কোনো শরীরে প্রবেশ করে। রোমান

ক্যাথলিকরা মনে করেন ডিম্বাণু শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হবার সময় এটি ঘটে। ‘ডোনাম ভাইটি’ নামে ক্যাথলিকদের একটি ধর্মীয় মতবাদ এ বিষয়টি নিয়ে খুব সুস্পষ্ট:

> ‘যে মুহূর্তে ডিম্বাণুটি নিষিক্ত হয়েছে, একটি নতুন জীবনের সূচনা হয়, সেই জীবনটি না তার মায়ের, না তার পিতার। এটি একজন নতুন মানব জীবন যার নিজস্ব বৃদ্ধি আছে। এটি কখনোই মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতো না, যদি না ইতোমধ্যেই এটি মানুষ না হতো... ঠিক নিষিক্ত হবার মুহূর্ত থেকে শুরু হয় একটি মানব জীবনের অভিযাত্রা’।

স্পষ্টত মনে হতে পারে যিনি এটি লিখেছেন তিনি কখনই ‘হুবহু’ যজমদের যুক্তিটির কথা ভাবেননি, যা পরিণামবাদী কনি উপরের বাদানুবাদের সময় ব্যবহার করেছিলেন।

আপনি সম্ভবত অনুমান করতে পেরেছেন, অ্যাবির চেয়ে কনির প্রতি আমার সহানুভূতি বেশি। তবে আমি অবশ্যই স্বীকার করবো যে, পরিণামবাদী চিন্তার পরীক্ষাগুলো মাঝে মাঝে খুব অস্বস্তিকর উপসংহারের দিকে আমাদের পরিচালিত করতে পারে। ধরুন একজন কয়লা খনি-শ্রমিক পাথর ধ্বসে পড়ার কারণে মাটির নীচে আটকে পড়েছে। আমরা তাকে উদ্ধার করতে পারি, কিন্তু সেটি বেশ ব্যয়সাধ্য একটি ব্যাপার। আমরা সেই টাকা নিয়ে অন্য আর কী করতে পারি? আমরা সেই টাকা দিয়ে আরো বহু জীবন বাঁচাতে পারি এবং পৃথিবীব্যাপী ক্ষুধার্ত শিশুদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করে অনেক দুর্দশা লাঘব করতে পারি। একজন সত্যিকারের পরিণামবাদীর কী উচিত হবে না ক্রন্দনরত স্ত্রী আর শিশুকে উপেক্ষা করে সেই অসহায় খনি শ্রমিককে তার নিয়তির কাছে পরিত্যাগ করা? হয়তো, কিন্তু আমি সেটি করবো না। আমি তাকে মাটির নীচে পরিত্যক্ত করার কথা ভাবতে পারি না। আপনি কী পারবেন? কিন্তু বিশুদ্ধভাবে কোনো পরিণামবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে তাকে মুক্ত করার সিদ্ধান্তটিকে সমর্থনীয় করা খুব কঠিন। অসম্ভব নয় তবে খুব কঠিন।

আসুন এই অধ্যায়ের মূল বিষয়ে ফিরে আসি। ভালো হবার জন্যে আমাদের কী কোনো ঈশ্বরের দরকার আছে? আমি নৈতিক দর্শন নিয়ে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করেছি, কিন্তু নৈতিক দর্শন হচ্ছে শুধুমাত্র একটি পথ যার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধগুলো পরিবর্তিত হয়। সাংবাদিকতার পাশাপাশি, ডিনার-টেবিলের

বাদানুবাদ, সংসদ কক্ষ, ছাত্র সমিতির সভাকক্ষ, আদালতের দেয়া রায় ইত্যাদিসহ নৈতিক দর্শন 'আসন্ন পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত' বিষয়গুলো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবদান রাখে, যা একবিংশ শতকের নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে, যেমন ধরুন, অষ্টাদশ শতকে নৈতিক মূল্যবোধগুলো থেকে ভিন্ন করে, যখন দাসত্ব প্রথাকে অন্যায় ভাবার কোনো অবকাশ ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার, আর আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তনের এই প্রবণতাটিকে রুদ্ধ করার সুস্পষ্ট কোনো কারণও নেই। দ্বাবিংশ শতাব্দীতে নৈতিক মূল্যবোধগুলো তাহলে কেমন হতে পারে?

আমাদের আধুনিক নৈতিকতা, সেটি ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ, যা-ই হোক না কেন, সেটি বাইবেল কিংবা কুর'আনের নৈতিক মূল্যবোধগুলো থেকে খুবই ভিন্ন। আমাদের সৌভাগ্য সেটি। এবং আকাশের সেই মহান নজরদারি করার গোপন ক্যামেরা নিশ্চয়ই 'ভালো' আচরণ করার প্রশংসাযোগ্য কোনো কারণ হতে পারে। সুতরাং হয়তো আমাদের প্রত্যেকেরই 'ভালো হবার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন' ধারণাটি প্রত্যাখান করা উচিত।

এর অর্থ কী তাহলে আমাদের সবারই ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ত্যাগ করা উচিত? না, শুধুমাত্র সেই একটি কারণে নয়। তার অস্তিত্ব হয়তো তারপরও থাকবে, এমনকি যখন ভালো হবার জন্য তাকে আমাদের আর প্রয়োজন হবে না। একজন ঈশ্বর (দেব-দেবী) আমাদের নিজস্ব নৈতিকতা মূল্যবোধের মানদণ্ডে খারাপ হতে পারেন, অধ্যায় চারে বর্ণিত সেই ঈশ্বর চরিত্রটির মত, কিন্তু তারপরও এর অর্থ এমন নয় যে, তার আর কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা সেটি বিশ্বাস করার একমাত্র কারণ হচ্ছে প্রমাণ। কোনো ধরনের দেব-দেবী অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে আসলেই কী কোনো প্রমাণ আছে, কোথাও কোনো ভালো প্রমাণ ?

আমি অনুমান করছি, প্রথম অধ্যায় উল্লেখিত বহু দেব-দেবীদের প্রায় সবগুলোকেই আপনি অবিশ্বাস করেন, কিংবা আরো শত দেব-দেবী যাদের নাম আমি উল্লেখ করিনি তাদের কারো অস্তিত্বেই আপনি বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় হয়তো আপনাকে বিশ্বাস করাতে পেরেছে বাইবেল এবং কুর'আনের মত পবিত্র বইগুলো ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্য ভালো কোনো কারণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করে না। চুতর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায় তিনটি ভালো মানুষ হবার জন্য ধর্ম আমাদের জন্য আবশ্যিক এমন

একটি বিশ্বাস থেকে আপনাকে হয়তো দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তারপরও হয়তো আপনি উচ্চতর কোনো শক্তি, এক ধরনের সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্বে আপনার সেই বিশ্বাসটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেন, যে বিশ্বাসটি দাবি করে যে, এমন কোনো সত্তা এই পৃথিবী, মহাবিশ্ব এবং আমরাসহ সকল জীবকে সৃষ্টি করেছে। আমার বয়স পনেরো অবধি আমি নিজেও এই ধরনের একটি বিশ্বাসকে ধারণ করে ছিলাম, কারণ জীবদের সৌন্দর্য্য আর জটিলতা আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। বিশেষে করে সে বাস্তবতাটি - জীবন্ত সব কিছুই 'দেখলে' যেন মনে হয় তাদের অবশ্যই কেউ 'ডিজাইন' বা পরিকল্পনা করে সৃষ্টি করেছেন। আমি অবশেষে যে-কোনো ধরনের ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকার ধারণাটি পরিত্যাগ করেছিলাম, যখন আমি বিবর্তন এবং জীবদের দেখলে আপাতদৃষ্টিতে তাদের কেন পরিকল্পনা বা ডিজাইন করে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মনে হয়, তার সত্যিকারের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জেনেছিলাম। চার্লস ডারউইনের সেই ব্যাখ্যাটি যে জীবদের এটি ব্যাখ্যা করেছে সেগুলোর মতোই সুন্দর আর সূক্ষ্ম। কিন্তু সেটি বিকশিত হতে সময়ের প্রয়োজন। এই বইয়ে দ্বিতীয়াংশে মূলত আমি বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করবো। কিন্তু এত বড় একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য এমনকি সেটিও যথেষ্ট পরিমানে দীর্ঘ হবে না। আমি আশা করছি এটি হয়তো বিবর্তন নিয়ে লেখা অন্য বইগুলো পড়তে আপনাকে আগ্রহী করে তুলবে।

দ্বিতীয় পর্ব
বিবর্তন এবং তারপর

৭ নিশ্চয়ই একজন ডিজাইনার আছেন?

আফ্রিকার সাভানায় একটি গ্যাজেলকে কল্পনা করুন, খুব দ্রুত গতিতে তাড়া করা একটি চিতার হাত থেকে জীবন বাঁচাতে যে মরিয়া হয়ে ছুটছে আতঙ্কিত গোঙ্গানীসহ দ্রুত শ্বাস ফেলে, যার যে-কোনোটি হয়তো তার শেষ নিঃশ্বাস হতে পারে। হয়তো আমার মতোই, আপনিও প্রাণ বাঁচাতে ছুটে চলা এ গ্যাজেলটির সাথে সহমর্মিতা অনুভব করছেন, কিন্তু চিতাটিরও ক্ষুধার্ত সন্তান আছে। যদি সে তার শিকার ধরতে না পারে, তাহলে সে ও তার সন্তানরা অভুক্ত থাকবে। হয়তো গ্যাজেলের খুব দ্রুত মৃত্যু অপেক্ষা চেয়ে যে মৃত্যুটি আরো বেশি যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে।

আপনি যদি একটি গ্যাজেল আর চিতার এই ধরনের দৌড়ের ভিডিও দেখে থাকেন - হয়তো ডেভিড অ্যাটেনবুরোর কোনো প্রামাণ্যচিত্র - আপনি হয়তো লক্ষ করেছেন যে, কত সুন্দর আর চমৎকারভাবে এই দুটি প্রাণীকে 'ডিজাইন' বা পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। এই দুটি মাংসল, টানটান শরীরে দ্রুতগ্রামী শব্দটি যেন সর্বত্র লেখা আছে। চিতার সর্বোচ্চ ঘন্টায় প্রায় ১০০ কিমি বেগে দৌড়াতে পারে, অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় ৬০ মাইল। কিছু পর্যবেক্ষণ এমনকি এই সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ৭০ মাইল স্পর্শ করতে দেখেছে, আসলেই অসাধারণ একটি দক্ষতা বিশেষ করে যখন সেখানে কোনো 'চাকা'র অস্তিত্ব নেই, শুধুমাত্র পায়ের উপরেই ভরসা করতে হয়। আর চিতারা মাত্র তিন সেকেন্ডে ০ থেকে ঘন্টায় ৬০ মাইল গতি অর্জন করতে পারে, একটি টেসলা (এর বিখ্যাত 'ইনসেন' মোডে) অথবা একটি ফেরারি যা করতে পারে এটি তার প্রায় কাছাকাছি।

কিন্তু চিতা দৌড়ানোর সময় তার এই দ্রুত গতি দীর্ঘ সময় অবধি ধরে রাখতে পারে না। চিতারা হচ্ছে 'স্প্রিন্টার', স্বল্প দূরত্বে খুব দ্রুত গতিতে স্বল্প সময়ের জন্য যারা দৌড়াতে দক্ষ, নেকড়েরা এর ব্যতিক্রম, যারা দুর পাল্লার দৌড়ে বিশেষভাবে দক্ষ। যদিও নেকড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ (প্রতি ঘন্টায় ৪০ মাইলের মত) অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু নেকড়েরা সহজে হাল ছেড়ে দেয় না, এবং একটি পর্যায়ে অবশেষে তারা তাদের শিকারকে ক্লান্ত করে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু চিতাদের খুব কাছ থেকে তাদের শিকারের উপর নজর রাখতে হয়, যতক্ষণ না তারা তাদের শিকারের খুব কাছাকাছি চলে আসে, একটি চূড়ান্ত, সংক্ষিপ্ত দ্রুত দৌড়ে শিকারের কাজটি শেষ করার মত যথেষ্ট নিকটে। আর স্বল্প দূরত্বে খুব দ্রুত দৌড়ের চেয়ে অতিরিক্ত কোনোকিছু তাদের সহজেই ক্লান্ত করে দেয়, এবং

তারা শিকারে পিছু দৌড়ানো বন্ধ করে দেয়। আর গ্যাজেলরা চিতাদের মত এত দ্রুত দৌড়াতে পারে না (আবারো, ঘন্টায় প্রায় ৪০ মাইল), কিন্তু তারা 'জিংক' বা খুব দ্রুত হঠাৎ করে পাশ কাটানোর ক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের দৌড়ানোর দিক পরিবর্তন করতে পারে, তাদের পেছনে অনুসরণ করা দ্রুত গতিতে দৌড়ানো কোনো চিতার পক্ষে তাদের ধরার বিষয়টিকে যা বেশ কঠিন করে ফেলে, কারণ যখন আপনি খুব দ্রুত গতিতে একটি নির্দিষ্ট বরাবর দৌড়াচ্ছেন তখন হঠাৎ করেই এক পাশে দিক পরিবর্তন করা বেশ কঠিন একটি কাজ।

অন্য অ্যান্টিলোপদের মত, এছাড়াও গ্যাজেলরা 'প্রঙ্ক' করে যখন কোনো শিকারী প্রাণী তাদের তাড়া করে। প্রঙ্কিং (অথবা স্টটিং) মানে হঠাৎ করে বেশ উঁচুতে লাফিয়ে ওঠা। এটি বিস্ময়কর, কারণ স্পষ্টতই এটি তাদের গতি কমিয়ে দেয় এবং এর কারণে বাড়তি শক্তিও খরচ করতে হয়। এটি হয়তো চিতাকে প্রদর্শন করা কোনো 'সংকেত' হতে পারে: 'আমার পেছনে দৌড়ে সময় নষ্ট করো না, আমি খুব শক্তিশালী, সুস্থ একটি গ্যাজেল, লাফ দিয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে পারি'। এছাড়াও এটি সম্ভবত আরো বোঝায় যে, 'অন্য গ্যাজেলদের তুলনায় আমাকে ধরা আরো বেশি কঠিন হবে। তোমার জন্যে ভালো হবে যদি তুমি আমার পালের অন্য গ্যাজেলকে তোমার শিকার বানানোর চেষ্টা করো'। অবশ্যই গ্যাজেলরা এইভাবে যুক্তি ব্যবহার করে চিন্তা করে না। এর স্নায়ুতন্ত্র 'প্রঙ্ক' আচরণটি করার জন্য এভাবে পূর্ব-নির্দেশিত বা প্রোগ্রাম করা আছে এবং এর কারণ জানা ছাড়াই এটি তাদের প্রবৃত্তির অংশ। 'প্রঙ্কিং' বা 'জিঙ্কিং', যেটাই করুক না কেন, যদি কোনো গ্যাজেল যথেষ্ট পরিমান দীর্ঘ সময় শিকারীর হাতে শিকার হওয়া থেকে এড়াতে পারে যে অনুসরণ করা দ্রুতগতিতে দৌড়ানো চিতা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তাকে থামতেই হয়, এবং এটি নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে। অন্তত সেই দিনটির জন্য।

চিতা এবং গ্যাজেল দুটি প্রাণীকেই খুব চমৎকারভাবে 'ডিজাইন' করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। চিতার মেরুদণ্ড বিস্ময়কর মাত্রায় ধনুকের মত পেছনের দিকে বেঁকে যেতে পারে, তারপর অন্য দিক বরাবর এটি বেশ তীব্র একটি ধাক্কা দিতে পারে, প্রায় দ্বিগুণ মাত্রায় শরীরটি বাঁকিয়ে, উন্মত্ত দ্রুত গতিতে দৌড়ানোর জন্য পায়ের মধ্যে যা শক্তি সঞ্চালিত করে। এই আকারের কোনো প্রাণীর তুলনায় এদের ফুসফুসগুলো আকারে অনেক বড়, একই ভাবে এর নাকের ছিদ্র আর শ্বাসনালীর সব নলগুলো বড়, কারণ চিতার জন্য খুব দ্রুত রক্তে অনেক বেশি পরিমানে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। চিতার হৃদপিণ্ডটিও আকারে বিশেষভাবে বড়, মাংসপেশীতে প্রচুর পরিমানে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত

সরবরাহ করার প্রচেষ্টায় এটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে স্পন্দিত হতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের আকার ছাড়াও, আদৌ হৃৎপিণ্ড থাকার বিষয়টি, এই জটিল, চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি পাম্প যা বিরতিহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে, এমনিতেই যথেষ্ট পরিমানে বিস্ময়কর। হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং প্রক্রিয়াটির গণিত খুব সুস্পষ্টভাবে সমাধান করা হয়েছে। আমি এমনকি এটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করবো না কারণ আমার পক্ষে বোঝার জন্যেও এটি অত্যন্ত জটিল।

আর এই সব জটিলতাগুলো সৃষ্টি হলো কীভাবে? নিশ্চয়ই এই সব গণিতপ্রিয় প্রতিভাবান কারো কাজ? যদিও বিস্ময়কর, তবে এ প্রশ্নটির উত্তর অবশ্যই খুব সুস্পষ্টভাবে, 'না'। আর কেন না - পরবর্তী কতগুলো অধ্যায়গুলোয় সেই কারণগুলো সম্বন্ধে আমরা জানবো।

এবার চিতার চোখ কল্পনা করুন, ভয়ঙ্কর একাগ্রতা নিয়ে যা এর সম্ভাব্য শিকারের উপর স্থির হয়ে আছে, যখন এটি পালাক্রমে হামাগুড়ি আর ঘাড় উঁচু করে লক্ষ করছে এবং খুব গোপনে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে শিকারের সাথে নিজের দূরত্ব কমাতে। অথবা গ্যাজেলের চোখের কথা ভাবুন, লুকিয়ে থাকা কোনো বড় বিড়ালের অনুসন্ধানে বিরতিহীনভাবে এটি চারিদিকে নজর রাখছে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চোখ হচ্ছে একটি ক্যামেরা। আসলেই একটি ডিজিটাল ক্যামেরা কারণ এর পেছনে আলোক-সংবেদী ফিল্ম থাকার বদলে, এর আছে 'রেটিনা', যা তৈরি করেছে বহু মিলিয়ন ক্ষুদ্র আলোক-সংবেদী কোষ। আমরা এই কোষগুলোকে 'ফটোসেল' বলতে পারি। প্রতিটি ফটোসেল ধারাবাহিকভাবে সাজানো স্নায়ুকোষের মাধ্যমে মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত। আমাদের মস্তিষ্কে রেটিনার বেশ কয়েকটি 'ম্যাপ' বা মানচিত্র আছে। আর এই ম্যাপ বলতে আমি বোঝাতে চাইছি এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি প্যাটার্ন বা বিন্যাস, আর এই বিন্যাসটি এমন যে, মস্তিষ্কে পাশাপাশি থাকা কোষগুলো রেটিনায় পাশাপাশি থাকা ফটোসেলগুলোর সাথে একই নিয়মিত বিন্যাসে সংযুক্ত থাকে, মানচিত্রের ডানে-বামে এবং উপর-নীচে উভয় দিকেই।

ক্যামেরা সাথে চোখের আরো কিছু সাদৃশ্য আছে। আইরিসের (চোখের রঙ্গীন অংশটি) সাথে সংযুক্ত বিশেষ মাংসপেশীর দ্বারা পিউপিল (তারারন্ধ্র বা চোখের মণি) প্রশস্ত (আকারে বড়) অথবা সংকীর্ণ (আকারে ছোটো) হতে পারে। আয়নার সামনে দাড়িয়ে যদি আপনার চোখের দিকে তাকান, তাহলে আপনিও এটি দেখতে পারবেন। একটি টর্চ দিয়ে আপনার বাম চোখে উপর আলো ফেলুন, এরপর আয়নায় ডান চোখটি লক্ষ করতে করতে টর্চের আলো ডান চোখের উপর ফেলুন । আপনি দেখতে পারবেন যে, পিউপিল সংকুচিত হচ্ছে। একটি

স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরাতেও 'আইরিস ডায়াফ্রাম' (এমনকি নামটাও এসেছে চোখ থেকে) সঠিক পরিমানে আলো ভিতরে প্রবেশ করতে দেবার জন্যে খোলে কিংবা বন্ধ হয়।আইরিস ডায়ফ্রামের অ্যাপার্চার বা ছিদ্রটি সংকুচিত হয় যখন সূর্যের আলো বেরিয়ে আসে। এটি সম্প্রসারিত হয় যখন সূর্যের আলো কমে যায়। ঠিক চোখের আইরিস যে কাজটি করে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার, আমাদের চোখের মত পিউপিলকে সবসময় গোলাকৃতির হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। গ্যাজেলের পিউপিলটি যেমন অনুভূমিক একটি ফাঁক বা ছিদ্র। উজ্জ্বল আলোয় বিড়ালের এই ছিদ্রটি উল্লম্ব, আর এটি বৃত্তাকারে সম্প্রসারিত হয় যখন আলোর পরিমান কমে যায়। যে বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে পিউপিল আর এটিকে পরিবেষ্টন করে রাখা মাংসপেশীগুলো, যা নিয়ন্ত্রণ করে কতটুকু পরিমান আলো চোখের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। ঘটনাক্রমে রেটিনায় যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয় সেটি উল্টো। আপনি কী বুঝতে পারছেন কেন এটি কোনো সমস্যার কারণ হয় না? কেন আমরা এর কারণে পৃথিবীটিকে উল্টো দেখতে পাই না?

এছাড়াও ক্যামেরার মতো চোখেও একটি লেন্স থাকে যা কাছের কোনো বস্তু দেখতে 'ফোকাস' করা যেতে পারে, এবং এরপর দূরের কোনো কিছু দেখতের পুনরায় ফোকাস করা যেতে পারে - অথবা, অবশ্যই কাছে দূরের মধ্যবর্তী য-কোনো দূরত্বে এটি ফোকাস করা যেতে পারে। সামনে পেছনে লেন্সটিকে নাড়ানোর মাধ্যমে ক্যামেরা আর মাছের চোখ ফোকাসের কাজটি করে থাকে । চিতা, গ্যাজেল, মানুষ আর অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীরা অপেক্ষাকৃত কম সুস্পষ্ট একটি উপায়ে এই কাজটি করে। লেন্সের সাথে যুক্ত বিশেষ মাংসপেশী ব্যবহার করে লেন্সটির আকৃতি তারা পরিবর্তন করে। ক্যামেলিয়নদের (বহুরূপী - এক ধরনের গিরগিটি) যে-কোনো দিকেই স্বতন্ত্রভাবে ঘোরানো সম্ভব এমন চোখ থাকে, একটি ক্ষুদ্র মোচাকৃতির ঘূর্ণনক্ষম প্রকোষ্ঠে, যা পৃথকভাবে এর দুটি চোখকে দুটি ভিন্ন দূরত্বে ফোকাস করতে পারে (লেন্সের আকার পরিবর্তন করার পদ্ধতি নয় বরং মাছ/ক্যামেরা পদ্ধতি ব্যবহার করে, লেন্সকে সামনে পেছনে সরিয়ে)। এবং তারা তাদের শিকারের দূরত্ব বিচার করে - যেমন একটি মাছি - এটির উপর ফোকাস করতে তাদের যা করতে হবে সেটি পরিমাপ করার মাধ্যমে। এরপর মাছিটি জানতেও পারে না তাকে কী আঘাত করলো। বাস্তবিকভাবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যা মাছিটিকে আঘাত করে, সেটি হচ্ছে ক্যামেলিয়নের জিহবা, যা (আবারো বিস্ময়করভাবেই) ক্যামিলিয়নের নিজের শরীরের দৈর্ঘ্যের চেয়েও লম্বা, আঠালো হারপুনের মত এটি খুব দ্রুত ছিটকে

বের হয়ে আসে। এরপর এর মাথায় আটকে থাকা দুর্ভাগা পোকাসহ সে জিহবা-হারপুনটি ভিতরে টেনে আনা হয়।

ক্যামেলিয়ন আর চিতার মধ্যে সাধারণ কিছু বিষয় আছে। দুটি প্রাণীই তাদের শিকারকে ধীরে ও গোপনে অনুসরণ করে, যতক্ষণ না তারা এটির খুব নিকটে না আসে। কিন্তু যথেষ্ট নিকটে আসার কারণ কী? চিতার ক্ষেত্রে, চূড়ান্ত দ্রুত গতিতে শিকারের পেছনে দৌড়ানো আর ক্যামেলিয়নের ক্ষেত্রে, এখানেও এক ধরনের খুব দ্রুত করার মত একটি কাজ আছে। কিন্তু সে কাজটি করে শুধুমাত্র এর জিহবা একাই, যখন ক্যামেলিয়নের শরীরটি পাথরের মত একটি জায়গায় স্থির অবিচল হয়ে থাকে। আপনার মনে আছে যে চিতা মাত্র তিন সেকেন্ডের মধ্যে শূন্য থেকে ৬০ মাইল প্রতি ঘন্টায় এমন গতি অর্জন করতে পারে? যদি তুলনা করা হয় তাহলে ক্যামেলিয়নের জিহবার তার চেয়েও প্রায় ৩০০ গুণ বেশি গতি অর্জন করতে পারে। কিন্তু এটি ঘন্টা প্রতি ৬০ মাইল গতি অর্জন করার বহু আগেই এর শিকার মাছিটিকে ধরতে পারে (অথবা ধরতে ব্যর্থ হতে পারে) । আর যা-ই হোক না কেন জিহবাটি ক্যামেলিয়নে শরীরের পুরো দৈর্ঘ্যের চেয়ে শুধু খানিকটা (শুধু খানিকটা!) বেশি লম্বা। সুতরাং ঘন্টা প্রতি ৬০ মাইল গতিতে পৌঁছানোর মত সময়ের অবকাশ নেই, এমন কী সে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতির ত্বরণের হারের ক্ষেত্রেও।

আরো একবার, এ সব কিছু দেখলে মনে হয় অবশ্যই এগুলো একজন ডিজাইনারের অস্তিত্ব দাবী করছে, তাই না? আরো একবার, এর উত্তর হচ্ছে, না, আসলেই এটি তা করছে না, পরবর্তী অধ্যায়গুলো যা আমরা দেখবো।

ঠিক কীভাবে ক্যামেলিয়নের জিহবা কাজ করে সেটি বেশ দীর্ঘ দিন ধরেই একটি রহস্য ছিল। শুরুর দিকের একটি প্রস্তাবনা ছিল, 'হাইড্রলিক' একটি চাপের (জলশক্তি) মাধ্যমে এটি সম্প্রসারিত হচ্ছে, ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকা একটি পুরুষাঙ্গের মত, তবে আরো অনেক বেশি দ্রুত। এই হাইড্রলিক পদ্ধতি ব্যবহার করে জাম্পিং মাকড়শারা (নিজেদেরকে জালের সাহায্যে মাটির সাথে শক্ত করে বেধে রেখে এই চমৎকার ক্ষুদ্রাকার প্রাণী যারা বহু উপরে লাফিয়ে উঠতে পারে) । বিস্ফোরক গতিতে দ্রুত রক্ত এদের পায়ের মধ্যে প্রবেশ করে, যা আকস্মিকভাবে এই পাগুলোকে সোজা করে ফেলে এবং উপরের দিক বরাবর মাকড়শাটিকে লাফিয়ে তুলতে প্রয়োজনীয় ধাক্কাটি দেয়। প্রজাপতি আর মথের জিহবাও সেভাবে কাজ করে। বিশ্রামরত অবস্থায় এটি কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, পরে হাইড্রলিক চাপের কারণে এই কুণ্ডলীটি সোজা হয়ে যায়, অনেকটা সেই

‘পার্টি হর্ন’ খেলনার মত, যা ফোলাতে আপনাকে ফুঁ দিতে হয়, এবং এটি অন্য কারো মুখে উপর গিয়ে আছড়ে পড়ে, কখনো খুব তীব্র শব্দ করে।

যদিও আংশিকভাবে এটি ভুল, কিন্তু ঐ হাইড্রলিক তত্ত্বটি একটি জিনিস সঠিকভাবেই ব্যাখ্যা করেছিল: ক্যামেলিয়নের জিহবা হচ্ছে ফাঁপা। কিন্তু উচ্চ চাপে সেখানে শুধু তরল ধারণ করার পরিবর্তে এর মধ্যে দীর্ঘ, শক্ত আর পিচ্ছিল কাটার মত একটি জিনিস থাকে, যাকে বলা হয় ‘হাইওয়েড প্রসেস’। অবশ্যই হাইওয়েড স্পাইকের চেয়ে জিহবা অনেক বেশি পরিমানে লম্বা। সুতরাং বিশ্রামরত জিহবাকে এই কাটার মত দণ্ড বা স্পাইকের চারপাশে পেচিয়ে ভাজ হয়ে নিজের জন্য জায়গা বের করে নিতে হয়। আর এর চারদিকে পেচিয়ে থাকে শক্তিশালী কিছু মাংসপেশী। স্বাভাবিকভাবে এই বাস্তব তথ্যটি কীভাবে এ জিহবাটি কাজ কর সে সংক্রান্ত পরবর্তী তত্ত্বটি প্রস্তাব করে - এবং সেটি আবারো ভুল, তবে সত্যের অপেক্ষাকৃত নিকটে। এটি ছিল সেই তত্ত্বটি, যখন মাংসপেশীগুলো হাইওয়েড স্পাইকটির চারপাশে সংকুচিত হয়, পিচ্ছিল ফাপা জিহবটি বাইরের দিকে চাপের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে ভাজ থেকে বেরিয়ে আসা কোনো টেলিস্কোপের মত। ঠিক যখন আপনি কোন কমলালেবুর কোয়া মধ্যে থাকা বিচির উপর চাপ দেন এটি লাফিয়ে বের হয়ে আসে। প্রায় এরকমই কিছু ঘটে, তবে পুরোপুরিভাবে একই না।

বিষয়টি হচ্ছে কোনো মাংসপেশীই যথেষ্ট দ্রুত গতিতে সংকুচিত হতে পারে না, যা কিনা ক্যামেলিয়ন জিহবায় অবিশ্বাস্য মাত্রার ত্বরণ গতি দিতে পারে। ঐ ধরনের ত্বরণের জন্য, মাংসপেশীর দ্বারা সরবরাহকৃত শক্তি সময়ের আগেই সেখানে সংরক্ষিত থাকতে হবে এবং যা কিনা পরে অবমুক্ত করা যায়। আর সেভাবেই ‘ক্যাটাপুল্ট’ কিংবা ‘ক্রসবো’ বা ‘লংবো’ কাজ করে। আপনার হাতের মাংসপেশী কিন্তু এত দ্রুত গতিতে কোনো তীর ছুড়ে মারতে পারবে না, কিন্তু একটি বাকানো ধনুকের ছিলা সেটি পারে। আপনার হাতের মাংসেপেশীগুলো ধীরে ধনুকের জ্যা বা ছিলাটিকে পেছনের দিকে টেনে আনে এবং মাংসপেশীর শক্তি জমে বাঁকানো ধনুকে। তারপর সেই সঞ্চিত শক্তি হঠাৎ করে মুক্ত করে দেয়া হয় যখন আপনি ছিলা থেকে আপনার আঙ্গুল সরিয়ে ফেলেন, এবং তীরটি ধনুক থেকে দ্রুত ছুটে বের হয়ে যায়, আরো ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে, শুধু আপনার হাতের পক্ষে যত জোরে ছুড়ে মারা সম্ভব ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রার গতি আর শক্তি নিয়ে। শক্তিটি মূলত এসেছে যখন আপনার মাংসপেশী ধীরে ছিলাটিকে পেছনে টেনে এনেছিল। শক্তির মুক্তি কিছুক্ষণের

জন্যে স্থগিত হয়, এবং তারপর হঠাৎ করেই এটি মুক্ত হয়: ধনুকে যা সঞ্চিত থাকে। গুলতির ক্ষেত্রে যেমন আপনার হাতের মাংসপেশীর শক্তি সঞ্চিত থাকে টান টান হয়ে থাকা স্থিতিস্থাপক ইলাস্টিকে।

কীভাবে সঞ্চিত শক্তি ক্যামেলিয়ানের জিহবা পরিচালিত করে? হাইওয়েড স্পাইকের চারপাশে ঘিরে থাকা মাংসপেশীগুলো আসলেই জিহবাটিকে সজোরে বাইরে বের হয়ে আসার শক্তি দিচ্ছে। কিন্তু কোনো ধনুক বা গুলতির সেই শক্তিটি এখানে সঞ্চিত থাকে। স্থিতিস্থাপক একটি আবরণের মধ্যে এটি সঞ্চিত থাকে, যে আবরণটি মাংসপেশী আর পিচ্ছিল হাইওয়েড স্পাইকের মধ্যে অবস্থান করে। মাংসপেশীগুলো নয়, এই এই স্থিতিস্থাপক পর্দাটি সেই প্রচণ্ড চাপটি সৃষ্টি করে যখন একটি স্প্রিং লোড কর্মপদ্ধতি হঠাৎ করে অবমুক্ত হয়, এবং হারপুন জিহবাটি বাইরে বের হয়ে আসে: সরাসরি মাংসপেশী সংকুচিত করে যত দ্রত এটি বের হতে পারতো স্থিতিস্থাপক সেই আবরণটির কারণে এটি তার চেয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসে।

ক্যামেলিয়নের জিহবাটি হারপুনের মত ধারালো নয়। এর পরিবর্তে জিহবার মাথায় স্ফীত একটি জিনিস আছে। এই স্ফীত অংশটি আঠালো, এবং এখানে একটি 'সাকশন' বা চোষক কাপ (আঁকড়ে ধরার অঙ্গ যা ঋণাত্মক পানি কিংবা বাতাসের চাপ ব্যবহার করে) আছে। যা অসহায় পোকাটি সাথে আঠার মত আটকে যায়, তারপর এটিকে ক্যামেলিয়নের মুখের ভিতর আবার গুটিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে ভিন্ন এক গুচ্ছ মাংসপেশী, যাদের বলা হয় 'রিট্র্যাকটর' মাংসপেশী। সামনের ফোলা অংশটি বেশ ভারী, কিন্তু বাকী জিহবাটি বেশ পাতলা একটি দড়ির মত। এই ফোলা অংশটি ছিটকে বের হয়ে আসে 'ব্যালিস্টিক্যালি', যার মানে একবার যখন এটি মুখের বাইরে আসে, এটির উপর ক্যামেলিয়নের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ঠিক যেমন কোনো গুলতি থেকে ছোড়া পাথর বা ধনুক থেকে বের হয়ে আসা কোনো তীর। অথবা আসলেই এটি একটি হারপুন, যার সাথে এর বেশি সাদৃশ্য আছে কারণ, ক্যামেলিয়নের জিহবার মত এটিও এর এক প্রান্তে নিক্ষেপন যন্ত্রটির সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। একটি আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপনাস্ত্রের এমন নাম হবার কারণ হচ্ছে একবার যখন এটি নিক্ষেপন করা হয়, এটির উপর আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হচ্ছে 'গাইডেড' বা নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপনাস্ত্র, সুর্নির্দিষ্ট লক্ষ্য অবধি যেতে সহায়তা করতে উড়ন্ত অবস্থায় এদের গতিপথ সংশোধন করা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, ধীর মাংসপেশী থেকে সঞ্চিত শক্তি খুব দ্রুত স্থিতিস্থাপক ইলাস্টিকে মুক্ত করার এই ক্যাটাপুল্ট কিংবা গুলতির কৌশলটি লাফ দেয় এমন পতঙ্গগুলোও ব্যবহার করে থাকে, যেমন, ঘাসফড়িং এবং ফ্লি। তাদের এই 'রাবার' (বা স্থিতিস্থাপক ইলাস্টিক) হচ্ছে 'রেজিলিন' নামে একটি বিস্ময়কর জিনিস। 'ইলাস্টিক' হিসাবে এমনকি রাবারের চেয়েও অনেক বেশি দক্ষ হচ্ছে রেজিলিন। এর মানে হচ্ছে সঞ্চিত শক্তির অপেক্ষাকৃত বড় একটি অংশ এর চূড়ান্ত মুক্তি জন্যে প্রস্তুত থাকে। 'এফিসিয়েন্ট' বা দক্ষতা হচ্ছে একটি কারিগরী শব্দ যার অর্থ অল্প পরিমান শক্তি তাপ হিসাবে হারিয়ে যায়। তাপগতিবিদ্যার অলংঙ্ঘনীয় সূত্রগুলো জন্যে অবশ্যম্ভাবীতার সাথেই কিছু পরিমান তাপ হারাবে - কিন্তু এখানে সেই সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নেই। সবচেয়ে বিস্ময়কর উদাহরণটি হচ্ছে - এই 'ক্রসবো'র ইলাস্টিক সঞ্চয়ের কৌশলটি ব্যবহার করে 'মান্টিস শ্রিম্প' যে পরিমান শক্তির ঘুষি সৃষ্টি করতে পারে, সেটি মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা কোনো প্রাণীর জন্য রীতিমত বিস্ময়কর। এদের সামনের এক জোড়া পা হাতুড়ি বা গদার মত আকার নিয়ে বিশেষভাবে বিবর্তিত হয়েছে, যা ঘন্টায় ৫০ মাইল বেগে এর শিকারকে আঘাত করতে পারে। আর এই আঘাতটির ত্বরণ .২২ পিস্তল থেকে বের হয়ে আসা একটি গুলির ত্বরণের সমতূল্য। এবং কল্পনা করুন বুলেটের ব্যতিক্রম এটি পানির নীচে ঘটছে। আবারো পুনরাবৃত্তি করছি, এটি সম্ভব হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতায় সঞ্চিত থাকা শক্তির মাধ্যমে। সরাসরি মাংসপেশীর শক্তি এই পরিমান গতি অর্জন করতে পারে না।

ক্যামেলিয়নের জিহবার আরো খানিকটা গল্প বাকি আছে। যেমন, গন্তব্য অভিমূখে দ্রুত ছিটকে বেরিয়ে আসা জিহবার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা করে দিতে হাইওয়েড স্পাইক নিজেই সামনের দিকে সরে আসে, যেন ধনুক হাতে নিয়ে আপনি আপনার নিশানার দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন ক্রিকেটের ফাস্ট বোওলারের মত, এবং তারপর দৌড়াতে দৌড়াতেই আপনি তীরটি ছুড়ে মারছেন। আমি সম্ভবত ইতোমধ্যেই যথেষ্ট বলেছি যা আপনাকে চিন্তা করতে প্ররোচিত করবে: 'নিশ্চয়ই কেউ অবশ্যই এই চমৎকার যন্ত্রটি পরিকল্পনা করে সৃষ্টি করেছেন'? আবারো আপনার এমন কোনো ধারণা ভুল হবে। কেন আমি এই কথা বারবার বলছি, এছাড়াও বলছি যে পরের অধ্যায়গুলো এর ব্যাখ্যা দেবো? কারণ এই অধ্যায়টি মূলত সমস্যাটিকে উপস্থাপন ও সেই বিষয়গুলো চিহ্নিত করা সংক্রান্ত - যা ব্যাখ্যা করতে হবে। এবং এটি বড় একটি সমস্যা, আর আমি বিষয়টিকে হালকা করছি না, আর সে কারণে সমাধানগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগেই আমি সমস্যাটিকে উপস্থাপন করতে পুরো একটি

অধ্যায় নিবেদন করেছি। আমরা যেমন দেখবো, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন হচ্ছে শুধুমাত্র যথেষ্ট ব্যাপক একটি ধারণা যা কিনা এই ধরনের বড় সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে।

যদিও ক্যামেলিয়নদের বিস্ময়কর জিহবা বা স্বতন্ত্রভাবে ঘুর্ণনক্ষম চোখ আছে, কিন্তু এমনকি তারা আরো বিখ্যাত অন্য একটি কারণে: পটভূমি বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মিলিয়ে তাদের গায়ের রং পরিবর্তন করার ক্ষমতা। বার বার নিজের মতামত পরিবর্তন করে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতে সাথে তাল মিলিয়ে চলা রাজনীতিবিদদের উপহাস করে মাঝে মাঝে পলিটিকাল ক্যামেলিয়ন বা রাজনৈতিক বহুরূপী নামে ডাকা হয়। শরীরের রং পরিবর্তন করার দক্ষতা বিচারে ক্যামেলিয়নের সমতূল্য হচ্ছে কিছু প্রজাতির ফ্ল্যাটফিশ মাছ, যেমন, প্লেস মাছ। কিন্তু এই দুটি শ্রেণির প্রাণীদের রং বদলানোর দক্ষতাকে বহু গুণে পেছনে ফেলে এগিয়ে আছে অক্টোপাস এবং তাদের কিছু আত্মীয় প্রজাতি। ক্যামেলিয়ন আর ফ্ল্যাটফিশ তাদের রং পরিবর্তন করে ধীরে, বেশ কয়েক মিনিট ধরে। অক্টোপাস, স্কুইড আর কাটলফিশ, সামষ্ঠিকভাবে যে প্রাণিদের সেফালোপড বলা হয়ে থাকে, তারা সেকেন্ডের মধ্যেই তাদের রং বদলাতে পারে।

এই গ্রহে খুঁজে পেতে পারেন এমন যে-কোনো প্রাণীর চেয়ে সেফালোপডরাই ‘এলিয়েন’ কোনো প্রাণীর সবচেয়ে নিকটবর্তী হবার যোগ্যতা রাখে। আটটি (অক্টোপাস) অথবা দশটি (স্কুইড আর কাটলফিশ) বাহু তাদের মুখের ছিদ্রটি ঘিরে থাকে। এই বাহুগুলোর খুব সুক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত আর বিরতিহীনভাবে নমনীয় বিচলন করার বিস্ময়কর পরিমান দক্ষতা আছে। আর এটি আরো বেশি বিস্ময়কর কারণ এদের এই বাহুগুলোয় কোনো অস্থি নেই। তারাই একমাত্র প্রাণী যাদের সত্যিকারের ‘জেট প্রপালশান’ আছে আর পেছন দিক ববাবর সাতার কাটার জন্য তারা এটি ব্যবহার করে, বিশেষ করে যখন তাদের হঠাৎ করে পালাতে হয়। এবং - আর সেই কারণেই এই অধ্যায়ে তাদের আবির্ভাব - তারা খুব দ্রুত জটিল বিন্যাসসহ মুহূর্তের মধ্য তাদের শরীরের রং পরিবর্তন করতে পারে। আর প্রলুব্ধকরভাবে, যেভাবে তারা এই কাজটি করে সেটি আধুনিক রঙ্গীন টেলিভিশন যেভাবে কাজ করে তার সদৃশ।

আপনার টেলিভিশন চালু করুন, এবং সামনে গিয়ে একটি শক্তিশালী বিবর্ধক আতশী-কাচ ব্যবহার করে খুব ভালো করে টেলিভিশনের পর্দাটি লক্ষ করুন। যদি না সেটি পুরানো-ফ্যাশনের হয়ে থাকে (যেখানে অনুভূমিক লাইন ছিল) আপনি লক্ষ করবেন, পুরো স্ক্রিন আবৃত করে আছে বহু মিলিয়ন ক্ষুদ্র রঙ্গিন

বিন্দু, যাদের বলা হয় 'পিক্সেল'। প্রতিটি পিক্সেল হয় লাল, নীল কিংবা সবুজ, এবং টেলিভিশন সেটের ইলেক্ট্রনিক্সের নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি পিক্সেলকে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়, উজ্জ্বল কিংবা অনুজ্জ্বল করা যায়। এই পিক্সেলগুলো খুবই ক্ষুদ্র, আর তাই দূর থেকে যখন আপনি টেলিভিশন দেখেন তখন এগুলো দেখা যায় না। কিন্তু প্রতিটি রং, সেটি যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন, আপনি সোফায় বসে যা দেখতে পাচ্ছেন সেটি কিন্তু তৈরি করছে পিক্সেল উজ্জ্বলতার কোনো না একটি মিশ্রণ। আপনি যদি আতশী-কাচ দিয়ে ছবির উজ্জ্বল সাদা অংশটি লক্ষ করেন, আপনি সেখানে তিন রঙের পিক্সেলই সেখানে দেখতে পাবেন, লাল, নীল এবং সবুজ, এবং সবগুলোই উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। ছবির লাল অংশে, বিস্ময়কর না অবশ্যই, শুধুমাত্র লাল পিক্সেলগুলো উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। একইভাবে নীল এবং সবুজ অংশে নীল আর সবুজ পিক্সেলগুলোই উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে দেখবো। হলুদ রংটি তৈরি হয় লাল আর সবুজ পিক্সেলগুলোকে একত্রে সক্রিয় করে, বেগুনী রং যেমন লাল আর নীল পিক্সেলের মিশ্রণে, বাদামি রঙের জন্যে আরো খানিকটা জটিল মিশ্রণের দরকার হয়। ধূসর, সাদার মত তিনটি পিক্সেলই আলোকিত তবে অনুজ্জ্বলভাবে। খুব দ্রুত এই সব বহু মিলিয়ন পিক্সেলের প্রত্যেকটি পিক্সেলের উজ্জ্বলতাকে খুব দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে টেলিভিশনের ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশগুলো সম্পূর্ণ চলমান ছবিটি সৃষ্টি করে। কম্পিউটারের স্ক্রিনও একই ভাবে কাজ করে।

এবং বিস্ময়কর বিষয়টি হচ্ছে অক্টোপাস, স্কুইড অথবা কাটলফিশের ত্বকও এভাবে কাজ করে। এদের পুরো ত্বক বা চামড়ার আবরণটি হচ্ছে একটি জীবন্ত টিভি পর্দা। তবে এখানে পিক্সেলগুলো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এর পরিবর্তে প্রতিটি পিক্সেল হচ্ছে রঙ্গীন রঞ্জকপদার্থের একটি ক্ষুদ্র থলে। টেলিভিশন পর্দায় যেমন থাকে, এখানেও তিনটি ভিন্ন রং আছে, তবে লাল, নীল আর সবুজ নয় বরং লাল, হলুদ আর বাদামি। কিন্তু চামড়ার উপরিপৃষ্টের রঙের নকশা পরিবর্তন করতে টিভি স্ক্রিনের পিক্সেলগুলোর মতোই এই তিন ধরনের পিক্সেলকে স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ।

সেফালোপড প্রাণীদের ত্বকে থাকা 'পিক্সেল' টেলিভিশেনর পর্দার পিক্সেলের চেয়ে আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। মূলত এগুলো রঞ্জকপদার্থের থলে, আর পিক্সেলের আকারে এত ক্ষুদ্র থলে তৈরি করাও সম্ভব নয়। কীভাবে এই থলেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়? প্রতিটি থলে একটি বিশেষ ধরনের অঙ্গের মধ্যে থাকে - যাকে ক্রোমাটোফোর বলা হয়, মাছেরও ক্রোমাটোফোর আছে, কিন্তু সেগুলো খুব ভিন্ন উপায়ে কাজ করে। সেফালোপডের শরীরে এই সব থলের

পর্দাগুলো হচ্ছে ইলাস্টিক বা স্থিতিস্থাপক (আসলেই কৌতূহলোদ্দীপক, স্থিতিস্থাপকতার এই বিষয়টি প্রায়শই আমাদের আলোচনায় উপস্থিত হচ্ছে)। ক্রোমাটোফোরের সাথে বিশেষ ধরনের মাংসপেশী কোষ সংযুক্ত থাকে। এই মাংসপেশীগুলো তারা-মাছের বাহুগুলোর মত সজ্জিত থাকে, পার্থক্য শুধু এখানে পাঁচটির বদলে প্রায় বিশটি বাহু থাকে। যখন এ মাংসপেশীগুলো সংকুচিত হয়, এগুলো সে থলের বাইরের দেয়ালটিকে টেনে করে, ফলে অপেক্ষাকৃত বড় একটি জায়গাব্যাপী রঞ্জকপদার্থপূর্ণ থলেটি সম্প্রসারিত হয়, এবং বাইরে বের হয়ে আসে এবং ক্রোমাটোফোরগুলো রঞ্জকপদার্থের রংটি ধারণ করে। যখন মাংসপেশী শিথিল হয়, থলেটি এর স্থিতিস্থাপক দেয়ালের কারণে আবার ক্ষুদ্র একটি বিন্দুতে সংকুচিত হয়, সুতরাং দূর থেকে রংটি অদৃশ্য হয়ে যায়। যেহেতু রং-পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে মাংসপেশী, আর মাংসপেশীগুলো নিয়ন্ত্রণ করে স্নায়ু, সেই কারণেই এটি খুব দ্রুত ঘটে। রং পরিবর্তন হতে মাত্র এক সেকেন্ডের এক পঞ্চমাংশ সময় প্রয়োজন হয়। যদিও এটি টেলিভিশন স্ক্রীনের মত এত দ্রুত পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু ক্যামলিয়নের চামড়ার চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে ঘটে যেখানে ক্রোমাটোফোরগুলো নিয়ন্ত্রণ করে হরমোন, যে রাসায়নিক পদার্থগুলো রক্তের মাধ্যমে অনিবার্যভাবেই ধীর গতিতে তাদের গন্তব্যে পৌছায়।

ক্রোমাটোফোরকে টেনে ধরা পেশীর সংকোচন নিয়ন্ত্রিত করে স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের কোষের মাধ্যমে স্নায়ুগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়। স্নায়ুগুলো খুব দ্রুত (যদিও টেলিভিশনের ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশের মত দ্রুত নয়)। তাত্ত্বিকভাবে, আমরা যদি কোনো একটি স্কুইডের মস্তিষ্কের কোষগুলোকে একটি কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করতে পারতাম, আমরা এর চামড়ায় চার্লি চ্যাপলিনের কোনো চলচ্চিত্র দেখতে পারতাম। আর অবশ্য সেটি করা হয়নি, যদিও স্কুইড নিজেই এর খুব কাছাকাছি কিছু করেছিল রং পরিবর্তনের চমৎকার ঢেউ সৃষ্টি করে, যা দেখলে মনে হয় আকাশে খুব দ্রুত মেঘ উড়ে যাচ্ছে। উডস হোল মেরিন বায়োলজি ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানী ড. রজার হানলন অনুগ্রহ করে আমার জন্য এই অধ্যায়টির একটি ড্রাফট পড়েছিলেন। যখন তিনি আমার চার্লি চ্যাপলিনের সিনেমা প্রদর্শনের ধারণাটি পড়েছিলেন, তিনি আমাকে এটি বলেছিলেন। তিনি এবং তার কিছু সহকর্মী একটি মৃত স্কুইডের ফিনের (সেফালোপড ফিনগুলোকে উইং নামেও ডাকা হয়, এগুলো পাতলা পর্দার মত শরীর থেকে বাইরে দিকে বের হয়ে থাকা একটি অঙ্গ যা চলাফেরায় সহায়তা করে) একটি স্নায়ুকে আইপডের সাথে যুক্ত করেছিলেন। অবশ্যই ফিন কিছু শুনতে পারে না, কিন্তু সঙ্গীতের শক্তিশালী ছন্দের সাথে তারটি বিদ্যুত তরঙ্গে কেপে উঠেছিল, আর সেটি ক্রোমাটোফোর

পেশীগুলোকে উত্তেজিত করেছিল। আর ফলাফল আসলেই বিস্ময়কর, অনেকটাই ডিস্কো লাইট শোয়ের মত। ইউ টিউবে 'ইনসেন ইন দ্য ক্রোমাটোফোর' নামে খুঁজে দেখুন।

সেফালোপড়দের রং পরিবর্তন করার কাহিনী আরো আকর্ষণীয়। প্রথমে আপনার জানা প্রয়োজন দুটি উপায়ে কোনো কিছু রঙ্গীন হতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে পিগমেন্ট বা রঞ্জকপদার্থ (কালি, রং বা পেইন্ট) যা সূর্যের আলোকতরঙ্গের কিছু রং শোষণ করে এবং বাকিগুলো প্রতিফলিত করে। আরেকটি উপায় হচ্ছে 'স্ট্রাকচারাল কালারেশন' (কাঠামোগত রঞ্জন) অথবা 'ইরিডেসেন্স' (বিত্রাভা)। ইরিডেসেন্স সুর্যের আলো শোষণ করে কাজ করে না। এটি সুর্যের আলো প্রতিফলিত করে, এবং যে রংগুলো তৈরি হয় সেগুলো যে কোণ থেকে দেখা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় (বিভিন্ন দিক থেকে আলোকসম্পতের সাথেও রং বদলায়) চমৎকার উজ্জ্বল একটি রংধনু রঙের দীপ্তিসহ সাবানের বুদ্বুদগুলো (আইরিস হচ্ছে গ্রিক রংধনুর দেবী) 'ইরিডিসেন্ট' এবং আপনি একই জিনিস হয়তো দেখেছেন পানির উপর ছড়িয়ে থাকা তেলের কোনো পাতলা স্তরে। ইরিডেসেন্স ব্যবহার করে পুরুষ ময়ুররা তাদের চমৎকার আকর্ষণীয় রংগুলো তৈরি করে। এছাড়াও একই ভাবে বর্ণিল হয় উজ্জ্বল নীল ক্রান্তীয় প্রজাপতিগুলো, যাদের 'মর্ফো' নামে ডাকা হয়।

বেশ, স্কুইডরা কোনো কৌশলই হাতছাড়া করেনি, এবং কাঠামোলগত রঞ্জন হচ্ছে আরো এক ধরনের কৌশল যা তারা ব্যবহার করতে ভুলে যায়নি। ক্রোমাটোফোরের নীচে তথাকথিত আইরিডোঅফোরের আরেকটি স্তর আছে। আইরিডিফোর ক্রোমাটোফোরের মত এর আকৃতি পরিবর্তন করে না, তবে তারা বর্ণিল একটি দ্যুতি মর্ফো প্রজাপতির ডানার মত। প্রায়শই উজ্জ্বল নীল অথবা সবুজ, যা লাল, হলুদ অথবা বাদামী রঙের হবার কারণে ক্রোমাটোফোরগুলো নিজে তৈরি করতে পারে না। এবং যদিও সব না, তবে এই আইরিডোফোরগুলোর কিছু তাদের রংও পরিবর্তন করতে পারে - আর তারা সেটি করে ক্রোমাটোফোরগুলো থেকে পৃথক একটি উপায়ে।

এই আইরিডোফোরগুলো ক্রোমাটোফোরগুলোর নীচে একটি পৃথক স্তরে সজ্জিত থাকে, সুতরাং এগুলো বর্ণিল উজ্জ্বল একটি পটভূমি তৈরি করে যা কিনা এর উপরে থাকা সংকোচন-সম্প্রসারণশীল ক্রোমাটোফোরগুলো কম বেশি আবৃত করে রাখতে পারে। আর ক্রোমাটোফোর আর আইরিডোফোর ছাড়াও এই আইরিডোফোরগুলোর নীচে আরো তথাকথিত লিউকোফোরের আরেকটি স্তর থাকে। এগুলো সাদা, তুষারকণার মত, এগুলো সাদা কারণ এগুলো সব তরঙ্গ

দৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলিত করে, তবে আয়নার মত নিয়ন্ত্রিত আর পরিছন্নভাবে নয়, বরং চারিদিকে সেটিকে বিচ্ছুরিত করে।

পরিবর্তনশীল চামড়ার রং আর বিন্যাসগুলো সেফালোপডরা কেন ব্যবহার করে? মূলত ক্যামোফ্লেজ বা কুটবেশ হিসাবে। তারা প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে ক্রোমাটোফোরগুলোকে প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করে যেন তারা তাদের প্রেক্ষাপট বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে 'মিমিক' বা অনুকরণ করতে পারে। এই কৌশলটি দৃশ্যমান চমৎকার একটি চলচ্চিত্রে, এই ভিডিও রেকর্ডিংটি করেছিলেন রজার হানলন, যখন তিনি গ্রান্ড কেমান দ্বীপের কাছে পানির নীচে ডাইভিং করছিলেন। বইয়ের শেষ অ্যালবামে চার এবং পাঁচ নং ছবিটি সেই ভিডিও চিত্রের এক জোড়া স্থির চিত্র প্রদর্শন করছে। ড. হানলন যখন একগুচ্ছ বাদামী সমুদ্র শৈবালের দিকে সাঁতার কেটে যাচ্ছিলেন, তিনি আনন্দিত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেছিলেন 'সমুদ্র শৈবাল' খানিকটা ভৌতিক, আতঙ্কিত সাদা রং ধারণ করেছিল। মনে হয়েছিল এর পটভূমি থেকে এটি পৃথক হয়ে বের হয়ে আসছে, আর ঠিক সে মুহূর্তে সম্ভাব্য শিকারী প্রাণীর দৃষ্টিসীমায় অস্পষ্ট একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে এটি গাঢ় বাদামি রঙের কালির একটি মেঘ নিঃসরণ করেছিল এবং সেখানে থেকে দ্রুত সেটি পালিয়ে গিয়েছিল। এই ভিডিওটি দেখা স্পষ্টতই গুরুত্বপূর্ণ, অনলাইনে এটি খুঁজতে 'রজার হানলন অক্টোপাস ক্যামোফ্লেজ চেন্জ' শব্দগুলো ব্যবহার করুন।

যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে, সেফালোপডরা তাদের পটভূমির (ব্যাকগ্রাউন্ড) রং অনুকরণ করতে পারে যদিও তাদের চোখ রং দেখতে পায় না অর্থাৎ বর্ণান্ধ। পটভূমির রং কী, সেটি কীভাবে তারা তাহলে বুঝতে পারে? কেউই সেটি নিশ্চিতভাবে এখনো জানতে পারেন নি, কিন্তু সম্ভাব্য প্রক্রিয়াটির সপক্ষে কিছু প্রমাণ মিলেছে, যেমন, তাদের ত্বকে সর্বত্র অথবা কমপক্ষে বেশ কিছু এলাকায় কোনো এক ধরনের দেখার অঙ্গ আছে। এই অঙ্গগুলো সত্যিকারের চোখ নয়। এগুলো কোনো 'ছবি' তৈরি করতে পারে না। এটি অনেকটা সারা চামড়া জুড়ে 'রেটিনা' ছড়িয়ে থাকার মত। আর এই ধরনের একটি রেটিনাই শুধু তাদের দরকার হয় যখন তারা কাজ চালানোর মত পটভূমির একটি রঙ্গীন চিত্র গঠন করে।

সেফালোপড়রা তাদের বিস্ময়কর রং-পরিবর্তনের শক্তি শুধুমাত্র ক্যামোফ্লেজের (বা কুটবেশ) জন্যই ব্যবহার করে না। মাঝে মাঝে তারা তাদের শত্রুদের ভয় দেখাতে অথবা কোনো প্রজনন সঙ্গীকে আকর্ষণ করতেও সেগুলো ব্যবহার করে। আরেকটি ভিডিও চিত্রে রজার হানলন একটি প্রজাতি স্কুইডকে ক্যামেরা

বন্দি করেছিলেন, যারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষদের ভয় দেখাতে সাদা রং এবং প্রজনন সঙ্গীনিকে আকর্ষণ করতে ডোরাকাটা বাদামি রং ব্যবহার করে (ছবির অ্যালবাম অধ্যায়ে ছয় নং ছবিটি দেখুন)। তার একটি ভিডিও চিত্রে একটি পুরুষ স্কুইড বিস্ময়কর দক্ষতার সাথে তার ডানপাশটি সাদা রঙে রুপান্তরিত করেছিল যেন প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষদের সে হটিয়ে দিতে পারে, এবং একই সাথে তার বাম পাশে দাগ কাটা বাদামি রং প্রদর্শন করেছিল যেন এটি তার পাশেই থাকা একটি স্ত্রী স্কুইডকে প্রজননে আকর্ষণ করতে পারে। এটিও দেখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিওটি দেখার জন্য 'রজার হ্যানলন', 'সিগনালিং উইথ স্কিন প্যাটার্ন' শব্দগুলো দিয়ে খোঁজ করুন (এ ক্ষেত্রে আমেরিকার বানানটি খেয়াল করতে হবে - একটি 'এল' ব্যবহার করে সিগনালিং)। পুরুষটি প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই এর রং পরিবর্তন করছে সেটি আপনি দেখতে পারবেন। এর কয়েক সেকেন্ড পর, যখন স্ত্রী সদস্যটি পুরুষটি অন্য পাশে যায়, এটি তার আগের রঙের প্রদর্শনও সে অনুযায়ী বদলে ফেলে, যেন স্ত্রী সদস্যটি শুধুমাত্র তার দাগ কাটা বাদামী রঙের প্রজনন সঙ্গীদের আকর্ষণ করার আচরণের প্যাটার্নটি লক্ষ করতে পারে। সেফালোডরা তাদের চামড়ার পৃষ্ঠদেশের গঠনও পরিবর্তন করতে পারে, কখনোও সেটি খাঁজ অথবা কাটা, কিংবা বাইরে দিকে বেরিয়ে আসা কোনো স্ফীত উদ্ভেদের রুপ ধারণ করতে পারে।

আপনি 'অ্যানিমল ক্যামোফ্লেজ' লিখে ওয়েব সার্চ করে দেখুন, আপনি আরো শত শত প্রাণীদের উদাহরণ পাবেন যারা নিজেদের রক্ষা করতে বিস্ময়কর (একটি অর্থে বিস্ময়কর, অন্য ক্ষেত্রে হয়তো যার অর্থ এর বিপরীত) ক্যামোফ্লেজ বা কুটবেশ ব্যবহার করে: মাকড়শা, ব্যাঙ, পাখি এবং সর্বোপরি কীটপতঙ্গ (ছবি ৮ কিছু উদাহরণ দেখাচ্ছে)। আর এ ধরনের কুটবেশ ধারণ করার ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর প্রতি তাদের সতর্কতা আসলেই বিস্মিত করে। প্রতিটি দেখতে যেন মনে হয় বিস্ময়কর প্রতিভাবান কোনো সৃজনশীল শিল্পীর কাজ। আর 'সৃজনশীল' শব্দটি আবার আমাকে এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের কাছে নিয়ে আসে। কোনো একটি প্রাণী বা উদ্ভিদ সংক্রান্ত সবকিছু, প্রত্যেকটি প্রজাতির প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়গুলো দেখলে আমরা অভিভূত করে দেবার মত একটি অনুভূতি দ্বারা প্ররোচিত হই – নিশ্চয়ই এগুলো কেউ একজন ডিজাইন বা পরিকল্পনা করে সৃষ্টি করেছেন। এবং ভ্রান্তভাবেই বহু শতাব্দী ধরে মানুষ এই কৃতিত্বটিকে দিয়েছিল প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত অগণিত দেব-দেবী-ঈশ্বরের কোনো না কোনো একজনকে, অথবা ঈশ্বর বা দেব-দেবী নয় বরং অজ্ঞাতনামা কোনো সৃষ্টিকর্তাকে।

ক্যামোফ্লেজের চেয়ে আমার কাছে এমনকি আরো বেশি আকর্ষণীয় আর মুগ্ধ করার মত বিষয়টি হচ্ছে প্রতিটি জীবন্ত শরীরের অবিশ্বাস্য মাত্রার জটিলতা। চোখ নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা তার খানিকটা ধারণা পেয়েছিলাম। আপনার মস্তিষ্ক এমনকি তার চেয়েও আরো বেশি বিস্ময়কর। মস্তিষ্কে প্রায় ১০০ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ (নিউরোন) আছে, গাছের মূলের মত বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত এই কোষগুলো (পাশের ছবিটি লক্ষ করুন) পরস্পরের সাথে এমন একটি উপায়ে যুক্ত থাকে যে, এর পরিণতিতে আপনি চিন্তা করতে আর দেখতে, ভালোবাসতে আর ঘৃণা করতে পারেন, বন্ধুদের নিয়ে কোনো পার্টির পরিকল্পনা করতে পারেন, কিংবা সবুজ রঙের দানবীয় কোনো জলহস্তী কল্পনা করতে পারেন এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারেন।

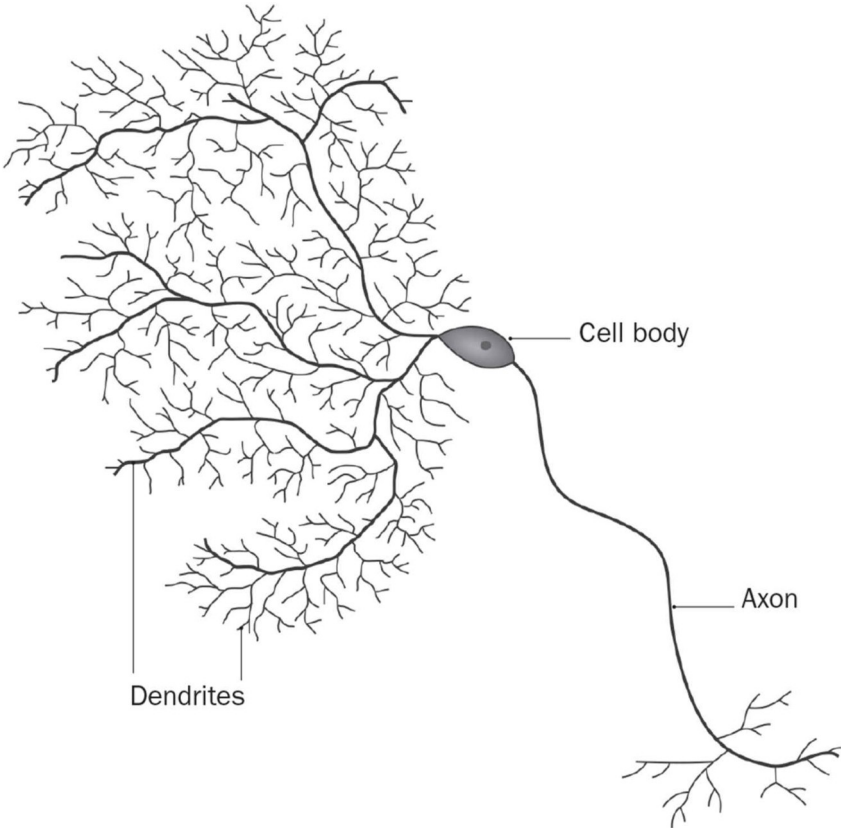

এই পৃষ্ঠায় রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো চিহ্নিত করা একটি ডায়াগ্রাম আছে, যা আপনার শরীরে একটি একক কোষের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে (আর সব মিলিয়ে আপনার শরীরে ৩০ ট্রিলিয়নেরও বেশি কোষ আছে)। ছবির ক্ষুদ্র বিন্দুগুলো রাসায়নিক পদার্থ, আর যে রেখাগুলো তাদের সংযোগ করেছে সেগুলো তাদের মধ্যকার রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে। বিস্তারিত নানা লেবেল নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই, কিন্তু যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো এরা চিহ্নিত করছে, সেগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায়, আপনি মারা যাবেন।

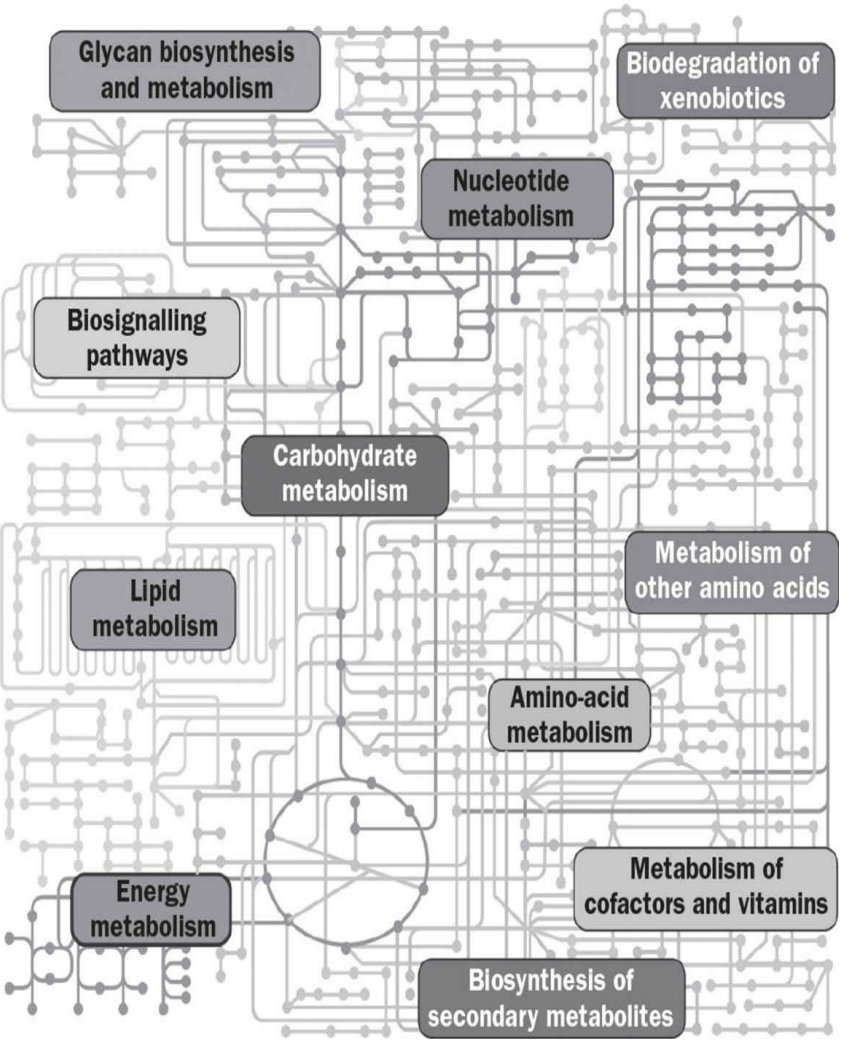

এবার আপনার শরীরের শুধুমাত্র একটি অণুর কথা ভাবুন, হিমোগ্লোবিন। এই অণুটির কারণে আপনার রক্ত লাল এবং ফুসফুস থেকে যেখানে প্রয়োজন, যেমন দ্রুত দৌড়ানো কোনো চিতা অথবা গ্যাজেলে স্পন্দনরত পায়ের মাংসপেশী, সেখানে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যাবার জন্য এটি একান্ত প্রয়োজনীয়। ছয় হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়নের চেয়ে বেশি সংখ্যক হিমোগ্লোবিন অণু এই মুহূর্তে আপনার রক্তে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আগের একটি বইয়ে আমি একবার হিসাব করেছিলাম (এটি মনে হয়ছিল হাস্যকরভাবে উচ্চ একটি সংখ্য, কিন্তু কেউই সংখ্যাটির বিরোধিতা করেননি) যে, কোনো মানব শরীরে প্রতি সেকেন্ডে চারশত মিলিয়ন মিলিয়ন হিমোগ্লোবিন অণু সৃষ্টি হচ্ছে, এবং একই হারে অন্য ব্যবহৃত হিমোগ্লোবিন অণুগুলোও ধ্বংস হচ্ছে।

বিস্মিত করার মত জটিলতা। আরো একবার, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই সব জটিলতা ‘মাস্টার ডিজাইন’ বা প্রধান একজন পরিকল্পকের অস্তিত্ব দাবী করছে। কিন্তু আবারো বলছি, পরবর্তী অধ্যায়গুলো প্রদর্শন করবে যে আসলেই এমন কোনো পরিকল্পকের অস্তিত্ব দাবী করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। আর সেটি আসলেই বেশ বড় একটি চ্যালেঞ্জ। আর যদি পুনরাবৃত্তি করি - এ অধ্যায়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার কোনো পদক্ষেপ নেবার ‘আগে’ মূল চ্যালেঞ্জটি আসলেই কত বড় সেটি প্রদর্শন করা।

সৌন্দর্য একই ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে উপস্থাপন করে। পুরুষ ময়ুরপুচ্ছের দ্যুতিময় সৌন্দর্য - মূলত যা কাঠামোগত ‘ইরিডিসেন্ট’ রঞ্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয় - প্রজাতির স্ত্রী সদস্যদের আকৃষ্ট করতে ভূমিকা পালন করে। আমরা এমনকি বলতে পারি এটি সৌন্দর্যের খাতিরেই শুধুমাত্র সৌন্দর্য। কিন্তু সৌন্দর্য ‘কার্যকর’ হতে পারে: উপযোগী। আমি মনে করি উড়োজাহাজগুলো সুন্দর, আর চমৎকারভাবে পরিকল্পিত সুসম আকারের কারণেই তাদের সৌন্দর্য এসেছে। উড়ন্ত পাখি যেমন সুন্দর ঠিক একই কারণে। তেমনই সুন্দর দৌড়ানো চিতা, যদিও আমি মনে করি না যে, গ্যাজেলরা সেটি সুন্দর ভাবে।

এই অধ্যায়টি হয়তো আপনাকে এমন কোনো একটি ধারণা দিতে পারে যে, জীবিত সব কিছুর ‘ডিজাইন’ হচ্ছে ত্রুটিহীন। শুধুমাত্র সুন্দরই নয় বরং উদ্দেশ্য পূরণে আদর্শভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর সেই উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন - যেমন, কোনো কিছু দেখা, শরীরের রং পরিবর্তন করা, শিকার ধরতে দ্রুত দৌড়ানোর দক্ষতা, অথবা শিকার না হবার জন্যে দ্রুত দৌড়ে পালানোর ক্ষমতা, গাছের বাকলের রঙের সাথে মিশে যাওয়া, স্ত্রী ময়ুরদের কাছে অপ্রতিরোধ্যভাবে

আকর্ষণীয় হয়ে ওঠা ইত্যাদি। আর যদি এই অধ্যায়টি আপনার মনে ত্রুটিহীনতার কোনো ধারণা দিয়ে থাকে, আপনাকে আমার খানিকটা হতাশ করতে হবে। বিশেষ করে যখন আপনি জীবন্ত প্রাণীদের চামড়ার নিচে তাকাবেন, আপনি বহু ত্রুটি লক্ষ করতে পারবেন, আর এগুলো আসলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সত্য উন্মোচন করে। এগুলো যে বিষয়টি উন্মোচন করে সেটি হচ্ছে বিবর্তনীয় ইতিহাস। আর এসব ত্রুটি অবশ্যই আপনি দেখার প্রত্যাশা করতেন না, যদি কোনো বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ সত্তা সেগুলো ডিজাইন বা পরিকল্পনা করে সৃষ্টি করতেন। বাস্তবিকভাবে কিছু ত্রুটি ঠিক এর বিপরীত।

বহু প্রজাতির মাছ সমুদ্র তলদেশে তাদের জীবন কাটায় এবং তাদের শরীরগুলো চ্যাপটা। আর চ্যাপটা হবার দুটি উপায় আছে। স্পষ্ট একটি উপায় হচ্ছে, আপনার পেটের ওপর শোয়া এবং উপর থেকে নীচে আপনার শরীরটাকে চ্যাপটা করা, সুতরাং শরীর চারদিকে প্রশস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, এটাই ঠিক স্কেট আর রে মাছগুলো তাদের শরীরের সাথে করেছে। আপনি হয়তো তাদের হাঙর ভাবতেন পারেন, যাদের উপর দিয়ে বাগানের মাটি সমান করার কোনো ভারী রোলার গড়িয়ে চলে গেছে। কিন্তু প্লেস, সোল আর ফ্লাউন্ডার মাছ তাদের শরীরকে চ্যাপটা করেছে ভিন্ন একটি উপায়ে। তারা একটি পাশে কাত হয়ে শোয়। কখনো বাম আর কখনো ডান দিনে, কিন্ত কখনোই তারা স্কেট মাছদের মত তাদের পেটের উপর শোয় না।

আপনার নিশ্চয়ই হয়তো মনে হয়েছে এভাবে এক পাশে কাত হয়ে শোয়ার কিছু সমস্যা আছে যদি আপনি মাছ হয়ে থাকেন। আপনার চোখগুলোর একটি তখন সমুদ্রের তলদেশ বরাবর ঘোরানো থাকবে, আর সেই কারণে সেই চোখটি মোটামুটিভাবে কোনো কাজে আসে না। স্কেট আর রে মাছের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কারণ তাদের চোখগুলো থাকে তাদের চ্যাপটা মাথার উপরে এবং দেখার জন্য দুটোই উপযোগী।

প্লেস আর ফ্ল্যাউন্ডার মাছ তাহলে কীভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করেছিল? এই মাছগুলো একটি বিকৃত, মোচড়ানো মাথার খুলি বিবর্তিত করেছিল, যেন একটি চোখ সমুদ্র তলদেশ বরাবর চ্যাপটা হয়ে না থেকে দুটো চোখই উপর দিক বরাবর দেখতে সক্ষম এমন একটি অবস্থানে সরে আসে। আর আমি আসলেই বিকৃত আর মোচড়ানো খুলি বোঝাতে চেয়েছি (ছবি ৭ দেখুন)। কাণ্ডজ্ঞান আছে এমন কোনো পরিকল্পকই এই ধরনের কোনো সজ্জা সৃষ্টি করবেন না। ডিজাইন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে এর কোনো অর্থ নেই কিন্তু এই পিকাসো সদৃশ মুখে এর বিবর্তনীয় ইতিহাসের ছাপ সুস্পষ্ট। স্কেট বা

রে মাছদের হাঙ্গর পুর্বসূরির ব্যতিক্রম এইসব ফ্ল্যাটফিশ মাছদের পুর্বসূরিদের আকার ছিল হেরিংস মাছের মত, একটি উল্লম্ব ছুরি ফলা। তাদের বাম চোখ বাম দিকে আর ডান চোখ ডানদিকে - প্রতিসমরূপে, একজন ভালো ডিজাইনার হয়তো যেভাবে পছন্দ করতে পারেন। সমুদ্র তলদেশে বসবাস করতে যখন তারা জীবন যাপনের উপায় পরিবর্তন করেছিল, তারা আবার একেবারে শুরুতে, ডিজাইনের সেই ড্রইং-বোর্ডে ফিরে যেতে পারেনি, যেভাবে সাধারণত কোনো ডিজাইনার হয়তো করতেন। এর পরিবর্তে সেখানে ইতোমধ্যে যা কিছু আছে সেটিকে তাদের প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে নিতে হয়েছিল। আর সেই কারণেই এই বিকৃত মাথা।

আরো একটি বিখ্যাত উদাহরণ উল্লেখ করছি যা সত্য উন্মোচন করার মতোই একটি ত্রুটি: আপনার চোখের রেটিনা (বা অক্ষিপট)। এটি পেছন থেকে সামনে অর্থাৎ উল্টো করে সাজানো। সব মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি একই। আমি ইতোমধ্যেই বর্ণনা করেছি যে, রেটিনা হচ্ছে আলোক সংবেদী কোষের (রড এবং কোন) - ফটোসেল- একটি পর্দা। আর স্নায়ুকোষের মাধ্যমে এই সব আলোক-সংবেদি কোষ মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত থাকে। মস্তিষ্কের সাথে স্নায়ুকোষগুলোকে যুক্ত করার একটি যুক্তিসম্মত ব্যবহারসিদ্ধ উপায় হচ্ছে অক্টোপাসের মত সেফালোপডদের চোখে যে উপায়টি আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি। স্নায়ুকোষের তন্তুগুলো (বা তাদের 'তার') যা আলোক-সংবেদী (ফটোসেল) কোষ আর মস্তিষ্ককে যুক্ত করে, সেগুলো রেটিনার পেছন দিক দিয়ে যথোচিত একটি উপায়ে বের হয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেটিনায় সমতুল্য স্নায়তন্তু কিন্তু এভাবে রেটিনা থেকে বের হয়ে আসে না। এখানে প্রতিটি ফটোসেলের সাথে স্নায়ুতন্তু যুক্ত পেছন দিকে অর্থাৎ উল্টোভাবে যুক্ত থাকে। এখানে প্রতিটি ফটোসেল আলোর বিপরীত দিকে মুখ করে সজ্জিত। তাহলে কীভাবে সেই 'তার' বা স্নায়ুতন্তুগুলো স্নায়ুকোষ থেকে শুরু করে মস্তিষ্কে পৌঁছাতে সক্ষম হয়? আলোক-সংবেদী কোষ থেকে তথ্য বহন করে রেটিনার পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়ে এগুলো অতিক্রম করে সব স্নায়ুতন্তুগুলো একত্রে জড়ো হয় রেটিনার মধ্যবর্তী এটি জায়গায়, যেখানে এটি রেটিনার ভিতরে প্রবেশ করে মস্তিষ্কের দিকে চলে যায় (নীচের ডায়াগ্রামটি দেখুন)।

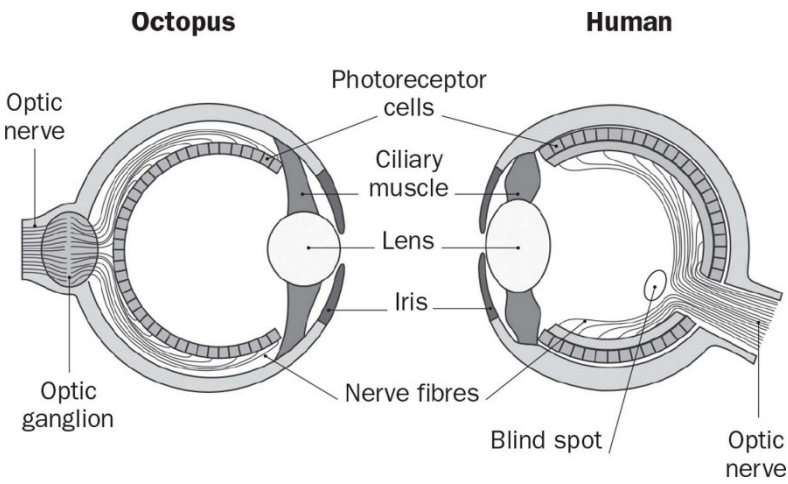

আর যেখানে তারা রেটিনায় প্রবেশ করে বা ডুব দেয়, সেটিকে বলা হয় - 'ব্লাইন্ড স্পট'। আর নামটি বিস্ময়কর নয়, কারণ এই অংশটি অন্ধ। কী হাস্যকর একটি সজ্জা! বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হেরমান ফন হেমহোল্টস (যিনি একই সাথে চিকিৎসক এবং একজন পথিকৃৎ পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন) বলেছিলেন, যদি কোনো 'ডিজাইনার' তাকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চোখ উপহার দিতেন, তিনি সেটি ফেরত পাঠাতেন। আসলেই যদিও খুব যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে তিনি এই কাজটি যুক্তিযুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু এটি স্পষ্টতই ভালোবভাবেই কাজ করে, যেভাবে আমরা সবাই দেখতে পারছি! রেটিনার উপর দিয়ে প্রবাহমান স্নায়ুকোষের স্তরটি বেশ পাতলা, এবং আলো প্রবেশ করতে দেবার জন্য সেগুলো যথেষ্ট পরিমানে স্বচ্ছ।

খারাপ ডিজাইনগুলোর ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে প্রিয় উদাহরণ হচ্ছে 'রিকারেন্ট ল্যারিন্জিয়াল নার্ভ'। ল্যারিঙ্কস হচ্ছে স্বরযন্ত্র বা ভয়েসবক্স, যার অবস্থান আমাদের গলার উপরের অংশে। মস্তিষ্ক থেকে আসা 'ল্যারিন্জিয়াল' নামের দুটি স্নায়ু এটিকে স্নায়ু সংযোগ দেয়। এর মধ্যে একটি সুপিরিয়র ল্যারিন্জিয়াল স্নায়ু যুক্তিসঙ্গত উপায়ে সরাসরি মস্তিষ্ক থেকে স্বরযন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকে। তবে অন্যটি - 'রিকারেন্ট ল্যারিন্জিয়াল' স্নায়ুটি আসলেই অদ্ভুত কাণ্ড করে। এটি মস্তিষ্ক থেকে ল্যারিঙ্কসের (যেখানে এটির যুক্ত হবার কথা) ঠিক পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসে সরাসরি বুকের মধ্য নেমে আসে এখানে এটি হৃৎপিণ্ডের সাথে যুক্ত থাকা প্রধান ধমনীগুলোর একটির নীচে প্যাচ খেয়ে সরাসরি আবার ঘাড়ের ভিতরে উঠে আসে এবং অবশেষে স্বরযন্ত্রে এর যাত্রা শেষ করে। মস্তিষ্ক থেকে নীচে নামার পথে যেখানে এটির থামার কথা ছিল। জিরাফের কথা ভাবুন,

সেখানে এ ঘুরপথটি বেশ দীর্ঘ। আমি এটি স্বচক্ষে দেখেছিলাম যখন টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানের জন্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে চিড়িয়াখানায় মারা যাওয়া একটি জিরাফ ব্যবচ্ছেদ করার সময় আমি সহায়তা করেছিলাম।

আরো একবার, স্পষ্টতই এটি খারাপ একটি ডিজাইন, কিন্তু এটি সম্পূর্ণভাবেই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে যদি আপনি বিবর্তনীয় ইতিহাসের দিকে তাকান। আমাদের পূর্বসূরি প্রাণীরা ছিল মাছ। মাছদের কোনো ঘাড় নেই। রিকারেন্ট ল্যারিন্জিয়াল স্নায়ুর মৎস সংস্করণটি এ ধরনের 'রিকারেন্ট' বা অযথা ঘুরপথ নেয় না এর গন্তব্যে পৌঁছাতে। এটি মাছের একটি ফুলকায় স্নায়ু সংযোগ দেয়। আর মস্তিষ্ক থেকে ফুলকায় পৌছানোর জন্যে সবচেয়ে সরাসরি পথ হচ্ছে সমতূল্য ধমনীর পেছন দিয়ে সে পথটি পাড়ি দেয়া। এটি আদৌ একটি ঘুরপথ নয়। ইতিহাসের পরবর্তী ধাপে যখন ঘাড় ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ হতে শুরু করেছিল তখন স্নায়ুটিও খানিকটা ঘুরপথ নিতে শুরু করেছিল। প্রজন্মান্তরে যখন ক্রমান্বয়ে ঘাড়ের দৈর্ঘ্য বেড়েছে, এই ঘুরপথটিও ক্রমশ দীর্ঘায়িত হয়েছে। এমনকি যখন এ ঘুরপথ অদ্ভুতভাবেই দীর্ঘ পথ নিয়েছিল জিরাফদের পূর্বসূরির শরীরে, এর কারণ হচ্ছে বিবর্তনীয় পরিবর্তন যেভাবে কাজ করে (পরের অধ্যায়ে আমরা সেটি দেখবো)। ধমনীর উপর দিয়ে লাফ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে এর যাত্রাপথ পরিবর্তন করার বদলে এটি ক্রমশ দীর্ঘ হওয়া অব্যাহত রেখেছিল। একজন ডিজাইনার এই স্নায়ুটিকে এক পলক দেখলেই অনুধাবন করতেন যে এটি স্বরযন্ত্রের খুব নিকট দিয়ে পাশ কাটিয়ে দীর্ঘ ঘাড় বেয়ে নীচে নেমে গেছে এবং তিনি বলতেন, 'এক মিনিট, এটি অদ্ভুত হাস্যকর একটি কাজ করেছে'। আবারো, একজন হেমহোল্টস এটিকে হয়তো এর ডিজাইনারের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। একই ঘটনা ঘটেছে সেই নালিকাটির সাথেও যা আমাদের শুক্রাণুগুলোকে অণ্ডকোষ থেকে পুরুষাঙ্গে বহন করে নিয়ে আসে। সরাসরি একটি পথ অনুসরণ না করে প্রথমে এটি পেটের মধ্যে প্রবেশ করেছে তারপর কিডনী থেকে মুত্রথলিতে মুত্র বহন করা মূত্রনালীর উপর দিয়ে একটি প্যাচ খেয়ে নীচে নেমে আসে, আবারো এই ঘুরপথ অর্থবহ হয় যদি শুধুমাত্র আপনি এর বিবর্তনীয় ইতিহাসটি লক্ষ করেন।

'আমাদের সারা শরীরে ইতিহাস লেখা আছে' - আমি এই বাক্যটি পছন্দ করি। আমাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে, আমাদের চামড়ায় শিহরণ সৃষ্টি হয়, চামড়ার পশমের গোড়াগুলো ফুলে ওঠে (যাকে বলে গুজবাম্পস), এর কারণ আমাদের পূর্বসূরিরা লোমশ ছিল, যখন তাদের ঠাণ্ডা লাগতো প্রতিটি চুল খাড়া হয়ে চুলের নীচে আটকে থাকা বাতাসের স্তরটিকে আরো পুরু করে তুলতো, যা আমাদের উষ্ণ থাকতে সহায়তা করতো। অনেকটা আরেকটা সোয়েটার গায়ে দেবার মত।

সারা দেহে আমরা আর সেরকম লোমশ নই, কিন্তু চুল খাড়া করার সেই মাংসপেশীটি এখনো আছে সেখানে। এবং সেগুলো এখনো, যদিও কাজে আসেন না, শীতের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায় অস্তিত্ব নেই এমন চুলকে খাড়া করে তোলার মাধ্যমে। আমাদের লোমশ ইতিহাস আমাদের নগ্ন ত্বকে সর্বত্র লেখা আছে। লেখা আছে চুল খাড়া হয়ে যাবার সে শিহরণের অনুভূতিতে।

এই অধ্যায়টি শেষ করতে, আমি আবার সেই চিতা আর গ্যাজেলের দৃশ্যে ফিরে যেতে চাই। যদি ঈশ্বর চিতাকে তৈরি করে থাকেন, তিনি স্পষ্টতই একটি অসাধারণ খুনে শিকারী প্রাণী সৃষ্টি করার জন্য প্রচুর পরিমানে সতর্ক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন: দ্রুত গতি, হিংস্র, তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি, ধারালো নোখ আর দাঁত, আর একটি মস্তিষ্ক যা নিষ্ঠুরভাবে গ্যাজেল হত্যা করার জন্য নিবেদিত। কিন্তু সেই একই ঈশ্বর আবার এর শিকার গ্যাজেল সৃষ্টি করতে সমপরিমান প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন । এবং একই সময় যখন কিনা তিনি গ্যাজেলদের হত্যা করতে চিতাদের পরিকল্পনা করেছেন, তিনি অন্যদিকে চিতাদের আক্রমণ থেকে পালাতে দক্ষ গ্যাজেল পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দুজনকেই দ্রুত গতি দিয়েছেন, যেন তারা পরস্পরের গতি মোকাবেলা করতে পারে। আপনি এখানে না ভেবে পারবেন না, আসলেই ঈশ্বর কার 'দিকে', কাকে তিনি সমর্থন করছেন? স্পষ্টতই মনে হবে দুটি প্রাণীর জন্যই তিনি যন্ত্রণা জমা করে রেখেছেন। তিনি কী তাহলে শিকার-শিকারীর এই ধরনের ক্রীড়া উপভোগ করেন? খুবই ভয়ঙ্কর মনে হবে না এমন কিছু ভাবা যে, ঈশ্বর আতঙ্কিত কোনো গ্যাজেলকে তার প্রাণ রক্ষা করতে পালানো দেখে উপভোগ করছেন, তারপর তিনি দেখছেন কীভাবে চিতাবাঘ এটিকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়, তারপর এত জোরে এর গলা কামড়ে ধরে যে এটি আর শ্বাস নিতে পারে না? নাকি তিনি শিকার ধরতে ব্যর্থ হওয়া চিতাদের দেখতে পছন্দ করেন, যে চিতাগুলো করুণভাবে ক্রন্দনরত তার শাবকদের নিয়ে অভুক্ত অনাহারে ধীরে মৃত্যুর কাছে পরাজিত হয়?

অবশ্যই কোনো নিরীশ্বরবাদীর কাছে এসব কিছু কোনো সমস্যা উপস্থাপন করে না, কারণ আমরা দেব-দেবী/ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। আতঙ্কিত কোনো গ্যাজেলকে দেখে অথবা অভুক্ত চিতা এবং চিতা-শাবকদের জন্য করুণা অনুভব করার স্বাধীনতা যদিও আমাদের আছে। কিন্তু আমরা তাদের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে সমস্যায় পড়ি না। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ডারউইনীয় বিবর্তন এটি, এবং জীবন সংক্রান্ত বাকি সব কিছু খুব ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করে । আমরা পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে সেটি দেখবো।

৮ ধাপে ধাপে অসম্ভাব্যতা অভিমুখে

গত অধ্যায়টি সুন্দরভাবে তৈরি, অদ্ভুতভাবেই ত্রুটিহীন রঙের বিন্যাস প্রদর্শনকারী অথবা তাদের টিকে থাকার জন্য সহায়ক স্পষ্টত এমন বহু বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ কর্মকাণ্ড করা প্রাণীদের নানা বিস্ময়কর উদাহরণে পুর্ণ ছিল। প্রতিটি উদাহরণের পরেই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম: একজন ডিজাইনার, একজন সৃষ্টিকর্তা, একজন প্রাজ্ঞ ঈশ্বরের কী অবশ্যই থাকার কথা নয়, যিনি এগুলো পরিকল্পনা করেছেন এবং বাস্তব অস্তিত্ব দিয়েছেন? ঐসব উদাহরণগুলো মধ্যে বিশেষভাবে ঠিক কোনো বিষয়টি - আর এই পৃথিবীতে কখনো বেঁচে ছিল এমন প্রতিটি প্রাণী আর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আপনি একই কাহিনী বলতে পারবেন – যা কাউকে আবশ্যিকভাবে একজন ডিজাইনারের অস্তিত্ব থাকার কথা ভাবতে বাধ্য করে? এই উত্তরটি হচ্ছে 'অসম্ভাব্যতা', এবং আমি শব্দটি দিয়ে আমি কী বোঝাতে চাইছি এখন সেটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

যখন আমরা কোনো কিছুকে অসম্ভাব্য বা অভাবনীয় বলি, তখন আমরা বোঝাতে চাই শুধু র‍্যানডোম চান্স (র‍্যানডোম শব্দটি জীববিজ্ঞানে পরিকল্পনাহীন, কোনো বিশেষ বিন্যাসের অনুপস্থিতি বোঝায়, আর চান্স শব্দটি মূলত বোঝায় ঘটনাটি কোনো পূর্বপরিকল্পিত বা পূর্বনির্ধারিত কারণে ঘটেনি, অনির্নীত সম্ভাবনার মাধ্যমে কিছু ঘটা) বা দৈবক্রমে এমন কিছু ঘটা খুবই অসম্ভাবনীয়। আপনি যদি দশটি পেনি হাতে নিয়ে ভালো করে ঝাকিয়ে সেগুলোকে কোনো টেবিলের উপর ছুড়ে মারেন, আপনি খুবই অবাক হবেন যদি সেই দশটি পেনির প্রত্যেকটির 'হেড' একই সাথে পড়ে। এটি হতে পারে, তবে সেটি হবার সম্ভাবনা খুবই কম (যদি গণিত পছন্দ করেন তাহলে হয়তো আপনি গণিত ব্যবহার করে সমাধান করতে পারবেন যে এমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা ঠিক কী পরিমানে কম, কিন্তু আমি আপাতত এ সম্ভাবনা খুবই কম বলেই সন্তুষ্ট)। এবং কেউ যদি সে একই কাজটি ১০০ পেনি নিয়ে করেন, যদিও তখনো সম্ভাবনা আছে যে ১০০ টি পেনির সবগুলোর একসাথেই হেড পড়বে। কিন্তু তেমন কিছু হবার সম্ভাবনা খুব বেশি মাত্রায় অসম্ভাব্য, আর তেমন কিছু ঘটলে আপনি হয়তো কোনো কারসাজি সন্দেহ করতে পারেন, এবং আপনি সঠিক প্রমাণিত হবেন। আমি আমার যা কিছু আছে সে সবকিছুই বাজি রাখতে পারি দাবি করে যে, এমন কিছু অবশ্যই হাত সাফাইয়ের কাজ হতে বাধ্য।

পেনি ছুড়ে মারার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ফলাফল না পাবার সম্ভাবনার পরিমান পরিমাপ করার বিষয়টি সহজ, বা অন্ততপক্ষে সুস্পষ্ট। কিন্তু মানব চোখ, অথবা চিতার হৃৎপিণ্ডের মত কোনো কিছুর অসম্ভাব্যতার বিষয়টি আমরা গণিত

ব্যবহার করে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারবো না, যেভাবে আমরা পেনির সাথে করে থাকি। কিন্তু আমরা বলতে পারি এটি খুবই বেশি মাত্রায় অসম্ভাব্য। চোখ বা হৃৎপিণ্ডের মত কোনো কিছু শুধু দৈবক্রমে সৃষ্টি হতে পারেনা। আর এই 'অসম্ভাব্যতা' বিষয়টি মানুষকে ভাবতে প্ররোচিত করে যে, নিশ্চয়ই সেগুলো পরিকল্পনা মাধ্যমে সৃষ্ট। আর আমার কাজ হচ্ছে এই অধ্যায় এবং পরবর্তী কিছু অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা, কেন এভাবে চিন্তা করা ভুল। আসলেই কোনো ডিজাইনার বা পরিকল্পক নেই। সেই অসম্ভাব্যতার বিষয়টি অপসারিত হয় না, বরং রয়ে যায়, যখন আমরা চোখের অসম্ভাব্যতা নিয়ে কথা বলি, কিংবা একটি চোখের ডিজাইন করতে সক্ষম এমন কোনো সৃষ্টিকর্তার অসম্ভাব্যতা নিয়ে কথা বলি। এই অসম্ভাব্য জিনিসগুলো কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে সে সমস্যাটির অবশ্যই ভিন্ন কোনো সমাধান থাকতে হবে। আর সে সমাধানটি আমাদের দিয়েছিলেন চার্লস ডারউইন।

একটি জীবিত শরীরের জন্যে, কোনো পেনি টস করার মত কাজের সমতূল্য হয়তো হতে পারে একটি চোখের নানা ক্ষুদ্রাংশের এলোমেলো একটি মিশ্রণ ছুড়ে মারা। লেন্স হয়তো চোখের সামনে না বসে পেছনে গিয়ে বসতে পারে। লেন্সের পেছনে না থেকে রেটিনা কর্নিয়ার সামনে অবস্থান করতে পারে, আইরিশ পর্দাটি বন্ধ হতে পারে যখন অন্ধকার এবং খুলতে পারে যখন আলো থাকে, যুক্তিসঙ্গতভাবে এর বিপরীত প্রক্রিয়াটির বদলে। অথবা এটি খুলতে পারে কোনো একটি ট্রাম্পেটের আওয়াজ শুনলে আর বন্ধ হতে পারে যখন আপনি পেয়াজের গন্ধ শুকবেন। স্বচ্ছ বর্ণহীন হবার লেন্স কৃষ্ণ বর্ণের হতে পারে এবং যা কোনো আলো ভিতরে প্রবেশ করতে নাও দিতে পারে। এমনকি একটি রেটিনা অথবা আইরিস ডায়াফ্রাম না থাকারও সম্ভাবনা আছে যদি আপনি কোনো নির্দেশনাহীনভাবে এসব খণ্ডাংশগুলোকে একত্রে যুক্ত করার চেষ্টা করেন।

অথবা কল্পনা করুন নির্দেশনাহীন এলোমেলোভাবে নানা অংশ যুক্ত করে তৈরি করা একটি চিতা। এর চারটি পা একদিকে থাকতে পারে, সুতরাং বারবারই এটি এক পাশে কাত হয়ে পড়ে যেতে পারে। এর পেছনের পা দুটি শরীরের সাথে হয়তো উল্টোভাবে যুক্ত হতে পারে, সুতরাং সেগুলো বিপরীত দিক বরাবর লাফাতে পারে সামনে পায়ের তুলনায়, এবং নিজেকে দ্বিবিভাজিত করার চেষ্টা করা ছাদা চিতা সামনে বা পিছনে কোনো দিক বরাবরই অগ্রসর হতে পারবে না । হৃৎপিণ্ডটি যুক্ত হতে পারে শ্বাসনালীর সাথে, সুতরাং এটি রক্তের বদলে

বাতাস পাম্প করতে পারে। মুখের বদলে এই চিতার পিঠে দাঁত থাকতে পারে। আর পুরোপুরিভাবে এই জট পাকানো চিতা পা, হৃৎপিণ্ড অথবা দাঁত কোনো কিছুই নাও থাকতে পারে, এটি বিশৃঙ্খল একটি মিশ্রণ হতে পারে: চিতার একটি ঘণ তরল।

আমি নিশ্চিত যে আপনি বুঝতে পরেছেন এটি আসলেই হাস্যকর। একটি চিতা ক্ষুদ্রাংশগুলো আপনি অসীম সংখ্যক উপায়ে যুক্ত করতে পারেন এবং যে উপায়গুলোর মধ্যে শুধুমাত্র খুব সামান্য কয়েকটি উপায়ে সৃষ্ট চিতা হয়তো দৌড়াতে, অথবা দেখতে অথবা সন্তানের জন্ম দিতে অথবা আসলেই বেঁচে থাকতে পারবে। কোনো একটি ক্যামেলিয়নের ক্ষুদ্রাংশগুলোকে আপনি অসীম সংখ্যক উপায় যুক্ত করতে পারবেন এবং সেগুলোর মধ্যে খুবই অল্প কয়েকটি হয়তো কোনো পোকা বরাবর এর জিহবা নিক্ষেপ করতে পারে। বিষয়টি সম্পুর্ণভাবেই সুস্পষ্ট - প্রাণী এবং উদ্ভিদরা নির্দেশনাহীন উপায়ে দৈবক্রমে সৃষ্টি হতে পারে না। চিতা এবং গ্যাজেল, ক্যামেলিয়নের ক্ষিপ্রগতির জিহবা, স্কুইডদের ক্রোমাটোফোর আর আইরিডোফোর আর লিউকোফোরের অন্য যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হোক না কেন, এটি 'র‍্যানডোম' কোনো 'চান্স' হতে পারে না। ঐসব বহু মিলিয়ন প্রাণী এবং উদ্ভিদের সত্যিকার ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, এটি দৈব্যক্রমে ঘটা বা ভাগ্য হতে পারে না। আমরা সবাই এই বিষয়ে একমত হতে পারি। বেশ, তাহলে এর বিকল্পটি কী?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই পর্যায়ে বহু মানুষই সরাসরি ভুল পথে ভাবতে শুরু করেন। তারা ভাবেন যে, র‍্যানডোম চান্স বা দৈবক্রমে বা ভাগ্যক্রমে কোনো কিছু ঘটার একটি বিকল্প হচ্ছে একজন ডিজাইনার - পরিকল্পক সৃষ্টিকর্তা। আর যদি আপনিও সেটি ভাবেন, তাহলে সেই ভাবনায় আপনার বহু সঙ্গী আছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চার্লস ডারউইন একটি ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির করার আগ পর্যন্ত প্রায় সবাই এটাই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এটি ছিল ভুল, ভুল, ভুল। এটি শুধুমাত্র ভুল বিকল্প নয়। এটি আদৌ কোনো বিকল্প হতে পারেনা।

রেভারেন্ড উইলিয়াম পেইলি ১৮০২ সালে তার 'ন্যাচারাল থিওলজি' বইটিতে এই ভুল যুক্তটি সবচেয়ে বিখ্যাতভাবে সূত্রবদ্ধ করে উপস্থাপন করেছিলেন। আর্চডিকন পেইলি বলেছিলেন, কল্পনা করুন আপনি ঘাস আর নানা গুল্মাবৃত পতিত একটি মাঠে হাটতে বের হয়েছেন এবং হঠাৎ করে আপনার পা একটি পাথরের টুকরায় ধাক্কা খেলো। আপনি লাথি মেরে সেই পাথর খণ্ডটিকে সরিয়ে দিয়ে দিলেন সামনে থেকে। পাথরটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়।

ঘটনাক্রমেই এটি সেখানে পড়ে ছিল এবং ঘটনাক্রমে এটি খসখসে, অনিয়মিতভাবে উঁচুনীচু এর আকৃতিতে। একটি পাথর শুধুমাত্র একটি পাথর। অন্য কোনো পাথর থেকে এটি কোনোভাবেই স্বতন্ত্র নয়। পেইলি বলেন, কিন্তু কল্পনা করুন, পাথর নয়, আপনার পা যদি পড়ে থাকা একটি ঘড়িতে হোচট খায়।

ঘড়ি বেশ জটিল একটি যন্ত্র। এর পেছনটা খুলুন, আপনি পরস্পর সংযুক্ত বহু কগহুইল, স্প্রিং, বহু ক্ষুদ্র স্ক্রুর একটি সুশৃঙ্খল সমাবেশ দেখতে পাবেন। (পেইলির সময় অবশ্যই বর্তমান সময়ের মতো আধুনিক ডিজিটাল হাতঘড়ি ছিল না: এটি সম্ভবত যান্ত্রিক সময় পরিমাপ কোনো যন্ত্র হতো, একটি সুন্দর আর দক্ষভাবে সৃষ্ট কাটার গতিসহ একটি পকেট ওয়াচ) এবং ঐসব পরস্পরযুক্ত ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশগুলো একত্রে কাজ করে উপযোগী একটি পরিণতি সৃষ্টি করে: এই ক্ষেত্রে সময় কত সেটি জানানো। পাথরের ব্যতিক্রম, একটি ঘড়ি শুধুমাত্র দৈবক্রমে সেখানে সৃষ্টি হতে পারে না। অবশ্যই বিস্তারিত একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী একজন (বা একাধিক) দক্ষ ঘড়িনির্মাতার হাতে এটি সৃষ্টি হয়।

অবশ্যই আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারছেন এ প্রস্তাবনাটি ব্যবহার করে পেইলি আসলে কোন দিকে অগ্রসর হতে চাইছেন। ঠিক যেভাবে কোনো একটি ঘড়ির অবশ্যই একজন ঘড়িনির্মাতা থাকেন, চোখের অবশ্যই এমন একজন চোখ-নির্মাতা থাকতে হবে, হৃৎপিণ্ডের অবশ্যই একজন হৃৎপিণ্ড -নির্মাতা থাকতে হবে ইত্যাদি। সম্ভাবনা আছে যে, পেইলি'র যুক্তি শুনে আপনি হয়তো আগের চেয়ে এখন আরো বেশি প্ররোচিত হয়েছেন। এমনকি শুনতে আরো বেশি অনিচ্ছুক যে, এটি ভুল এবং আসলেই একজন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই।

খণ্ডাংশগুলো একত্রে করে কিছু সৃষ্টি করার নিয়ে আমার যুক্তি প্রদর্শন করেছিল যে, জীবিত কোনো কিছুর সুন্দর অসম্ভাব্যতার অন্য যে ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন, সেটি অবশ্যই দৈবক্রমে ঘটতে পারে না - এটি অবশ্যই নির্দেশনাহীন ভাগ্যক্রমে সৃষ্ট কিছু নয়। আর অসম্ভাব্যতার 'অর্থ' মূলত সেটাই। কিন্তু এবার এই যুক্তির সাথে আমরা একটি ছোটো মোচড় যুক্ত করি। এটি খুব সামান্য হতে পারে, কিন্তু এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ: ডারউইনিয় মোচড়। ধরুন, সেই চিন্তার পরীক্ষার চিতাটির সবগুলো খণ্ডাংশ একত্রে নির্দেশনাহীনভাবে যুক্ত করে ও পরিণতে ভয়াবহ একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেয়ে আমরা প্রাণীটির শুধুমাত্র ক্ষুদ্র একটি অংশ পরিবর্তন

করি, আবারো অনির্দিষ্ট দিক বরাবর। এখানে মূল বক্তব্যটি হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র খুব অল্প পরিমানে এটি পরিবর্তন করবো। ধরুন, একটি চিতার জন্ম হলো যার নোখগুলো এর আগের প্রজন্মের নোখের চেয়ে খানিকটা বেশি দীর্ঘ। এখন কিন্তু আমরা সেই বিশৃঙ্খলভাবে গঠিত কোনো চিতা দেখছি না। আমরা এখন একটি জীবন্ত, শ্বাস নিতে সক্ষম, দৌড়াতে পারে এমন চিতাই পাচ্ছি। উদ্দেশ্যহীন একটি পরিবর্তন হয়েছে এর শরীরে, কিন্তু পরিবর্তনটি খুব সামান্য। এখন, বেশ সম্ভাবনা আছে যে এই সামান্য পরিবর্তন এর বাহক চিতাকে টিকে থাকার দক্ষতায় খানিকটা অদক্ষ করে তুলেছে। অথবা আরো খানিকটা বেশি দক্ষ করে তুলছে। হয়তো লম্বা নোখগুলো চিতাটিকে দৌড়াবার সময় আরো শক্তভাবে মাটি আঁকড়ে ধরতে সহায়তা করে, যা এটিকে আরো খানিকটা দ্রুত দৌড়াতে সহায়তা করতে পারে। ক্রীড়াবিদরা সাধারণত যে ধরনের তলে কাটাযুক্ত দৌড়াবার জুতার পরে থাকেন। সুতরাং এটি গ্যাজেল শিকার করতে পারে যা কিনা অন্যথায় কোনোমতে পালিয়ে যেতে পারতো। অথবা হয়তো এই নোখগুলো এর শিকারকে আরো শক্ত করে ধরতে সহায়তা করে, সুতরাং হাত গলিয়ে এটির পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে।

আর কীভাবে সেই চিতাটি খানিকটা দীর্ঘ নোখ পেতে পারে? চিতার জিনোমে কোথাও একটি জিন আছে যা নোখের আকৃতি এবং দৈর্ঘ্য কেমন হবে সেটি প্রভাবিত করে। একটি চিতা শাবক বাবা-মায়ের কাছ থেকে তার জিনগুলো সব উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। কিন্তু আমরা এখন একটি নতুন শাবককে নিয়ে কথা বলছি যার জিনোমে একটি জিন, যে জিনটি নোখের আকৃতি কেমন হবে তা প্রভাবিত করে, সেটি তার পিতামাতার সেই একই জিনের সংস্করণ থেকে খানিকটা ভিন্ন। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য কিংবা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি কিংবা বিন্যাস অনুসরণ না করেই এ জিনটি পরিবর্তনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। জিনটিতে ‘মিউটেশন’ বা পরিব্যক্তি (বা পরিবর্তন) হয়েছে। আর এই মিউটেশনের প্রক্রিয়াটি নিজেও উদ্দেশ্যহীন – মানে এটি বিশেষভাবে উন্নতির (যা জীবটির বেঁচে থাকা আর এর প্রজনন সাফল্য বাড়াবে) প্রতি নির্দেশিত নয়। অধিকাংশ পরিবর্তিত জিন, বাস্তবিকভাবেই, এর বাহকের জন্যে পরিস্থিতি আরো খারাপ করে তোলে। কিন্তু কিছু – যেমন আমাদের এই উদাহরণে খানিকটা দীর্ঘ নোখ – ঘটনাক্রমে এর বাহকের জন্য উপযোগী। এবং সে ক্ষেত্রে প্রাণী (অথবা উদ্ভিদ) যারা উপযোগী কোনো জিন ধারণ করে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি এবং পরিবর্তিত জিনটিসহ তাদের বাকি জিনগুলো প্রজননের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের শরীরে হস্তান্তরিত করার সম্ভাবনাও বেশি। আর ডারউইন এটাকেই

প্রাকৃতিক নির্বাচন বলেছিলেন (যদিও তিনি মিউটেশন শব্দটি তিনি ব্যবহার করেননি)।

একটি উদ্দেশ্যহীন মিউটেশন চিতার নোখটি ধারালো করার বদলে ভোতা করে দিতে পারে। যা হয়তো দৌড়ানো এবং শিকারকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম সুবিধা দেবে। পরিবর্তন যত কম হবে, ততই সেই সম্ভাবনাটি ৫০ শতাংশের নিকটবর্তী হতে থাকে যে, এটি একটি উন্নতি। আর কারণটি দেখতে, খুব বেশি বড় কোনো একটি পরিবর্তন কল্পনা করুন। ধরুন পরিবর্তিত নোখগুলো দৈর্ঘ্যে এক ফুট। এটি চিতাকে অপেক্ষাকৃত কম সফল করতে বাধ্য। দানবীয় নোখের কারণে এটি হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে এবং কোনো কিছু ধরার চেষ্টা করতে গেলে এগুলো হয়তো ভেঙ্গে যেতে পারে। 'যে-কোনো দিক বরাবর' কোনো বড় পরিবর্তন একই ভাবে প্রযোজ্য হবে। যদি হঠাৎ করে পা দুই গজ কিংবা মাত্র ছয় ইঞ্চি লম্বা হয়, চিতার মৃত্যু হবে খুব দ্রুত। এবার একটি ছোটো পরিবর্তনের কথা চিন্তা করুন, আবারো যে-কোনো দিক বরাবর। কল্পনা করুন একটি মিউটেশন যা খুবই ছোটো, এতই ছোটো যে চিতার শরীরের উপর এটি কোনো প্রভাবই ফেলে না। এমন কোনো পরিবর্তন যা সে প্রাণীর সফলতায় যে কোনো দিকে কোনো প্রভাব ফেলে না বললেই চলে। খুব ছোটো একটি পরিবর্তন, এতই ছোটো যে এটি প্রায় – যদিও পুরোপুরিভাবে নয় - শূন্য, এর প্রায় ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা আছে কোনো একটি উন্নতি হবার। যত বড় হবে পরিবর্তন, যে-কোনো দিকে, ততই বড় সম্ভাবনা আছে যে, এটি প্রাণীটির দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বড় ধরনের মিউটেশন বা পরিবর্তনগুলো এর বাহকের জন্য খারাপ। ছোটো মিউটেশনগুলো ভালো কিছু হবার সম্ভাবনার ৫০ শতাংশের কাছাকাছি অবস্থান করে।

ডারউইন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সফল মিউটেশনগুলো প্রায় সবসময়ই খুব ছোটো। কিন্তু যে মিউটেশনগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেন সেগুলো সাধারণত তুলনামূলকভাবে বেশ বড়, স্পষ্টতই যার কারণ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত ছোটো মিউটেশনগুলো শনাক্ত করা কঠিন। এবং বড় মিউটেশন, যে-কোনো দিক বরাবর, প্রায় সবসময়ই ক্ষতিকর, আর এটি কিছু মানুষকে বিবর্তনের ধারণাটি সন্দেহ করতে প্ররোচিত করেছে কারণ তারা মনে করেন টিকে থাকার জন্য মিউটেশনগুলো সবই খারাপ। এটি সত্য হতে পারে যে, ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করার মত মিউটেশনগুলো আকারে বড় এবং সেগুলো টিকে থাকার জন্যে খারাপ। কিন্তু ছোটো পরিবর্তনগুলো, সেগুলোই বিবর্তনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ।

ডারউইন তার পাঠকদের নির্বাচনের শক্তি অনুধাবন করতে প্ররোচিত করেছিলেন প্রথমে পরিচিত গৃহপালিতকরণ প্রক্রিয়ার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষ বন্য ঘোড়াকে বেশ কয়েক ডজন ব্রিড বা জাতে পরিবর্তিত করেছে। কিছু, যেমন 'কার্টহর্স' আর 'মেডিয়েভাল চার্জার্স' বন্য ঘোড়াদের তুলনায় আকারে বেশ বড়। আবার কিছু জাতের ঘোড়া, যেমন 'শেটল্যান্ড পনি' আর 'ফালাবেলাস' আকারে অনেক ছোটো। আমরা (অর্থাৎ আমাদের মানব পূর্বসূরিরা) পালাক্রমে আসা প্রতিটি প্রজন্মে আকারে সবচেয়ে বড় ঘোড়াগুলোর মধ্যে প্রজনন করিয়ে কার্টহাউস জাতের ঘোড়া সৃষ্টি করেছিলাম। আমরা ফালাবেলাম জাতটি সৃষ্টি করেছি ধারাবাহিক প্রজন্মে ছোটো আকৃতির সদস্যদের মধ্য প্রজনন ঘটিয়ে। প্রজন্মান্তরে নেকড়ে পূর্বসূরিদের থেকেই আমরা কুকরদের সবগুলো জাত সৃষ্টি করেছি। আমরা 'গ্রেট ডেন' আর 'আইরিশ উলফহাউন্ড' জাতের কুকুরগুলো সৃষ্টি করেছি ধারাবাহিকভাবে আসা প্রজন্মগুলোর মধ্য সবচেয়ে বড় আকারের সদস্যদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে। ধারাবাহিকভাবে প্রজাতির শুধুমাত্র ক্ষুদ্রতম সদস্যদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে 'চিহুয়াহুয়া' আর 'ইয়র্কি' জাতের কুকুরদের আমরা সৃষ্টি করেছি । খুবই সাধারণ বুনো একটি ফুল 'ওয়াইল্ড ক্যাবেজ' প্রজাতির উদ্ভিদ দিয়ে শুরু করে আমরা ব্রাসেলস স্প্রাউট, ফুলকপি, কেল, ব্রকোলি, কোলরাবি, এবং গাণিতিকভাবে সুন্দর রোমানেস্কো তৈরি করছি (ছবি ৯ দেখুন), মানব কৃষকরাই কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করার মাধ্যমে এসব সৃষ্টি করছে। কৃষক এবং উদ্যানপালক, কুকুর এবং কবুতর কৃত্রিম প্রজননকারীরা সবাই বহু শতাব্দী ধরেই নির্বাচনের ক্ষমতা সম্বন্ধে জানতেন।

ডারউইন যা অসধারণভাবে অনুধাবন করেছিলেন সেটি হচ্ছে, মানব নির্বাচক থাকার কোনো আবশ্যিকতা নেই। প্রকৃতি নিজে সেই কাজটি একাই করছে, এবং প্রকৃতি বহু শত মিলিয়ন বছর ধরেই এই কাজটি করছে। কিছু পরিবর্তিত জিন প্রাণীদের বাঁচতে ও প্রজনন সফল হতে সহায়তা করে। ঐ জিনগুলো সেই প্রজাতির জনগোষ্ঠীতে ক্রমশ সংখ্যায় বাড়তে থাকে। অন্য কিছু পরিবর্তিত জিন প্রজাতির সদস্যদের বাঁচা এবং প্রজনন সাফল্যে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে, আর সেই কারণে ঐ জিনগুলো জনগোষ্ঠীতে ক্রমশ সংখ্যায় কমতে থাকে এবং একটি পর্যায়ে জিনপুল থেকে পুরোপুরিভাবে অপসারিত হয়ে যায়। একটি নেকড়েকে 'হুইপেট' বা 'ভাইমারানের' জাতের কুকুরে রূপান্তরিত করতে শুধু অল্প কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছে। শুধুমাত্র একবার চিন্তা করে দেখুন এক মিলিয়ন শতাব্দী সময়ে কী পরিমান পরিবর্তন অর্জন করা সম্ভব হতে পারে । আমাদের পূর্বসূরিরা ছিল সমুদ্র থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসা মাছ - এরপর আরো তিন

মিলিয়ন শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এটি খুব বিশাল পরিমান একটি সময়, ধাপে ধাপে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পরিবর্তনের একটি সুবিশাল সুযোগ। মিউটেশনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে, যদিও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্ট, সফল মিউটেশনগুলো ক্ষুদ্র। পরিবর্তিত প্রাণী উদ্দেশ্যহীন এলোমেলোভাবে যুক্ত কোনো বিশৃঙ্খলা নয়। প্রতিটি উদ্দেশ্যহীন পরিবর্তন এটিকে এর আগের প্রজন্ম থেকে খুব সামান্য একটু পরিবর্তিত করে।

আসুন আবার আমরা সেই চিতার উদাহরণে ফিরে যাই দেখার জন্য যে, কীভাবে প্রকৃতি একজন কৃষক অথবা উদ্যানপালক বা কুকুরের কৃত্রিম-প্রজননকারী মানুষের ভূমিকা নেয়। পরিবর্তিত জিনসহ শাবকটি বড় হয়ে ওঠে, এবং খানিকটা দীর্ঘ নোখ এটিকে অল্প খানিকটা বেশি দ্রুত দৌড়াতে সহায়তা করে। সুতরাং এটি বেশি সংখ্যক শিকার ধরতে পারে, যার মানে এর নিজের শাবকগুলো বেশ পরিমান খাদ্য পায় এবং তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও বেশি থাকে এবং তারা নিজেরাও পরে সন্তান উৎপাদন করে। এই নতুন শাবকদের কিছু - পরিবর্তিতদের সন্তানের সন্তান - সেই পরিবর্তিত জিনটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, সুতরাং তারাও খানিকটা লম্বা নোখসহ বেড়ে ওঠে। তারাও খানিকটা বাড়তি গতিসহ দৌড়াতে পারে, এবং সে কারণে তারাও বেশি সংখ্যক সফল সন্তানের জন্ম দেয় – সেই মূল পরিবর্তিত প্রাণীর সন্তানের সন্তানের সন্তান। এবং এই ভাবে এটি চলতে থাকে। মনে হতে পারে যেন কোনো মানব প্রজননকারী পদ্ধতিগতভাবে প্রজাতির সবচেয়ে দ্রুতগামী সদস্যগুলোর মধ্যে প্রজনন নিশ্চিত করছে, কিন্তু এখানে কোনো মানব প্রজননকারী নেই, টিকে থাকারে সংগ্রামই এই কাজটি সম্পন্ন করছে। আপনি দেখতে পারছে কী ঘটতে যাচ্ছে। প্রজন্ম অতিক্রান্ত হলে, এই পরিবর্তিত জিন জনগোষ্ঠীতে সংখ্যায় আরো বেশি, অর্থাৎ সাধারণ হয়ে ওঠে। অবশেষে একটি সময় আসে যে চিতাদের প্রায় পুরো জনগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যদের শরীরে এই পরিবর্তিত জিনটি থাকে। এবং তারা সবাই তাদের পূর্বসূরিদের চেয়ে খানিকটা দ্রুত গতিতে দৌড়াতে পারে।

এটি গ্যাজেলদের উপর বাড়তি একটি চাপের সৃষ্টি করে। সব গ্যাজেলই সমানভাবে দ্রুত দৌড়াতে পারে না। তাদের কেউই চিতার চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে না, কিন্তু কিছু গ্যাজেল অন্য গ্যাজেলদের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে, আর তারাই সাধারণত চিতার আক্রমণ ও খাদ্য হওয়া থেকে পালিয়ে নিজেদের বাঁচাতে পারে। আর এটি তাদের আরো বেশি দিন বাঁচতে সহায়তা করে, পরিণতিতে তারা প্রজননের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দিতে পারে। এবং তাদের সন্তানরাও সে দ্রুত দৌড়ানোর জিনটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে। সে কারণে ধীরে

দৌড়ানো জন্য কোনো জিনের গন্তব্য চিতা, সিংহদের পেট হবারই সম্ভাবনা বেশি এবং পরিণতিতে সে জিনগুলো পরবর্তী প্রজন্মের গ্যাজেলে শরীরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা কম। যদি কোনো একটি বিদ্যামন জিনে আবারো উদ্দেশ্যহীন কোনো পরিবর্তন ঘটে, একটি নতুন পরিবর্তিত জিনের উদ্ভব হয় যা গ্যাজেলদের দ্রুত দৌড়াতে সহায়তা করে, এটি দ্রুত গ্যাজেল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, সেই চিতার মিউটেশনটির মত। এটি এদের ক্ষুরের কোনো পরিবর্তনও হতে পারে, অথবা তাদের হৃৎপিণ্ডের কোনো পরিবর্তন, অথবা তাদের রক্তের প্রাণ-রসায়ণের গভীরে কোনো পরিবর্তন। খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এখানে অপ্রয়োজনীয়। উপায় নির্বিশেষে যদি কোনো জিন গ্যাজেলদের বাঁচতে সহায়তা করে, এ জিনটি তাদের পরবর্তী প্রজন্মের শরীরে হস্তান্তরিত হবে। সুতরাং চিতার জিনের মত, এটি একটি পর্যায়ে বিস্তার লাভ করবে এবং জনগোষ্ঠীতে সর্বজনীন হয়ে উঠবে। আর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, চিতা এবং গ্যাজেল উভয় প্রাণী, শিকার ও শিকারী, শুধুমাত্র আরো খানিকটা বেশি দ্রুত গতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে। আমরা বলতে পারে উভয় পাশেই 'বিবর্তনীয়' একটি পরিবর্তন ঘটছে।

এখানে আমি 'অস্ত্র-প্রতিযোগিতার' রূপকটি পছন্দ করি। অবশ্যই একটি একক চিতা অথবা একক গ্যাজেল আক্ষরিকার্থে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় দৌড়াচ্ছে, কিন্তু সেটি অস্ত্র-প্রতিযোগিতা নয়। সেটি শুধুমাত্র একটি প্রতিযোগিতা, এবং এটি শেষ হয় বরং দ্রুত চিতার বিজয় (খাদ্য) অথবা গ্যাজেলের বিজয়ের (পলায়ন) মাধ্যমে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা আরো ধীরে চলমান, এককভাবে কোনো চিতা/গ্যাজেলের সময়ে নয় বরং বিবর্তনীয় সময়ের পরিসরে। গ্যাজেল প্রজাতি আর চিতা প্রজাতির (এছাড়াও সিংহ, লিওপার্ড, হায়েনা, কেপ হান্টিং ডগ প্রজাতি) মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলমান। আর এই অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলাফল হচ্ছে বিবর্তনীয় সময়ের মাত্রায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি। টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় 'উপকরণে' উন্নয়ন: প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ক্রমান্বয়ে দৌড়ানোর গতি বৃদ্ধি, পায়ের উন্নতি, প্রাণশক্তি কিংবা দম, ফাকি দেবার কৌশল আর দক্ষতা, শিকারী প্রাণী অথবা শিকার শনাক্ত করতে ব্যবহৃত ইন্দ্রিয়গুলোর উন্নতি, মাংসে দ্রুত অক্সিজেন পৌছে দেবার জন্য রক্তের রসায়নে উন্নয়ন।

মানব জীবনের মতোই কোনো কিছু এখানেও বিনামূল্যে অর্জিত হয় না। প্রতিটি উন্নয়নের জন্যে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। দৌড়ের গতির উন্নতির জন্য প্রয়োজন দীর্ঘতর পা আর অপেক্ষাকৃত হালকা হাড়। আরো বেশি ভঙ্গুর পা সৃষ্টি করার মাধ্যমে সেটির জন্যে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। মানব কৃত্রিম নির্বাচন রেস বা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার ক্ষেত্রে কৃত্রিম নির্বাচন ঘটিয়েছে যেন তারা দ্রুত

দৌড়াতে পারে, এমনকি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের যতটা দ্রুত গতি অর্জন করার সম্ভব ছিল তার চেয়ে বেশি। কিন্তু রেসের ঘোড়ার দীর্ঘ পায়ের পরিণতিতে আরো বেশি ভঙ্গুর হয়ে উঠেছে। কল্পনা করুন বন্য ঘোড়ার জন্যে এই পরিবর্তন কী ঘটাতে পারে, যদি তাদের স্যাবার-টুথ বাঘদের সাথে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় বাধ্য হয়ে আধুনিক রেসের ঘোড়ার মত দ্রুত দৌড়ানোর দক্ষতা অর্জন করতে হতো। সবচেয়ে দ্রুততম সদস্য হয়তো স্যাবার-টুথ বাঘকে দৌড়ে হারাতে পারতো তাদের হালকা হাড়সহ লম্বা পা ব্যবহার করে। কিন্তু তাদের পা ভাঙ্গবার সম্ভাবনাও বেশি থাকতো, আর তখন তারা স্যাবার-টুথ বাঘদের সহজ শিকারে পরিণত হতো। সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে, অস্ত্র-প্রতিযোগিতা এক ধরনের সমঝোতা সৃষ্টি করে: বন্য ঘোড়া দ্রুত দৌড়াবে, কিন্তু মানুষের নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সৃষ্টি করা রেসের ঘোড়াদের মত দ্রুত গতি তারা অর্জন করতে পারবে না। আর বাস্তবিকভাবে সেটা ঘটেছে। বিস্ময়করণ, আধুনিক রেসের ঘোড়ারা প্রায়শই তাদের পা ভেঙ্গে ফেল, এবং দুঃখজনকভাবে তাদের সে করুণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে গুলি করে হত্যা করতে হয়।

এবং শুধুমাত্র ভঙ্গুর পা নয়, আরো কিছু বিষয় এই অস্ত্র প্রতিযোগিতার উপর একটি সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত দৌড়ানোর পেশী বানানো বেশ ব্যয়সাধ্য। খাদ্যকে পেশীতে রূপান্তরিত করতে হয়, তাই খাদ্যের প্রয়োজন আপনার। সেই খাদ্য অন্য কোনো উপযোগী ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেত: যেমন পরিচর্যারত শিশুর জন্য দুধ তৈরি করতে। মানব অস্ত্র প্রতিযোগিতাও অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়সাধ্য। যত বেশি টাকা আপনি কোনো বোমারু বিমানের পেছনের খরচ করবেন, ততই কম পরিমান অর্থ বাঁচবে ফাইটার প্লেনের জন্য। আর হাসপাতাল কিংবা স্কুল বানানোর জন্য কম পরিমান টাকার কথা তো বাদই দিলাম।

কল্পনা করুন কোনো একটি উদ্ভিদের - যেমন ধরুন আলু - কী ধরনের অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ করতে হয়। কোনো একটি প্রজাতির উদ্ভিদ একটি ভালো উদাহরণ কারণ আমাদের হয়তো ভাবার প্রবণতা আছে যে, (ভ্রান্তভাবে) একটি গ্যাজেল, একটি চিতা অথবা একটি ঘোড়া তাদের মগজে এ হিসাব-নিকাশটি করছেন, কেউই আসলে ভাবতে পারেন না যে, কোনো উদ্ভিদ এভাবে কোনো গণনা করতে পারে। আর সচেতনভাবে হিসাব-নিকাশ করা নিয়ে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে আমরা এখানে কথা বলছি না। প্রজন্মান্তরে হিসাব-নিকাশ সমতূল্য কাজগুলো করে প্রাকৃতিক নির্বাচন। সুতরাং আবার আলুর উদাহরণে ফিরে

আসি। খরচ করার জন্য এর সীমিত পরিমান কিছু 'টাকা' আছে এখানে 'টাকা' মানে শক্তি উৎস যা মূলত আসে সূর্য থেকে, যা শর্করার মত ব্যবহারযোগ্য কারেন্সি বা মূদ্রায় পরিণত হয় এবং স্টার্চ হিসাবে যা সঞ্চিত হয়, যেমন এখানে আলু গাছের কন্দে। পাতা তৈরি করতে জন্যে গাছটির সর্বমোট 'টাকা' থেকে কিছু পরিমান টাকা খরচ করতে হয় (আরো বেশি টাকা উৎপাদন করতে যেন সেটি সূর্যের আলো শোষণ করতে পারে), এবং শিকড় বা মূল তৈরি করতেও এটিকে খরচ করতে হয় (মাটি থেকে সংগ্রহ পানি এবং খনিজ সংগ্রহ করতে)। এর কিছু পরিমান 'টাকা' খরচ করার দরকার হয় মাটিতে নিজের কন্দ সৃষ্টি করতে (আগামী বছরের জন্য 'টাকা' সঞ্চয় করতে)। ফুলের জন্য এদের কিছু টাকা খরচ করার দরকার হয় (ফুল কীটপতঙ্গদের আকর্ষণ করে অন্য আলু গাছের সাথে পরাগায়নে সহায়তা এবং সঠিকভাবে 'টাকা' খরচ করার জিনসহ তাদের সব জিনগুলো বিস্তার করতে)। যে আলু গাছগুলো তাদের এসব হিসাব-নিকাশে কোনো ভুল করে - হয়তো কন্দে সঞ্চয়ের জন্য বেশি অর্থ বিনিয়োগ না করে - সেটি তাদের জিনগুলো প্রজন্মান্তরে হস্তান্তর করতে অপেক্ষাকৃতভাবে কম সফল হয়। এবং প্রজন্মান্তরে যে গাছগুলো তাদের অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ ভুল করে তাদের সংখ্যা জনগোষ্ঠীতে কমতে থাকে। আর সেটির অর্থ হচ্ছে অর্থনৈতিক এই গণিত ভুল করার জিন ক্রমশ সংখ্যায় কমতে থাকে। জনগোষ্ঠীর 'জিনপুল' ক্রমশ সঠিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা জিন দিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে।

আলু গাছের এই উদাহরণটি থেকে আমরা জেনেছি যে, আমরা সচেতনভাবে করা কোনো গণনার কথা এখানে বলছি না। এবার আমরা আবার নিরাপদে গ্যাজলের আলোচনায় ফিরে যেতে পারি, এবং কীভাবে তারা তাদের সঠিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যটি অর্জন করছে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আলুর উদাহরণটি থেকে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এখানে ভিন্ন কিন্তু মূলনীতিটি উভয় ক্ষেত্রে একই। চিতা আর সিংহদের নিয়ে গ্যাজেলদের সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। এই শিকারী প্রাণীগুলো নিয়ে তাদের আতঙ্কিত থাকার প্রয়োজন আছে। এই প্রাণীদের ওপর তাদের অবশ্যই খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এবং 'সতর্ক' একটি নাক থাকাও দরকার। কারণ সাধারণত বিপদ শনাক্ত করতে গ্যাজেলরা তাদের নাক অর্থাৎ ঘ্রাণশক্তি ব্যবহার করে। কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, খাওয়ার জন্য তাদের বহু সময় ব্যয় করতে হয়। ওজন অনুযায়ী হিসাব করলে, মাংসের চেয়ে উদ্ভিদ-জাত খাদ্য অপেক্ষাকৃত কম পুষ্টিকর, সুতরাং একটি তৃণভোজী - যে প্রাণী শুধু উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য গ্রহন করে - গ্যাজেল কিংবা গরুর

মত প্রাণীদের প্রায় সারাক্ষণই খেতে হয়। কোনো গ্যাজেল যে কিনা খুব বেশি ভীতু, সামান্যতম বিপদের সন্দেহে যে পালিয়ে যেতে থাকে, প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহন করার মত যথেষ্ট পরিমান সময় সে পায় না। আফ্রিকার সমতলে আপনি মাঝে মাঝে সিংহের চোখের সামনেই অ্যান্টিলোপ আর জেবরাগুলো ঘাস খেতে দেখবেন, তারা কিন্তু খুব ভালো করেই জানে যে, কাছেই সিংহরা অবস্থান করছে। তারা তাদের চিন্তিত চোখ খোলা রাখে, লক্ষ রাখে সিংহগুলো শিকার করার কোনো ইঙ্গিত প্রদর্শন করছে কিনা। কিন্তু তারা ঘাস খাওয়া অব্যাহত রাখে। বহু প্রজন্মান্তরে প্রাকৃতিক নির্বাচন খুব বেশি ভীতু (আর সেই কারণে যথেষ্ট পরিমানে না খেতে পারা), একেবারে ভয় না পাবার (আর সেই কারণে শিকারী প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হওয়া) মত পরিস্থিতির মধ্যে সূক্ষ্ম একটি ভারসাম্য অর্জন করেছে।

জনগোষ্ঠীগুলোয় জিনগুলোর পরিমানে (অনুপাত) কোনো পরিবর্তনই হচ্ছে মূলত বিবর্তন। যা আমরা বাইরে থেকে 'দেখি' সেটি হচ্ছে প্রজন্মান্তরে শরীর অথবা আচরণে পরিবর্তন। কিন্তু মূলত যা ঘটছে সেটি হচ্ছে - কিছু জিন জনগোষ্ঠীতে আরো বেশি সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কিছু জিন সংখ্যায় কমতে থাকে। জনগোষ্ঠীতে জিনগুলো টিকে থাকে অথবা টিকে থাকতে ব্যর্থ হয় বাহকের শরীর আর আচরণে তাদের প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে। আর শরীর আর আচরণের উপর সেই প্রভাবগুলোর শুধু অল্পকিছুই আমাদের কাছে দৃশ্যমান। আর এটি শুধু চিতা আর গ্যাজেল, জিব্রা আর সিংহই নয়, এটি ক্যামিলিয়ন আর স্কুইড, ক্যাঙ্গারু আর কাকাপো, ষাড় এবং প্রজাপতি, বিচ গাছ আর ব্যকটেরিয়া, প্রতিটি প্রাণী আর উদ্ভিদ, প্রতিটি ছত্রাক, প্রতিটি অণুজীব - এরা প্রত্যেকেই সেই সব জিন বহন করে যা অবিচ্ছিন্ন পূর্বসূরিদের একটি বংশধারাকে টিকে থাকতে এবং পরবর্তী প্রজন্মে ঐসব জিনগুলো হস্তান্তর করতে সহায়তা করেছিল।

আপনি এবং আমি এবং প্রধানমন্ত্রী, আপনার বিড়াল এবং আপনার জানালার বাইরে গান গাওয়া পাখিগুলো, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের পূর্বসূরিদের দিকে তাকাতে পারবো এবং নিম্নোক্ত গর্বিত দাবীটি করতে পারবো: আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে একজনও অল্প বয়সে মারা যাননি। বহু সদস্য অল্প বয়সে মারা গেছেন ঠিকই কিন্তু তারা কেউই সেই সদস্য নন যারা পূর্বসূরি হয়েছেন। আপনার পূর্বসূরিদের কেউ অল্প বয়সে পাহাড়ের খাঁদ থেকে পড়ে মারা যায়নি, অথবা কোনো সিংহের পেটে খাদ্য হয়নি অথবা ক্যানসারে মারা যায়নি, অন্ততপক্ষে একটি সন্তানের জন্ম দেবার জন্য যথেষ্ট পরিমান সময় তারা বেঁচে

ছিলেন। অবশ্যই এটি স্পষ্ট যখন আমরা এটি নিয়ে ভাবি। এবং এটি আসলেই - আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মানে হচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই - প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়াম, পৃথিবী জুড়ে সাত বিলিয়ন মানুষ - সে জিনগুলো ধারণ করি যেগুলো দক্ষতার সাথে বাঁচতে এবং একজন পূর্বসূরি হওয়ার ক্ষেত্রে উপযোগী ভূমিকা পালন করে।

টিকে থাকতে আমাদের দক্ষ করে তোলা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো প্রজাতিভেদে ভিন্ন। চিতার জন্য এটি স্বল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দৌড়ানো, নেকড়ের জন্য এটি দূরপাল্লার দৌড়ের দক্ষতা, ঘাসের জন্য এটি সূর্যের আলো শোষণ করার দক্ষতা, গরুর দাঁতের (কিংবা ঘাস-কাটার যন্ত্র) দ্বারা কাটা পড়ার জন্য অহেতুক বেশি চিন্তা না করা, গরুর জন্য খুব ভালো করে ঘাস হজম করতে পারার দক্ষতা, বাজপাখির জন্য আকাশে উপরে ভেসে বেড়ানো এবং শিকার শনাক্ত করা, মোল আর আর্ডভার্কদের জন্যে মাটি খুঁড়তে পারার দক্ষতা। সব জীবিত জীবের জন্য, মূল বিষয়টি হচ্ছে এর শক্তি-অর্থনীতিতে সঠিক ভারসাম্যটি খুঁজে পাওয়া। আর এটি হচ্ছে বহু সহস্র বিষয়ে দক্ষতা, বহু বিলিয়ন সংখ্যক কোষের প্রতিটির মাধ্যমে শরীরের প্রতিটি অংশের একত্রে কাজ করা। খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য আছে কিন্তু একটি বিষয় তাদের সবার মধ্যে সাধারণ। সেগুলো সবই হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের শরীরে জিন হস্তান্তর করার ব্যাপারে দক্ষতা। যে জিনগুলো তাদের টিকে থাকতে দক্ষ করে এবং সে একই জিন পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা। শুধুমাত্র বিস্তারিত পৃথক উপায়ে একই জিনিস করা: টিকে থাকা ও জিনগুলো হস্তান্তর করা।

আমরা একমত হয়েছিলাম যে, একটি চোখ বা যে-কোনো একটি অঙ্গ, যা কিনা জটিল (পেইলি'র ঘড়ির মত) সেটি দৈবক্রমে সৃষ্টি হবার জন্য আসলেই খুবই 'অসম্ভাব্য'। মানুষের চোখের মতো কোনো কিছু দেখার এমন একটি অসাধারণ অঙ্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। সেটি খুব বেশি অসম্ভাব্য একটি বিষয় হবে, সেই শত খানেক পেনি একই সাথে ছুড়ে মারলে সবগুলোরই একই সাথে 'হেড' পাশটি পড়ার মতোই অসম্ভাব্য। কিন্তু একটি উৎকৃষ্ট চোখ আসতে পারে খানিকটা কম উৎকৃষ্ট চোখে ক্রমান্বয়ে ঘটনা উদ্দেশ্যহীন পরিবর্তনের মাধ্যমে। আর সেই খানিকটা কম ভালো চোখ আসে আরো খানিকটা কম ভালো চোখ থেকে। এভাবে এটি অনুসরণ করা যেতে পারে আসলেই বেশ খারাপ একটি চোখ অবধি। এমনকি খুবই খারাপ কোনো চোখও একেবারে কোনো চোখ না থাকার চেয়েও উত্তম। আপনি দিন আর রাতের পার্থক্য বলতে পারবেন, এবং

হয়তো কোনো শিকারী প্রাণীর ভয়ঙ্কর ছায়াও শনাক্ত করতে পারবেন। আর শুধুমাত্র চোখ নয়, পা, হৃৎপিণ্ড এবং জিহবা, পাপড়ি, রক্ত, চুল কিংবা পাতা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেও এটি একই ভাবে সত্য। জীবন্ত কোনো সত্তার ক্ষেত্রে সবকিছুই, সেটি যতই জটিলই হোক না কেন, কিংবা সেটি যত অসম্ভাব্য হোক না কেন – যেমন পেইলি ঘড়ির মত অসম্ভাব্য কিছু - এখন সেই সব কিছুই বোধগম্য হতে পারে। যা কিছুর দিকেই আপনি তাকান না কেন, সেটি একবারেই পূর্ণাঙ্গভাবে সৃষ্টি হয়নি। বরং, এমন কিছু থেকে এটি এসেছে যা এর আগে যা ছিল তার চেয়ে খানিকটা ভিন্ন। অসম্ভাব্যতা ক্রমশ মিলিয়ে যায় যখন আপনি দেখেন এটি ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হচ্ছে, চুপি চুপি, খুব ক্ষুদ্র ধাপে ধাপে, যেখানে প্রতিটি ধাপই আসলেই খুব সামান্য খানিকটা পরিবর্তন নিয়ে আসে। আর প্রথম ধাপটি হয়তো এমন কিছু নিয়ে আসতে পারে যা হয়তো একেবারেই ভালো নয়।

অসম্ভাব্য কোনো কিছুই পৃথিবীতে হঠাৎ করেই অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে না। যেমন আমি আগেও বলেছি, অসম্ভাব্যতা বলতে সেটাই মূলত বোঝায়। পেইলি ঘড়ির ব্যাপারে সঠিক ছিলেন। একটি ঘড়ি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। বাস্তব রূপ পেতে এর একজন ঘড়ি-নির্মাতার প্রয়োজন। ঘড়ি-নির্মাতারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হন না। তারা জটিল শিশু হিসাবে জন্মগ্রহন করেন: শিশু যা ক্রমশ প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে মানব হাত, মস্তিষ্কসহ, যার ঘড়ি নির্মাণ করার দক্ষতা অর্জন করার সক্ষমতা আছে। ঐ মানব হাত আর মস্তিষ্ক নর-বানরদের হাত এবং মস্তিষ্ক থেকে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়েছে। ঐ নর-বানররা ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে বানর-সদৃশ পূর্বসূরিদের থেকে বিবর্তিত হয়েছিল । তারা নিজেরাও ধীর, ক্রমান্বয়ে সংঘটিত খুব ধীর গতির একটি প্রক্রিয়ায় শ্রু-সদৃশ পূর্বসূরিদের থেকে বিবর্তিত হয়েছে, তার আগে মাছ-সদৃশ পূর্বসূরি থেকে এবং এভাবে আরো অতীতের অনেক পূর্বসূরি প্রাণীদের থেকে। পুরোটাই ধীর, ক্রমান্বয়ে সংঘটিত একটি পক্রিয়া, কখনোই আকস্মিক নয়, কখনোই অসম্ভাব্য নয়, কখনোই এক ধাক্কায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি ঘড়ির অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠার মত অসম্ভাব্য উপায়ে নয়।

ডিজাইনার বা পরিকল্পকদেরও একটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন, ঠিক যেভাবে কোনো ঘড়ির জন্য দরকার। ঘড়ি-নির্মাতাদের অস্তিত্বের জন্য তাদের কাছে ব্যাখ্যা আছে: কোনো একজন নারী গর্ভে তারা জন্ম নিয়েছেন, এবং তার আগে ধীরে ক্রমান্বয়ে সংঘঠিত বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বহু পূর্বসূরিদের দীর্ঘ একটি বংশধারার মধ্য দিয়ে - সব জীবের জন্য যে ব্যাখ্যাটি প্রযোজ্য। তাহলে এখানে ঈশ্বরের ভূমিকা কোথায় অবশিষ্ট থাকলো - সেই কথিত ডিজাইনার বা পরিকল্পক, যিনি সবকিছু

সৃষ্টি করেছেন? আপনি যদি বিষয়টি নিয়ে খুব গভীরভাবে ভাবেন, আপাতদৃষ্টিতে সব অসম্ভাব্য জিনিসের - যেমন ক্যামেলিয়ন, চিতা, ঘড়িনির্মাতা - অস্তিত্বের কারণে হিসাবে ঈশ্বরকে একটি উত্তম ব্যাখ্যা মনে হতে পারে, কিন্তু খানিকটা সতর্কভাবে যদি আমরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করি, আমরা দেখতে পারবো, ঈশ্বর নিজেও এমনকি উইলিয়াম পেইলির সেই ঘড়িটির চেয়ে আরো বেশি অসম্ভাব্য। যে-কোনো কিছু যা কিনা যথেষ্ট পরিমান বুদ্ধিমান - যথেষ্ট পরিমানে জটিল - যা কোনো কিছু পরিকল্পনা করতে সক্ষম, তাকে অবশ্যই এই মহাবিশ্বে বেশ পরের একটি পর্যায়ে আবির্ভূত হতে হবে। একজন ঘড়ি-নির্মাতার মত এমন কোনো জটিল কিছুকে অবশ্যই পূর্ববর্তী সরল কোনো কিছু থেকে ধীর, দীর্ঘ, ক্রমান্বয়ে ঘটা বিবর্তন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হতে হবে। পেইলি ভেবেছিলেন তার ঘড়ি-নির্মাতার যুক্তিটি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু যখন বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা হয়, সেই একই যুক্তি ঠিক এর বিপরীত দিকেও যায়: ঈশ্বরের অস্তিত্ব মিথ্যা প্রমাণ করার দিক বরাবর। পেইলি হয়তো বুঝতে পারেননি সুন্দর বাচনভঙ্গীতে এবং প্ররোচনায় সমর্থ একটি ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি আসলে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছিলেন।

৯ স্ফটিক এবং জিগস ধাঁধা

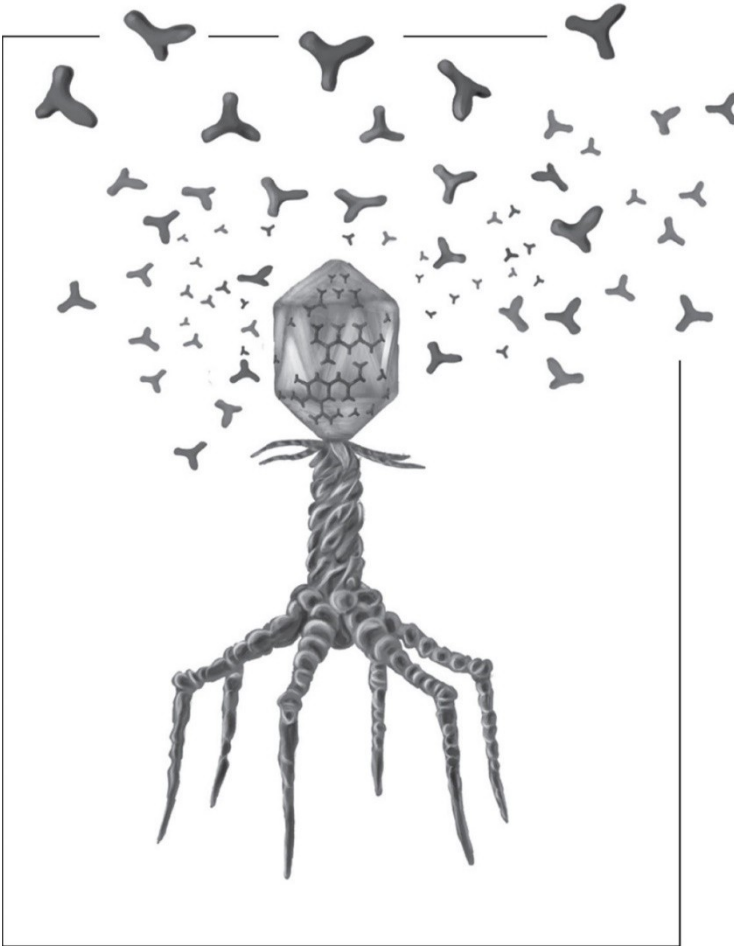

আসুন আবার আর্চডিকন পেইলির ঘড়ির সেই উদাহরণটির কাছে ফিরে যাই, এবং আরো সতর্কভাবে লক্ষ করি কীভাবে এটি তার সেই পাথর খণ্ড থেকে ভিন্ন। আপনি এই দুটি জিনিসের ক্ষেত্রেই এদের খণ্ডাংশগুলো একত্রে জোড়া লাগানোর সেই পরীক্ষাটি করে দেখতে পারেন। আপনি যদি হাজার বার একটি নির্দিষ্ট পাথরের ক্ষুদ্র খণ্ডাংশগুলো নানাভাবে জোড়া লাগাতে চেষ্টা করেন, ঠিক সেই একই পাথরের খণ্ডটি পুনরায় সৃষ্টি করতে আপনরা প্রচুর পরিমানে ভাগ্যের প্রয়োজন হবে। সুতরাং আপনি হয়তো বলতে পারে ঘড়ির মতোই পাথরও অসম্ভাব্য একটি বস্তু। কিন্তু ঐসব এলোমেলোভাবে যুক্ত করা পাথরগুলো তারপরও ঠিক সেই পাথরই থাকবে, এবং সেগুলোর কোনোটিতেই আপনি বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবেন না। ঘড়ির ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কিছু হবে না। আপনি যদি ঘড়ির খণ্ডাংশগুলো একত্রে মিলিয়ে হাজার বার যুক্ত করার চেষ্টা করেন, আপনি হাজারবারই উদ্দেশ্যহীন বিশৃঙ্খলাই পাবেন। সেগুলোর কোনোটাই সময় বলতে পারবে না বা কোনো উপযোগী কাজও করতে পারবে না (যদি না আপনার সেই উদ্দেশ্যহীন মিশ্রণ হাস্যকরভাবে অতিমাত্রায় ভাগ্য দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট হয়)। সেগুলো এমনকি দেখতে সুন্দরও হবে না। আর সেটাই পাথর আর ঘড়ির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য। উভয় বস্তুই সমমাত্রায় অসম্ভাব্য সেই অর্থে যে, এর অংশগুলোর একটি স্বতন্ত্র সজ্জা আছে যা দৈবক্রমে শুধু ভাগ্যের জোরে ঘটবে না। কিন্তু ঘড়ি আরো একটি কারণে অনন্য, আরো কৌতূহলোদ্দীপক একটি উপায়ে অন্য সব উদ্দেশ্যহীনভাবে জোড়া লাগিয়ে তৈরি করা বস্তু থেকে ভিন্ন: এটি উপযোগী কিছু কাজ করে, এটি সময় কত সেটি বলে। পাথরের সেই ধরনের কোনো স্বতন্ত্রতা নেই। এমন কোনো কিছু নেই এর যা কিনা ঐ হাজারটা এলোমেলোভাবে জোড়া লাগানো পাথরের খণ্ডগুলোর কোনো একটিকে বাকিগুলো থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র করে তুলতে পারে। সেগুলো প্রত্যেকটি পাথর। কিন্তু ঘড়ির খণ্ডগুলোর সেই হাজার হাজার বার একত্র হবার উপায়গুলোর মধ্যে শধু একটি উপায়ে এটি কার্যকর একটি ঘড়ি হতে পারে। একটি মাত্র সজ্জা আমাদের সময় কত সেটি বলতে পারবে।

কিন্তু এখন কল্পনা করুন, আর্চডিকন পেইলির সাথে সেই মাঠে হাটার সময় আপনি এ ধরনের কিছুর সাথে হোচট খেলেন (নীচের ছবিটি লক্ষ করুন)। আপনি কী এখন খুশী হবেন এমন কিছু বলে যে এটিও প্যালির পাথরের মতোই সেখানে এমনিতেই পড়ে ছিল? আমি সন্দেহ করছি, সম্ভবত না। আমি মনে করি আপনি - এবং অবশ্যই পেইলি নিজেও হয়তো ভাবতে প্ররোচিত হবেন , এটি

কোন পরিকল্পকের সতর্ক পরিকল্পনার মাধ্যমে সৃষ্ট বস্তু , হয়তো কোনো শিল্পীর কাজ। বিখ্যাত কোনো গ্যালারীতে এটি রাখলে বেমানান মনে হবে না,

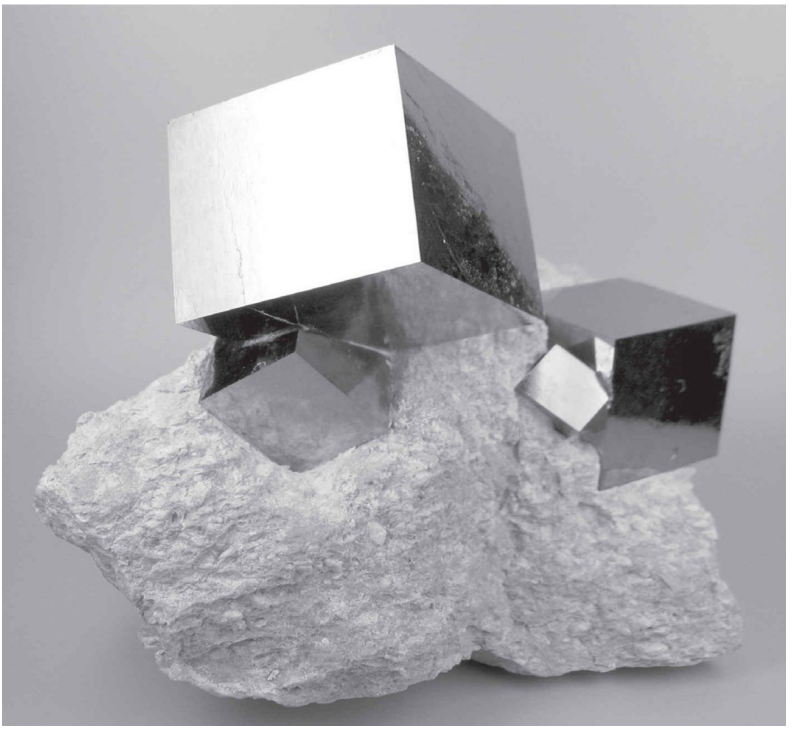

মনে হবে কী? মূল্যবান একটি শিল্পকর্ম, যা সৃষ্টি করেছেন একজন বিখ্যাত ভাস্কর। এই চকচকে কিউবগুলো এত নিখুঁত, শৈল্পিক রুচির সাথে এটিকে অমসৃণ পাথরের একটি বেদীর উপর স্থাপন করা হয়েছে। আমার কাছে এটি বিস্ফোরকভাবেই বিস্ময়কর হবে যদি আবিষ্কার করি যে, চমৎকারভাবে সৃষ্ট এই বস্তুগুলো কেউ সৃষ্টি করেননি। এগুলো এমনিতেই এভাবে প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়েছে। ঠিক পেইলির উদাহরণের সেই পাথরের মত। আসলেই, এগুলো এক ধরনের পাথর।

এগুলো স্ফটিক, স্ফটিক শুধু স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে উঠতে পারে। এবং কিছু সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক রূপে গড়ে ওঠে, যা এতটাই অভিভূত করে যেন মনে হয় কোনো শিল্পী এগুলো সৃষ্টি করেছেন। ছবির এই স্ফটিকগুলো আয়রন ডাই-সালফাইডের স্ফটিক। আরো বহু ধরনের স্ফটিক আছে, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ থেকে যেগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সৃষ্টি হয়, যেগুলো খুব সুন্দর দেখতে।

কিছু এত বেশি সুন্দর - যেমন হীরা, রুবি, নীলা, পান্না - যে এগুলো খুবই মূল্যবান এবং মানুষ সেগুলো তাদের গলায় কিংবা আঙ্গুলে পরিধান করে।

পুনরাবৃত্তি করছি: কেউই এই সুন্দর আয়রন ডাইসালফাইড 'ভাস্কর্যটি' খোদাই করে সৃষ্টি করেননি। শুধু স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এটি সৃষ্টি হয়েছে, স্ফটিকগুলো শুধু এর আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর স্ফটিক ঠিক সেটাই করে থাকে। আয়রন ডাই-সালফাইডের স্ফটিকগুলোকে 'পাইরাইট' বলা হয়, এবং তাদের উজ্জ্বল রঙের কারণে 'ফুলস গোল্ড' বা নির্বোধের স্বর্ণ নামে পরিচিত। যারা মাটির নীচ এগুলো খুঁজে পেয়ে খুঁড়ে বের করে এনেছিলেন, তাদের আশার নিষ্ঠুর সমাপ্তি হবার আগে বোকার মতোই তারা এগুলোকে স্বর্ণ ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন।

স্ফটিকগুলোর খুব সুন্দর জ্যামিতিকভাবে সুনির্দিষ্ট আকার আছে কারণ তাদের এই আকৃতি সরাসরিভাবে তাদের পরমাণুগুলোর সজ্জার দ্বারা সৃষ্ট। যখন পানি যথেষ্ট শীতল হয় এটি স্ফটিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বরফের স্ফটিক তৈরি করে - পানি বরফে পরিণত হয়। বরফে অণুগুলো পরস্পরের পাশাপাশি একটি সুশৃঙ্খল নিয়মিত সজ্জায় তাদের অবস্থান গ্রহন করে। কোনো প্যারেডে পাশাপাশি দাড়ানো সৈন্যদের মত, এমনকি ছোটো একটি স্ফটিকে এমন প্যারেডে বহু বিলিয়ন 'সৈন্য' সজ্জিত থাকে: সারির পর সারি বাধা সবদিকে বহু দূর অবধি যা বিস্তৃত। সৈন্যদের ব্যতিক্রম, 'সব দিক' বলতে এখানে উপর এবং নীচও অন্তর্ভুক্ত। এই ত্রিমাত্রিক অণুদের প্যারেডকে বলা হয় একটি 'ল্যাটিস'। হীরা এবং অন্য মূল্যবান 'রত্ন' পাথরগুলোও স্ফটিক, এবং এদের প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র ল্যাটিস বিন্যাস আছে। পাথর, শিলা ও বালি স্ফটিক দিয়ে তৈরি, কিন্তু প্রায়শই স্ফটিকগুলো আকারে এতই ক্ষুদ্র এবং এমনভাবে একত্রে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে

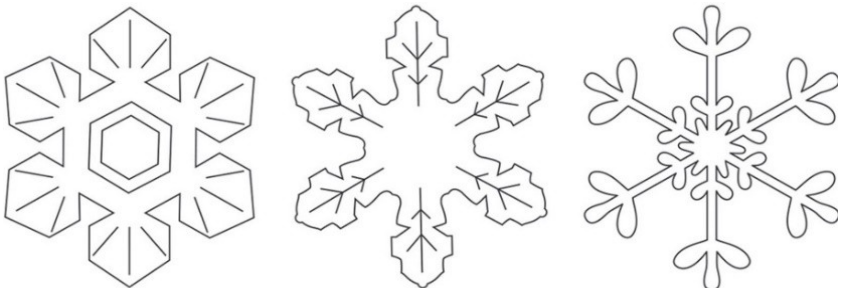

সজ্জিত থাকে, পৃথক স্ফটিক হিসাবে আপনি সেগুলো সহজে দেখতে পারবেন না।

অন্য আরেকটি উপায়েও স্ফটিক তৈরি হতে পারে: যখন কোনো একটি দ্রব্যকে দ্রবীভূত হয়, সাধারণত পানিতে এবং পানি বাষ্পীভূত হয়। খাবার লবন, অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করে আপনি খুব সহজে এটি করে দেখতে পারে। পানির মধ্য এক কাপ লবন দ্রবীভুত করে সেই দ্রবনটি ফোটাতে থাকুন, এরপর সেই দ্রবনটিকে বাষ্পীভূত হবার জন্যে একটি প্রশস্ত মুখের অগভীর পাত্রে রেখে দিন। কয়েক দিন অতিক্রান্ত হলে আপনি পানির মধ্যে লবনের নতুন স্ফটিকগুলো তৈরি হতে দেখবেন। সাধারণ লবনের স্ফটিকগুলো দেখতে আয়রন পাইরাটের মত কিউব বা ঘন আকৃতির হতে পারে। অথবা কিউব দিয়ে তৈরি আরো বড় কোনো কাঠামো এবং যা দেখতে চার পাশ বিশিষ্ট পিরামিডদের মত (জিগারট) হতে পারে। যা ঘটে সেটি হচ্ছে সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড পরমাণুগুলো পরস্পরকে চিনতে পারে এবং তাদের বাহুগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত করে। এই 'বাহু'র সঠিক নাম হচ্ছে 'বন্ড' বা বন্ধন। (এই ক্ষেত্রে তারা কারিগরী অর্থে আসলে পরমাণু নয়, এরা হচ্ছে 'আয়ন', সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড আয়ন, কিন্তু সে পার্থক্যটি এই আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়)। কীভাবে এই স্ফটিকগুলো সৃষ্টি হয় এবং বাড়তে থাকে? পানিতে ভাসতে থাকা সোডিয়াম আর ক্লোরাইড আয়নগুলো ইতোমধ্যে বিদ্যমান স্ফটিকের সাথে ধাক্কা খায়। এবং সেই আয়নগুলো ক্লোরাইড অথবা সোডিয়াম আয়নগুলোকে শনাক্ত করতে পারে যেগুলো ইতোমধ্যেই স্ফটিকের প্রান্তে অবস্থান করছে এবং এগুলো তাদের সাথে বন্ধনে যুক্ত হতে থাকে এবং এভাবেই স্ফটিক বাড়তে থাকে। আর সাধারণ লবনের স্ফটিকের কেন চারটি বর্গাকার পাশ থাকে, তার কারণ হচ্ছে আয়নগুলোর 'বাহু'গুলো পরস্পরের সাথে সমকোণে অবস্থান করে। স্ফটিক এর আকৃতি পায় 'প্যারেডে সজ্জিত সৈন্য'দের সারিগুলোর সমকোণ থেকে। সব স্ফটিকের কিন্তু বর্গাকার পাশ থাকে না এবং আপনি ইতোমধ্যেই অনুমান করেছেন কেন। তাদের 'বাহু'গুলো সমকোণ নয় বরং ভিন্ন কোনো কোণে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে, সুতরাং তাদের 'প্যারেডের সৈন্য'রা নিজেদের সেই কোণ বরাবর সজ্জিত করে। আর যে কারণে ফ্লোরাইট স্ফটিক হচ্ছে অক্টাহেড্রাল অর্থাৎ যার আটটি পাশ আছে।

স্ফটিক চমৎকার জ্যামিতিক আকৃতির বিশাল একটি একক পাথর হতে পারে যেমন একটি কিউব অথবা একটি অক্টাহেড্রনের মত। কিন্তু মাঝে মাঝে ছোটো স্ফটিকগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে আরো জটিল আকৃতি সৃষ্টি করতে পারে। এই জটিল আকৃতিগুলোর প্রতিটি ক্ষুদ্র গঠনগত ব্লকগুলোর অভ্যন্তরীণ সজ্জা, 'সৈন্যদের সেই প্যারেড গ্রাউন্ড'টি উন্মোচন করে। কিন্তু সামগ্রিক 'নির্মাণ'টি আরো বেশি বিস্তারিত। তুষারকণা একটি উদাহরণ। আপনি হয়তো

পড়েছেন যে-কোনো দুটি তুষারকণা এক নয়। পানির বরফে 'বাহু'র সংখ্যা হচ্ছে ছয়। সুতরাং প্রতিটি ক্ষুদ্র বরফ স্ফটিকের ছয়টি পাশ আছে। একটি তূষারকণা মানে শুধুমাত্র ঐ স্ফটিকগুলোর মাত্র একটি নয়। এটি একটি সংগঠন, একটি 'কাঠামো', যা তৈরি করে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ছয়-পাশ বিশিষ্ট স্ফটিক 'ইট'। আপনি লক্ষ করবেন যে ছয়-পাশসহ এই ডিজাইন কিন্তু তাদের তৈরি করা কাঠামোটি এবং এটি নির্মাণ করা 'ইট'গুলোর (স্ফটিক) আকারে প্রতিফলিত হয়। প্রতিটি তূষারকণার ছয়-দিকে প্রতিসাম্যতা আছে (নীচের অলংকরণে আমরা সেগুলো কয়েকটি উদাহরণ দেখতে পাবো) কিন্তু সেগুলো সব ভিন্ন, এবং তাদের কোনো কোনোটি খুবই সুন্দর।

কেন প্রত্যেকটি তূষারকণা অনন্য সেটি নিয়ে চিন্তা করার কিছু যৌক্তিকতা আছে। এর কারণ প্রতিটি তুষারকণার অনন্য একটি অতীত আছে। লবনের স্ফটিকগুলোর ব্যতিক্রম, তরল পানিতে যা গড়ে ওঠে তাদের প্রান্তসীমায়, তূষারকণা বৃদ্ধি পেতে থাকে এদের প্রান্ত বরাবর তাদের সেই 'কাঠামো'র সাথে ক্ষুদ্র পানির স্ফটিক যুক্ত করতে করতে যখন পানীয় বাষ্পের মেঘ থেকে মধ্য দিয়ে এগুলো নীচে ঝরে পড়তে থাকে। দুটি উপায়ে তারা বৃদ্ধি পেতে পরে। আর এই দুটি উপায়ের মধ্যে কোনটি প্রাধান্য বিস্তার করবে সেটি নির্ভর করবে সেই মেঘের প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশের অনু-জলবায়ুর উপর - সেটি কতটা শীতল বা কতটা আর্দ্র। মেঘের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনু-জলবায়ুগুলো তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা উভয় ক্ষেত্রেই তারতম্য প্রদর্শন করে। প্রতিটি তূষারকণা বহু সংখ্যক অনু-জলবায়ুর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে যখন মেঘের মধ্য দিয়ে ভেসে এটি নীচে নেমে আসে: মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে আর্দ্রতা আর তাপমাত্রার অনন্য পরিবর্তন। সুতরাং তুষারকণা স্ফটিকে নির্মাণ কাঠামো একটি অনন্য বিন্যাস অনুসরণ করে তৈরি হয় এবং সেই বিশেষ তূষারকণাও অনন্য একটি আকৃতি পায়। এটি এক ধরনের মুহূর্ত-থেকে-মুহূর্ত ইতিহাসের আঙ্গুলের ছাপ [তুষারকণা সম্বন্ধে আমি জেনেছি ব্রায়ান কক্সের চমৎকার 'ফোর্সেস অব ন্যাচার' বইটি থেকে (লন্ডন, কলিন্স, ২০১৮)]।

আর এদেরকে সুন্দর করে তোলে কোন বিষয়টি? একটি ক্যালাইডোস্কোপের ছবির মতোই এখানেও সেই সৌন্দর্য্যের কারণ হচ্ছে - প্রতিসাম্যতা। ছয়টি পাশের প্রতিটি, ছয়টি কোণের প্রতিটি, ছয়টি অগ্রবিন্দুর প্রতিটি অথবা অগ্রবিন্দুর গুচ্ছগুলো প্রতিটি প্রতিসম। আর কেন তারা প্রতিসম? কারণ এগুলো এতই ক্ষুদ্র যে এই বাড়তে থাকা কাঠামোটির প্রতিটি অংশ একই ধরনের 'ঐতিহাসিক' আর্দ্রতা আর তাপমাত্রার বিন্যাসের মুখোমুখি হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে যা বলা রাখা দরকার, যদিও সব তুষারকণাই অনন্য (পরস্পর থেকে ভিন্ন), তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি অন্যদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম সুন্দর। আর সাধারণত সুন্দরগুলোই বইয়ের পাতায় ছবি হিসাবে জায়গা পায়।

আমরা যদি এই বিষয়টি সম্বন্ধে না জানতাম, আমরা হয়তো ভাবতাম, 'ওহ, দেখো তুষারকণাগুলো খুবই সুন্দর, সবই অনন্য। এত অসংখ্য মিলিয়ন পৃথক ডিজাইন করতে দক্ষ চির-উর্বর মনসহ প্রতিভাবান কোনো পরিকল্পক নিশ্চয়ই এগুলো পরিকল্পনা করেছেন'। কিন্তু যেমন আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি, তুষারকণা এবং অন্য সুন্দর স্ফটিকগুলো পেইলির সেই পাথরের টুকরোর মতোই, পেইলির ঘড়ির মত নয়। এদের সুন্দর আর জটিল প্রতিসাম্যতা বিষয়ে বিজ্ঞান আমাদের পূর্ণ এবং সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়েছে, এবং এছাড়া এগুলোর প্রতিটি কেন অনন্য বিজ্ঞান আমাদের সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছে। পেইলির পাথরের মত তুষারকণা ঘটনাক্রমেই সৃষ্টি হয়। যখন অণুগুলো - অথবা সাধারণভাবে কোনোকিছু - স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের এই ধরনের বিশেষ আকৃতিতে গড়ে তোলে। যখন তারা এভাবে গড়ে ওঠে, সেই প্রক্রিয়াটিকে বলে সেলফ-অ্যাসেম্বলি, বা স্ব-সন্নিবেশন। আমি মনে করি আপনি বুঝতে পারছেন কেন। এই সেলফ-অ্যাসেম্বলি বা স্ব-সন্নিবেশন জীবিত কোনো সত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমরা খুব শীঘ্রই সেটি দেখবো। এই অধ্যায়টি হবে জীবনের সেলফ-অ্যাসেম্বলি বা স্ব-সন্নিবেশন নিয়ে। (সেলফ অ্যাসেম্বলি হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যেখানে ইতোমধ্যে বিদ্যমান উপাংশগুলো একটি বিশৃঙ্খল পদ্ধতি বাইরের কোনো নির্দেশনা ছাড়াই একটি সংগঠিত কাঠামো বা বিন্যাস গড়ে তোলে উপাংশগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট স্থানীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণতি হিসাবে) ।

জীবন্ত সত্তাগুলোর মধ্যে স্ব-সন্নিবেশন প্রক্রিয়ায় আমার চ্যাম্পিয়ন উদাহরণটি ছবি এই অধ্যায়ের শিরোনাম পাতায় ছাপা হয়েছে। এটি হচ্ছে একটি ভাইরাস, 'ল্যামডা ব্যাকটেরিওফাজ'। সব ভাইরাসই পরজীবি, এবং এটি, এর নাম যেমন ইঙ্গিত দিচ্ছে – ব্যাকটেরিওফাজ - অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াদের আক্রমণ করে। আমি মনে করি আপনিও একমত হবেন যে এটি দেখতে চাঁদে অবতরণ করা কোনো ল্যুনার ল্যান্ডারের মত। আর এটি ঠিক সেভাবে কাজও করে। একটি ব্যাকটেরিয়ামের পৃষ্ঠদেশে অবতরণ করা পর এটি এর পাগুলোর উপর ভর কর নিজেকে খুব স্থিরভাবে দৃঢ় করে। তারপর এটি ব্যাকটেরিয়ামের কোষপর্দায় একটি ছিদ্র সৃষ্টি করে এবং এর কেন্দ্রীয় 'লেজ' ব্যবহার করে ইনজেকশনের মত এটি এর ডিএনএ জিনোমটি ব্যাকটেরিয়াম কোষের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়, এই কেন্দ্রীয় 'লেজ'টিকে এর হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ বলাই উত্তম।

ব্যাকটেরিয়াটির অভ্যন্তরীণ নিজস্ব অঙ্গানুগুলো ভাইরাস ডিএনএ আর এর নিজের ডিএনএ'র মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারে না। ভাইরাসের ডিএনএ অর্থাৎ জিনোমের কোড বা সাংকেতিক নির্দেশগুলো অনুসরণ করা ছাড়া এগুলোর আর কিছুই করার থাকে না, এবং এটি ব্যাকটেরিয়ার সেই যন্ত্রগুলোকে আরো বহু সংখ্যক ভাইরাস তৈরি করতে নির্দেশ দেয়, যে ভাইরাসগুলো এরপর ব্যাকটেরিয়াটির কোষ পর্দা বিদীর্ণ করে বাইরে বের হয়ে আসে, এবং আরো নতুন ব্যাকটেরিয়ার উপর অবতরণ করে একই ভাবে সেগুলোকে পুনঃসংক্রমণ করতে। কিন্তু এই অধ্যায়ের জন্যে যে বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক সেটি হচ্ছে - ভাইরাসে শরীরটি স্ব-সন্নিবিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়, যেভাবে স্ফটিক তৈরি হয়। অথবা এক গুচ্ছ স্ফটিকের মত সেটি গড়ে ওঠে। এর মাথাটি আসলেই দেখতে ঐ ধরনের একটি স্ফটিকের মত যা কিনা আপনি গলায় ঝোলাতে পারেন (যদিও এগুলো আকারে অতিক্ষুদ্র)। এই মাথাটি এবং ভাইরাসের অন্য সব অংশই আক্রান্ত মধ্যে ভাসমান উপাংশ অণুগুলো দিয়ে ঠিক স্ফটিকের মত স্ব-সন্নিবেশনের মাধ্যমে নিজেদের গড়ে তোলে ইতোমধ্যে বাড়তে থাকা স্ফটিকে উপাংশগুলো তাদের সঠিক জায়গামত বসিয়ে।

যখন আমি স্ফটিক নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিলাম, আমি একটি রুপক ব্যবহার করেছিলাম, 'প্যারেডে সজ্জিত সৈন্যরা' এবং পরস্পর 'সংযুক্ত বাহু'। এখানে এখন আমরা খানিকটা ভিন্ন রুপক ব্যবহার করবো: একটি জিগস পাজল। আপনি ক্রমশ বাড়তে থাকা স্ফটিককে একটি অসমাপ্ত জিগস পাজল হিসাবে ভাবতে পারেন। ঠিক যেমন একটি জিগস হয়তো করতে পারে. এটি ঠিক মাঝখান থেকে বাইরের দিকে বাড়তে থাকতে পারে, যখন জিগস'র টুকরোগুলো এর প্রান্তসীমা বরাবর যুক্ত হতে থাকে। কিন্তু সাধারণ একমাত্রিক ধাঁধার ব্যতিক্রম, যা টেবিলের উপর বিছানো থাকে, একটি স্ফটিক হচ্ছে ত্রি-মাত্রিক জিগস পাজল (এক ধরনের খেলা, যে খেলায় কাঠ বা বোর্ডের উপর কোনো ছবি সাঁটা হয় এবং পরে সেটি অনেকগুলো অসমান টুকরায় কাটা হয়, এবং পরে এলোমেলো এই খণ্ডাংশগুলো যুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি নির্মাণ করা হয়)।

এই অসমাপ্ত ধাঁধার চারপাশে, তরলে ভাসমান আছে হাজার হাজার জিগস পাজলের টুকরো। এটি পানিতে ভাসা সোডিয়াম আর ক্লোরাইড আয়ন হতে পারে। যখনই একটি ভাসমান উপাংশ একটি স্ফটিকে এসে ধাক্কা খায়, এটি সঠিক আকৃতির সেই 'গর্ত' খুঁজে নেয়, এবং নিজেকে সেই খালি জায়গায় আটকে ফেলে। সুতরাং এটি আরো একটি উপায় যেভাবে আমরা প্রান্তসীমা

বরাবর কীভাবে স্ফটিক বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই প্রক্রিয়াটির একটি দৃশ্যকল্প কল্পনা করতে পারি। এখন আমরা এই জিগস ধাঁধার রুপকটি জীবন্ত প্রাণীদের শরীরে মধ্যে কী ঘটছে সেটি ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করবো। বিশেষ করে আমরা এনজাইম বা উৎসেচক নিয়ে কথা বলবো। আর উৎসেচক কী আমরা সেটি কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবো।

সপ্তম অধ্যায়ে একটি কোষের মধ্যে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর সেই ছবিটার কথা স্মরণ করুন: সেই অতিমাত্রায় জটিল পরস্পর-সংযুক্ত তীর আর গোলাকৃতি চিহ্নের ডায়াগ্রামটি। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন একই কোষের অভ্যন্তরে খুবই ক্ষুদ্র সীমিত একটি জায়গায় পারস্পরিক বিক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ, এবং কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে কীভাবে ঐসব ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো ঘটছে। ধরুন আপনি একটি রসায়ন গবেষণাগারে গেলেন, সেখানে তাকে সাজানো সব বোতলগুলো জড়ো করে সেগুলোর মধ্যে থাকা রাসায়নিক দ্রব্যগুলো বিশাল একটি পাত্রের মধ্যে সব একত্রে ঢেলে দিলেন। আপনি ভয়ঙ্কর একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন, হয়তো ভয়াবহ কিছু বিক্রিয়ার সূচনা করতে পারেন, এমনকি কিছু বিস্ফোরণও। অথচ কোনো একটি উপায়ে জীবিত কোষে বহু রাসায়নিক দ্রব্য পরস্পরের সাথে কোনো ধরনের সংস্পর্শ এড়িয়ে পৃথক থাকতে পারে। কেন তারা পরস্পরের সাথে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করছে না? যেন মনে হয় কোষের মধ্যে এগুলো পৃথক পৃথক বোতলে অবস্থান করছে। কিন্তু এগুলো সেখানে সেভাবে থাকে না। তাহলে কীভাবে এটি কাজ করে?

এই উত্তরের অংশ বিশেষ হচ্ছে, কোষের অভ্যন্তরটি একটি একক বিশাল পাত্রের মত নয়। এটি নানা ধরনের জটিল মেমব্রেন বা পর্দা দিয়ে বিন্যস্ত একটি পদ্ধতি দ্বারা পূর্ণ এবং এগুলো টেস্ট টিউবের কাচের দেয়ালের মত কাজ করতে পারে। কিন্তু সেটি পুরো কাহিনী নয়। আরো অসাধারণ কিছু সেখানে আসলে ঘটছে। এবং এখানেই আমরা এনজাইম বা উৎসচেকদের কাজ করতে দেখবো। উৎসেচক (বা এনজাইম) হচ্ছে ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটক। একট অনুঘটক হচ্ছে এমন একটি জিনিস যা কোনো একটি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে নিজেদেরকে সেই বিক্রিয়ায় অপরিবর্তিত রেখে। এটি এক ধরনের দ্রুত-কর্মক্ষম ‘মিনিয়েচার’ বা ক্ষুদ্রাকৃতির গবেষণাগার-সহকারীদের মত। অনুঘটকগুলো মাঝে মাঝে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে মিলিয়ন গুণ দ্রুততর করতে পারে, আর উৎসেচক এই কাজ করতে আসলেই অনেক বেশি দক্ষ। ঐ সব রাসায়নিক দ্রব্যগুলো, একত্রে একই জায়গায় যা অবস্থান করছে, সেগুলো পরস্পরের সাথে কোনো বিক্রিয়ায় অংশগ্রহন করে না যতক্ষণ না সেখানে

কোনো একটি অনুঘটক উপস্থিত থাকে। এবং প্রতিটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট একটি অনুঘটক উপস্থিত থাকতে হবে। কোনো একটি বিশেষ বিক্রিয়া সক্রিয় হয়ে ওঠে শুধুমাত্র যখন সেই বিক্রিয়াটির দরকার হয়, যখন সঠিক উৎসেচকটি (অনুঘটক হিসাবে) এর সাথে যুক্ত হয়। আপনি হয়তো উৎসেচককে ভাবতে পারেন একটি সুইচ হিসাবে ভাবতে পারেন, প্রায় যে-কোনো একটি ইলেকট্রিক সুইচের মতো, যা 'অন' (সক্রিয়) আর 'অফ' (নিষ্ক্রিয়) করা যেতে পারে। শুধুমাত্র যখন কোষের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট উৎসেচক উপস্থিত থাকে তখন একটি সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়াটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি আরো সূক্ষ জটিলতার মাধ্যমে উৎসচেকগুলো অন্য উৎসেচকগুলোকেও 'সক্রিয়' করে তুলতে পারে। আপনি দেখতে পারছেন কীভাবে অসাধারণভাবে সূক্ষ্ম একটি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্মাণ করা যেতে পারে 'সুইচ'গুলো ব্যবহার করে- যে সুইচগুলো অন্য আরো সুইচকে সক্রিয় করে তুলতে পারে।

অন্তত রূপরেখায় আমরা জানি কীভাবে উৎসেচকগুলো কাজ করে। এখানেই জিগস ধাঁধার ধারণাটি আবার দরকার হবে। চিন্তা করুন ঐসব শত শত অণু কোষের মধ্যে যেগুলো দ্রুতগতিতে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে জিগস পাজলের টুকরোগুলোর মত। অণু 'ক'-এর 'খ' অণুকে খুঁজে বের করা দরকার, যেন তারা যুক্ত হয়ে 'কখ' তৈরি করতে পারে। এই ক/খ 'বিবাহ' হচ্ছে সপ্তম অধ্যায়ের সেই 'স্প্যাগেটি' ডায়াগ্রামটির বহু শত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার শুধুমাত্র একটি। সম্ভাবনা আছে যে, একটি 'ক' অণুর সাথে একটি 'খ' অনুর ঘটনাক্রমে হঠাৎ করে দেখা হয়ে যেতে পারে। এবং এমনকি আরো ক্ষুদ্র সম্ভাবনা আছে যে, তারা সঠিক কোণে পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাবে, যেন নির্ধারিত জায়গায় যুক্ত হয়ে তারা একত্রিত হতে পারে। আর এমন কিছু এতটাই কদাচিৎ ঘটে যে, 'কখ' যে হারে তৈরি হয় সেটি অত্যন্ত ধীর গতির একটি প্রক্রিয়া, এতই ধীর যে, যদি ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয়া হয় এটি বলতে গেলে কখনোই ঘটে না। (এটি আমাকে আমার প্রথম স্কুল রিপোর্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন আমার বয়স সাত: ডকিন্সের মাত্র তিনটি গতি আছে, ধীর, খুব ধীর এবং থেমে যাওয়া')। কিন্তু একটি উৎসেচক আছে যার সুনির্দিষ্ট কাজ হচ্ছে যে হারে 'ক' অণুগুলো 'খ' অণুগুলোর সাথে যুক্ত হয় সেই হারটিকে দ্রুততর করে তোলা। এবং বহু উৎসেচকের ক্ষেত্রে এই 'গতি দ্রুততর' করা আসলেই একটি ন্যূনোক্তি। আবারো, এই প্রক্রিয়াটি জিগস মূলনীতি ব্যবহার করেই কাজ করে।

একটি উৎসেচক অণু মূলত এর উপরিপৃষ্ঠ জুড়ে বহু স্ফীত উঁচু অংশ আর ফাটল বা খাঁজসহ বেশ বড় জটিল একটি পিণ্ড। যখন আমি 'অনেক বড়' শব্দটি ব্যবহার করছি, সেটি আসলে শুধুমাত্র আণবিক আকারে সাধারণ মানদণ্ড অনুযায়ী বড় বোঝাতে চাইছি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত কোনো মানদণ্ডে এটি খুবই ক্ষুদ্র, সাধারণ আলো ব্যবহার করা যৌগিক কোনো আণুবীক্ষণিক যন্ত্র দিয়ে এটি দেখা সম্ভব নয়। আসুন আমরা সেই বিশেষ উৎসেচকটি নিয়ে আলোচনা করি, যে উৎসেচকটি আমাদের 'কখ' বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এর পৃষ্ঠদেশের খাঁজ বা ফাটলগুলোর মধ্যে একটি 'ক' আকারের গর্ত আছে যা ঘটনাচক্রে ঠিক 'খ' আকারের গর্তের পাশেই অবস্থিত। আর সে কারণে এটি দক্ষ একটি 'গবেষণা-সহকারী', ক/খ যুক্ত হবার প্রক্রিয়াটিকে আরো গতিশীল করার জন্য যা বিশেষভাবে দক্ষ। একটি 'ক' অণু জিগস ধাঁধার টুকরোর মত 'ক'-আকৃতির গর্তে পড়ছে এবং 'খ' আকৃতির অণুটি জিগস নিয়মে 'খ' আকৃতির গর্তে পড়ছে। আর যেহেতু ঠিক যেভাবে থাকার দরকার এই দুটি গর্ত পাশাপাশি অবস্থিত। সে কারণে 'ক' এবং 'খ' পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে 'কখ' তৈরি করতে ঠিক সঠিক কোণে নিকটে আসার সুযোগ পায় । নতুন সৃষ্ট 'কখ' এরপর সেই গর্তগুলো থেকে বের হয়ে আসে এবং কোষের ভিতরে ভেসে চলে যায়, আর পেছনে রেখে যায় সে সুনির্দিষ্ট আকৃতির গর্তগুলো - যা আরেকটি 'ক' এবং অন্য একটি 'খ' এর সাথে একই কাজ করার জন্য মুক্ত। সুতরাং উৎসেচক অনুগুলোকে শুধু গবেষণা-সহকারী হিসাবেই নয় বরং এক ধরনের কারখানার যন্ত্র হিসাবে দেখা যেতে পারে, যা 'ক' এবং 'খ' কাচামালের স্থিতিশীল সরবরাহ ব্যবহার করে 'কখ' অণু তৈরি করা অব্যাহত রাখে। এবং ঐ কোষ এবং শরীরের অন্য কোষে, আরো উৎসেচক আছে, উপরিপৃষ্ঠে সঠিক 'খাঁজ' অথবা 'ভাজ'সহ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্রুততর করে তুলতে যেগুলো প্রত্যেকটি নিখুঁত আকৃতি বিশিষ্ট। অর্থাৎ আমি অবশ্যই একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি - আমার 'খাঁজ' এবং 'আকার' ইত্যাদি শব্দগুলো আসলে অতিমাত্রায় সরলীকরণ, কিন্তু তারপরও এই শব্দগুলো আমি ব্যবহার করা অব্যাহত রাখবো কারণ এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণে এটি সহায়ক। 'আকৃতি' শুধুমাত্র ভৌত আকৃতি নয় রাসায়নিক আসক্তিও বোঝাতে পারে।

বহু শত উৎসেচক আছে, যেগুলোর প্রত্যেকটির আকৃতি ভিন্ন, প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া তরান্বিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় আকৃতি ধারণ করে। কিন্তু অধিকাংশ কোষে শুধুমাত্র একটি অথবা বিদ্যমান উৎসচেকগুলোর মধ্যে অল্প কিছু থাকে। উৎসেচকগুলো হচ্ছে (যদিও একমাত্র নয়) সেই ধাঁধার প্রধান উত্তর

- কেন রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো সব একসাথে ঘটছে না, কেন একটি বিক্রিয়া অন্য বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে না।

উৎসেচক অনুগুলোকে জাদুর মত মনে হতে পারে। ঠিক যেমন দ্রুত দৌড়ানোর জন্যে চিতার পা খুব সুন্দর আকৃতি নেয়, বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি তরান্বিত করতে উৎসেচকগুলোও চমৎকারভাবে এর আকৃতি নেয়। উৎসেচক প্রতি শুধুমাত্র একটি বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়া। কিন্তু কীভাবে উৎসেচকগুলো তাদের সেই সুন্দর আকৃতিটি পায়? কোনো স্বর্গীয় আণবিক ভাস্কর কী সেগুলো এই আকৃতিতে খোদাই করে সৃষ্টি করেছেন? না, বাড়তে থাকা স্ফটিকগুলো যা করে সেই প্রক্রিয়াটির আরো একটি জটিল সংস্করণ ব্যবহার করে এগুলো নিজেদের তৈরি করে । আবারো এখানে স্ব-সন্নিবেশন প্রক্রিয়াটি কাজ করছে।

প্রতিটি প্রোটিন (বা আমিষ) অণু অ্যামাইনো এসিড নামে আরো ক্ষুদ্রতর অণুর একটি শিকল। বহু ধরনের অ্যামাইনো এসিড আছে, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে মাত্র ২০ টি অ্যামাইনো এসিড আমরা জীব দেহে পাই। তাদের প্রত্যেকটির নাম আছে, আমি সেই বিশটি নামই এখানে লিখতে পারি, কিন্তু বিস্তারিত বিষয় নিয়ে এখানে আমরা নাই বা ভাবলাম। ২০ টি অ্যামাইনো এসিড আছে, এখানে আপাতত আমাদের এতটুকু জানলেই চলবে। প্রতিটি প্রোটিন অণু হচ্ছে অ্যামাইনো এসিডের ‘পুঁতি’ দিয়ে তৈরি একটি ‘নেকলেস’-এর মত (একটি নেকলেস যার পেছন আটকানো না, অর্থাৎ কোনো বদ্ধ লুপ নয়)। যে অ্যামাইনো এসিডগুলো দিয়ে প্রত্যেকটি প্রোটিন তৈরি হয়, সে অ্যামাইনো এসিডগুলোর (পুঁতি) সঠিক অনুক্রমের উপর নির্ভর করেই প্রোটিনগুলো পরস্পর থেকে ভিন্ন। আর এ সব অ্যামাইনো এসিডই নেয়া হয়েছে ২০ ধরনের অ্যামাইনো এসিডের লাইব্রেরী থেকে: ২০ ধরনের ‘পুঁতি’।

আপনি হয়তো মনে করতে পারবেন যে, কীভাবে লবনের স্ফটিকগুলো গড়ে ওঠে যখন পানিতে ভাসমান জিগস’র খণ্ডাংশগুলো স্ফটিকের প্রান্তে তাদের ‘বীপরিত সঙ্গীকে’ শনাক্ত করে এবং নির্দিষ্ট খাঁজে নিজেদের যুক্ত করে। বেশ, এবার একটি প্রোটিন নেকলেসের পুঁতিগুলোকে ২০ ধরনের জিগস ধাঁধার টুকরো নেয়া একটি নির্বাচন হিসাবে ভাবুন। এবং তাদের কিছু অন্য জিগস টুকরো সাথে খাপে খাপ খাইয়ে নেয় ‘একই শিকলে কোনো একটি জায়গায়’। আর এর পরিণতি হচ্ছে নিজেই নিজেই জিগস ধাঁধার টুকরোর মত আচরণ করা বা স্ব-সন্নিবেশন, যা পুরো শিকলটি জুড়ে নানা জায়গায় ঘটে, আর সেকারণে

এই শিকলটিও ভাজ হয়ে বিশেষ আকৃতি নেয়। এটি টুকরো সুতার মত যা নিজেই নিজেকে খুবই নির্দিষ্ট একটি গিটে পেচিয়ে ফেলছে।

স্ফীত উঁচু অংশ আর খাঁজ বা ফাটলসহ একটি জটিল পিণ্ড হিসাবে আমি একটি উৎসেচক অণুকে বর্ণনা করেছিলাম। বর্ণনাটি শুনলে এই অণুটিকে আর ধারাবাহিকভাবে সাজানো অ্যামাইনো এসিড অণুর কোনো শিকল বলে মনে হয় না, মনে হয় কী? কিন্তু এটি আসলেই একটি শিকল, বিষয়টি হচ্ছে যে, অ্যামাইনো এসিড দিয়ে তৈরি যে-কোনো শিকলেরই সুনির্দিষ্ট ত্রি-মাত্রিক আকৃতি নিয়ে ভাজ হবার প্রবণতা আছে। আমি যেমন বলেছিলাম, অনেকটা নিজেই নিজের একটি গিট্টু বাধার মত। 'ফোলা উঁচু অংশ আর খাঁজসহ পিণ্ড হচ্ছে গিট্টু আকৃতির, যা শিকলটি নিজেরই স্ব-সন্নিবেশ। শিকলের সংযোগগুলো শিকলের অন্য নির্দিষ্ট সংযোগগুলোর প্রতি আকর্ষিত হয়, এবং সেখানে একটি আটকে যায়, জিগস এর মত। আর এ সব সংযোগগুলো অ্যামাইনো এসিডের কোনো একটি নির্দিষ্ট শিকল যেন প্রতিটি ক্ষেত্রে একই স্ফীত অংশ আর খাঁজসহ একই আকৃতিতে যেন ভাজ হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করে।

আসলেই এটি সবসময়ের জন্য পুরোপুরিভাবে সত্য নয় - এবং নিয়মের ব্যতিক্রমগুলো বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। কিছু শিকল দুটি বিকল্প গিঁটের মধ্যে যে-কোনো একটি উপায়ে এদের নিজেদের বাধতে পারে। আর সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু আমি সেই আলোচনা এখানে উহ্য রাখবো কারণ এই অধ্যায়টি এমনিতেই বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য পূরণে, আমরা প্রতিটি প্রোটিন অণুকে জিগসের ধাঁধার টুকরোগুলো (অ্যামইনো এসিড) দিয়ে তৈরি একটি শিকল হিসাবে ভাবতে পারি, যা একটি সুনির্দিষ্ট আকৃতি নিয়ে নিজেকে ভাজ করে ত্রিমাত্রিক একটি কাঠামো তৈরি করে। এই আকৃতি বা ত্রিমাত্রিক রূপ আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ, আর অ্যামাইনো এসিডের একটি সুনির্দিষ্ট সজ্জা এই আকৃতিটি এবং জিগস ধাঁধার টুকরোগুলো মত একই শিকলে অন্য অ্যামাইনো এসিডের সাথে সুনির্দিষ্ট বন্ধনে যুক্ত হবার প্রবণতাটিকে নির্ধারণ করে।

এখানে একটি ছোটো গল্প না বলে আমি পারছি না, যা এর সাথে সংযুক্ত মনে নাও হতে পারে কিন্তু এটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপভাবে জিগস ধাঁধার টুকরোগুলোর খাপে খাপ লেগে যাওয়ার ধারণাটিকে বেশ আলোকিত করতে পারে। এটি আমাদের ঘ্রাণশক্তি সংক্রান্ত। একটি গোলাপের গন্ধ কল্পনা করুন, অথবা

মধু'র, অথবা পেয়াজ, আপেল, স্ট্রবেরী, মাছ, একটি সিগার, একটি বদ্ধ জলাভূমি। প্রতিটি গন্ধ কিন্তু পরস্পর থেকে ভিন্ন, ভুল হওয়ার উপায় নেই, সুন্দর অথবা অসহনীয়, ধোয়াটে অথবা ফলের মত, সুবাসিত অথবা দুর্গন্ধ। কীভাবে বায়ুবাহিত এই সব অণুগুলো আমাদের নাকে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধের অনুভূতির জন্ম দেয়? এর উত্তর আবারো জিগস মূলনীতি। আপনার নাকের ভিতর আবৃত করা কোষের স্তরের উপর সহস্র ধরনের বিচিত্র আকারের আণবিক খাঁজ বা ফাটল আছে, যেগুলো প্রতিটি সঠিক আকৃতির অণুর জন্য অপেক্ষমান, যেন সেটি জায়গা মত সে খাঁজে প্রবেশ করতে পারে । ধরুন একটি অণু, যেমন আসিটোন (নেইল পালিশ মোছার তরল) খুব চমৎকারভাবে অ্যাসিটোন আকৃতির খাঁজে বা গর্তে নিজেকে আটকাতে পারে, ঠিক জিগস ধাঁধার টুকরোর মত। আর অ্যাসিটোন আকৃতির সেই খাঁজ মস্তিষ্কে একটি বার্তা পাঠায় এই বলে যে, 'আমার ধরনের অণু এখনই এখানে জায়গামত বসেছে'। মস্তিষ্ক 'জানে' এই সুনির্দিষ্ট খাঁজটি অ্যাসিটোন-আকৃতির খাঁজ সুতরাং মস্তিষ্ক 'চিন্তা' করে: 'আহ, নেইল পালিশ রিমুভার'। একটি গোলাপের গন্ধ, অথবা খুব ভালো পুরানো মদ, জিগস অণুদের বেশ জটিল একটি মিশ্রণ দিয়ে তৈরি, অ্যাসিটোনের মত শুধু একটি অণু নয়। কিন্তু এখানে মূল বিষয়টি একই: আণবিক জিগস ধাঁধার মূলনীতি এখানে কাজ করছে।

আবার মূল গল্পে ফিরে আসা যাক, আমরা দেখেছি যে, নেকলেসে অ্যামাইনো এসিডগুলোর (পুঁতি) অনুক্রম - স্ব-সন্নিবেশন জিগস পক্রিয়ার মাধ্যমে - প্রোটিন 'গিঁট'-এর প্যাচানো বহু খাঁজসহ খানিকটা এবড়ো থেবড়ো আকৃতির জন্য দায়ী। এবং আমরা দেখেছি যে, এই খাঁজগুলো আবার উৎসেচক হিসাবে কোনো একটি প্রোটিনের সুনির্দিষ্ট ভূমিকার জন্য দায়ী, যা কোনো একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়াকে তরান্বিত করে – সাধারণত এত বেশি মাত্রায়, যা কোনো কিছুকে সক্রিয় করে তোলার মত। কোনো একটি সময়ে বহু ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া একটি কোষে চলমান থাকতে পারে। সেই বিক্রিয়ায় অংশ নেয়া সব উপাদানই সেখানে আছে, বিক্রিয়ার জন্য যেগুলো প্রস্তুত। তবে সেগুলোর প্রত্যেকটির যা দরকার সেটি হচ্ছে সঠিক একটি উৎসেচক। এবং বহু ধরনের উৎসেচক সেখানে থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে মাত্র একটি অথবা অল্প কয়েকটি সেই বিক্রিয়ার জন্যে সঠিক। সুতরাং কোন উৎসেচক সেখানে উপস্থিত আছে সেটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারাই নির্ধারণ করে সেই কোষ কী করে। আসলেই বলা যায়, কোষটি কী, তারা সেটাই নির্ধারণ করে।

আপনার মনে হয়তো এখন একটি প্রশ্ন আবির্ভূত হয়েছে - কোনো একটি নির্দিষ্ট উৎসেচকের 'নেকলেসে' অ্যামাইনো এসিডগুলোর (পুঁতি) অনুক্রম নির্ধারণ করে 'কী', এবং যে কারণে এটি অমসৃণ এবড়ো-থেবড়ো রূপটি পায় যখন সেই শিকলটি নিজেই নিজেকে ভাজ করে সংগঠিত করে? অবশ্যই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কারণ এর উপর অন্য আরো অনেক কিছুই নির্ভরশীল।

এবং এর উত্তর হচ্ছে: বংশগতির তথ্য বহনকারী অণু, ডিএনএ। একটি উত্তর যার গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করে বলা অসম্ভব। আর সেকারণে আমি এটিকে একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে আলোচনা করছি।

একটি প্রোটিন অণুর মত, 'ডিএনএ' অণু একটি শিকল, জিগস টুকরো দিয়ে গঠিত একটি নেকলেস। কিন্তু এখানে পুঁতিগুলো অ্যামাইনো এসিড নয়, এই উপাংশগুলো হচ্ছে রাসায়নিক একক, যাদের 'নিউক্লিওটাইড বেস' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এবং এখানে সেগুলো ২০ প্রকারের হয় না, শুধু ৪ ধরনের নিউক্লিওটাইড বেস আছে। এই বেসগুলোর নাম সংক্ষেপিত করে চিহ্নিত করা হয়: 'এ', 'টি', 'সি' এবং 'জি' (অ্যাডেনিন, থাইমিন, সাইটোসিন, গুয়ানিন) 'টি' শুধু 'এ'-এর সাথে যুক্ত হয় (এবং 'এ' শুধু 'টি'-এর সাথে), 'সি' শুধুমাত্র 'জি' এর সাথে (আর 'জি' শুধুমাত্র 'সি'-এর সাথে)। একটি ডিএনএ অণু হচ্ছ খুব দীর্ঘ একটি শিকল, প্রোটিন অণুর চেয়েও অনেক বেশি দীর্ঘ। কোনো একটি প্রোটিন শিকলের ব্যতিক্রম ডিএনএ শিকল নিজে নিজেই কোনো 'গিঁট' তৈরি করে। এর পরিবর্তে - দীর্ঘ একটি শিকল হিসাবে থাকে - আসলে দুটি শিকল যা অসাধারণ সুন্দর সর্পিলকার একটি সিড়ির মত পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। সে সিড়ির প্রতিটি 'ধাপ' আসলে পরস্পরের সাথে জিগস ধাঁধার টুকরোর মত যুক্ত হওয়া এক জোড়া 'বেস', মাত্র চার ধরনের 'ধাপ' (জোড়া বেস) শুধু আমরা দেখতে পাই।

এ – টি
টি – এ
সি – জি
জি – সি

এই বেসগুলোর অনুক্রমই জেনেটিক বা বংশগতির তথ্য বহন করে, একটি কম্পিউটার ডিস্ক যেভাবে তথ্য বহন করে (প্রায় একই ভাবে) আর এই তথ্যটি

দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে ব্যবহৃত হয়: জিনগত (জেনেটিক) এবং ভ্রূণগত (এমব্রায়োলজিকাল)।

জিনগত উপায় হচ্ছে শুধু অনুলিপন প্রক্রিয়া। এটি জিগস সংযোগ প্রক্রিয়ার আরো জটিল একটি সংস্করণ, যার মাধ্যমে পুরো সিড়িটিরই অনুলিপন হয়। এটি ঘটে যখন কোষ বিভাজিত হয়। ভ্রূণগত উপায়টিও বিস্ময়কর। বংশগতির কোড বা সংকেতের অক্ষরগুলো পড়া হয় ট্রিপলেট বা তিন (ত্রয়ী) বেস অনুসারে, একবারে তিনটি বেস করে। চারটি বেসের (৪ × ৪ × ৪ = ৬৪) ৬৪ টি সম্ভাব্য 'ট্রিপলেট' আছে, এবং ঐ সব ৬৪ টি ট্রিপলেটের প্রতিটি হয় যতিচিহ্ন, নয়তো ২০ টি আবশ্যিক অ্যামাইনো এসিডের কোনো একটিকে 'পড়া' হয়, এবং সেই সংকেত দ্বারা নির্দেশিত অ্যামাইনো এসিডগুলো একটি প্রোটিন অণুর শিকল তৈরি করে। যখন আমি বলি 'পড়ছে', অবশ্যই কেউ সেটি 'পড়ছে' না। আরো একবার এই সবকিছুই ঘটছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই জিগস মূলনীতি ব্যবহার করে। আমি বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু এই বইটির বিষয় সেটি নয়। আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, একটি ডিএনএ'র সূত্র বরাবর চার ধরনের বেসের অনুক্রম, যখন তিনটি বেস করে পড়া হয়, সেটি কোনো একটি প্রোটিন শিকলে ২০ ধরনের অ্যামাইনো এসিডের অনুক্রম নির্ধারণ করে। অ্যামাইনো এসিডের অনুক্রম তারপর নির্ধারণ করে কীভাবে সেই প্রোটিনের শিকলটি কুণ্ডলী পাকিয়ে 'গিঁট' তৈরি করবে। 'গিঁটে'র আকৃতি (এর ফাটল বা খাঁজ এবং অন্যান্য বিষয়গুলো) নির্ধারণ করে কীভাবে এটি উৎসেচক হিসাবে কাজ করে, এবং সেই কারণে কোষের মধ্য নির্দিষ্ট কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে এটি সক্রিয় করে তোলে। এবং কোনো একটি কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোই নির্ধারণ করবে এটি কোন ধরনের কোষ এবং কীভাবে এটি আচরণ করবে। পরিশেষে –এবং এটি সম্ভবত সবেচয়ে বেশি বিস্ময়কর – একটি ভ্রূণে একত্রে কাজ করা কোষগুলোর আচরণ নির্ধারণ করে কীভাবে ভ্রূণটি বিকশিত হয় এবং একটি শিশুতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং, চূড়ান্তভাবে আমাদের ডিএনএ আসলে নির্ধারণ করে কীভাবে আমরা প্রত্যেকেই একক একটি কোষ থেকে বৃদ্ধি হয়ে একটি শিশুতে পরিণত হই এবং তারপর আমরা এখন যা তেমন বড় হয়ে উঠি। এটি হচ্ছে পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়।

১০ বটম আপ নাকি টপ ডাউন?

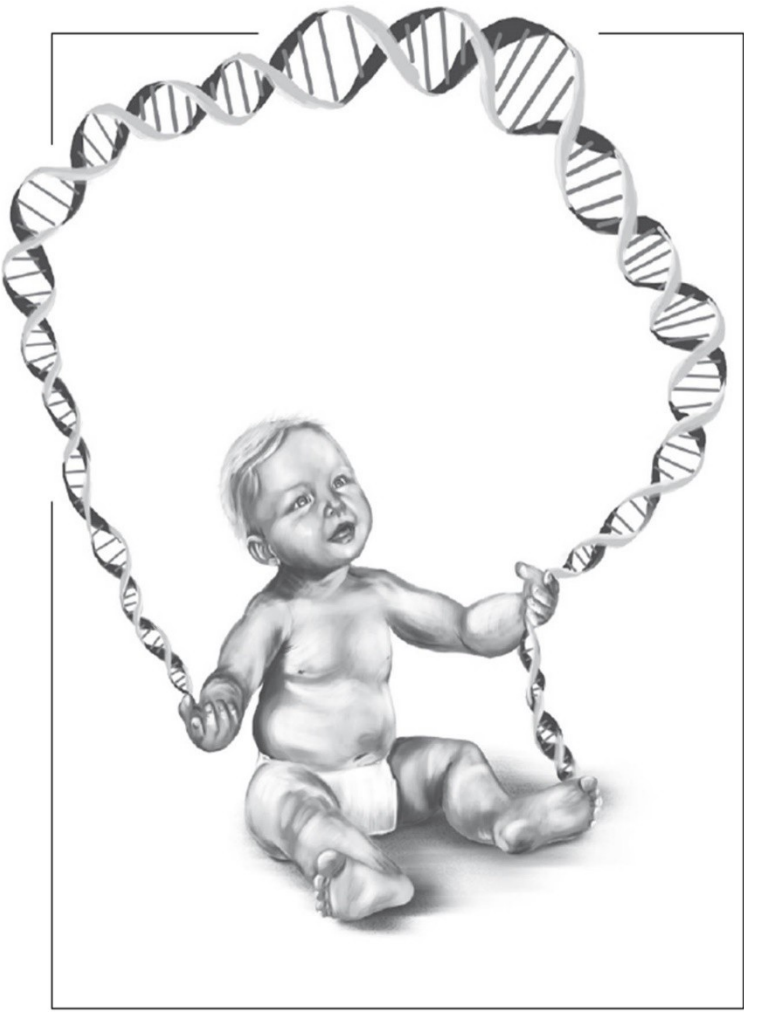

বিংশ শতাব্দীর মহান একজন বিজ্ঞানী এবং বর্ণিল একজন চরিত্র, জে. বি. এস. হলডেন একবার সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত একটি সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হলে শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন নারী উঠে দাড়িয়ে এরকম কিছু বলেছিলেন:

> ‘অধ্যাপক হলডেন, আপনি কথা মতো, এমনকি যদি বিবর্তনের জন্য বিলিয়ন বছর সময় ছিল বলে মেনেও নেই, আমি কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে, একটি একক কোষ থেকে অস্থি, মাংসপেশী এবং স্নায়ু, বহু দশক ধরে বিরতিহীনভাবে পাম্প করে যাওয়া একটি হৃৎপিণ্ড, মাইলের পর মাইল রক্ত আর বৃক্ক নালিকা, এবং চিন্তা, অনুভব আর কথা বলতে সক্ষম একটি মস্তিষ্ক রূপে সংগঠিত ট্রিলিয়ন সংখ্যক কোষের একটি জটিল মানব শরীর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব’।

হ্যালডেন চমৎকার একটি উত্তর দিয়েছিলেন: ‘কিন্তু ম্যাডাম, আপনি নিজেই সেটি করেছিলেন, আর সেটি করতে আপনার মাত্র নয় মাস সময় লেগেছিল’।

সেই নারী হয়তো পাল্টা প্রশ্ন করতে পারতেন, ‘আহ, কিন্তু বিকাশমান একটি ভ্রূণ হিসাবে আমার নয় মাস পরিচালিত করেছিল আমার পিতামাতা কাছ থেকে পাওয়া ডিএনএ, যারা তাদের ডিএনএ পেয়েছে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে, এভাবেই এটি এসেছে বহু প্রজন্মের বংশধারায়। ঐসব বহু বিলিয়ন সংখ্যক বছরের বিবর্তনে একটি শিশু তৈরি করার ডিএনএ নির্দেশাবলী ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠছিল। প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা যা গড়ে উঠেছিল এবং আরো সূক্ষ্ম আর দক্ষতর হয়ে উঠেছিল। শিশুদের তৈরি করার জন্য যে জিনগুলো দক্ষ ছিল সেগুলোই প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়েছিল সেই জিনগুলোর পরিবর্তে যেগুলো এই কাজটি করতে অদক্ষ ছিল।

একটি বেশ চমৎকার খ্রিস্টীয় স্তব সঙ্গীত (বা হিম) আছে, ‘সব কিছু উজ্জ্বল আর সুন্দর’। হয়তো আপনি সেটি শুনেছেন। এটি তার সৃষ্টি, বিশেষ করে জীবিত প্রাণীদের বিস্তারিত সৌন্দর্যের জন্য ঈশ্বরের প্রশস্তি:

> তিনি তাদের দ্যুতিময় রং সৃষ্টি করেছেন,
> তিনি তাদের ক্ষুদ্র ডানা বানিয়েছেন।

কিন্তু এমনকি যদি আপনি বিশ্বাসও করেন প্রাণী সৃষ্টিতে ঈশ্বরের হাত ছিল, আপনি কিন্তু অনুধাবন করতে পারবেন যে, তিনি 'প্রত্যক্ষভাবে' ঐসব উজ্জ্বল দ্যুতিময় রংগুলো অথবা ডানাগুলো, ক্ষুদ্র কিংবা অন্য যে-কোনো ডানা, সৃষ্টি করেননি। ডানা এবং উজ্জ্বল দ্যুতিময় রংগুলো এবং জীব শরীরের অন্য সব অংশগুলো ভ্রূণগত বিকাশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি একক কোষ থেকে নতুন করে বিকশিত হয়। এবং বেশ কিছু উৎসেচকের মাধ্যমে ভ্রূণগত বিকাশ প্রক্রিয়াটিকে তত্ত্বাবধান করে ডিএনএ, যা কীভাবে তৈরি হয় আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। যদি ঈশ্বর উজ্জ্বল দ্যুতিময় রং অথবা ক্ষুদ্র ডানাগুলোর 'ডিজাইন' করে থাকেন, তিনি সেটি করেছিলেন একটি ভ্রূণের বিকাশ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে। এখন আমরা জানি, এর অর্থ হচ্ছে ডিএনএ অণুকে নিয়ন্ত্রণ করা (যা আবার প্রোটিন এবং এর পরবর্তী ধাপগুলো নিয়ন্ত্রণ করে নানাবিধ উপায়ে, যা নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। এবং যদি (যা আসলেই সত্য) প্রাকৃতিক নির্বাচন (পরোক্ষভাবে) ঐসব উজ্জ্বল দ্যুতিময় রং বা ক্ষুদ্র ডানাগুলো ডিজাইন করে থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়াটিকেও ডিএনএ'র মাধ্যমেই সে কাজটি করতে হয়েছে। ডিএনএ শরীরগুলোর বিকাশ-প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করে, এবং ডিএনএ নিজেই বহু প্রজন্মব্যাপী প্রাকৃতিক নির্বাচনের 'তত্ত্বাবধানে' গড়ে ওঠে। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনই 'পরোক্ষভাবে' জীব শরীরগুলোর বিকাশ-প্রক্রিয়াটি 'তত্ত্বাবধান' করে।

আপনি হয়তো শুনেছেন, ডিএনএ হচ্ছে একটি শরীরের জন্য 'ব্লুপ্রিন্ট' বা নীলনকশা (পরিকল্পনা), কিন্তু সেটি বেশ গভীর একটি ভুল ধারণা। বাড়ি কিংবা গাড়ির একটি নীলনকশা থাকতে পারে। শিশুদের থাকে না। আর পার্থক্যটি পুরোপুরিভাবে পৃথক সেই বাস্তবতা থেকে : গাড়ি এবং বাড়িগুলো 'ডিজাইন' করা, কিন্তু শিশুরা 'ডিজাইন' করা নয়। এখানে আরো গভীর একটি পার্থক্য আছে। একটি বাড়ির (অথবা গাড়ির) প্রতিটি অংশের সাথে মূল পরিকল্পনা বা নীলনকশার প্রতিটি অংশের সরাসরি অনুরূপ (বা একটির অংশগুলোকে অন্যটির সংশ্লিষ্ট অংশগুলোর সাথে মেলানো যায়) সম্পর্ক আছে। বাড়ির পার্শ্ববর্তী অংশগুলোও নীলনকশায় চিত্রিত পার্শ্ববর্তীর অংশগুলোর অনুরূপ। বাড়ির নীলনকশা যদি হারিয়ে যায়, বাড়ির বিভিন্ন অংশের সূক্ষ্ম এবং সতর্ক পরিমাপগুলো সংগ্রহ করে এবং কাগজে সেই নির্দিষ্ট অনুপাত অনুযায়ী এঁকে আপনি আবার সেটি তৈরি করতে পারবেন। আমি আমার বাড়ির এমন একটি নকশা কেবলই শেষ করলাম। প্রতিটি ঘরের আকার ও আকৃতি পরিমাপ করতে একজন ব্যক্তি একটি লেজার গান নিয়ে এসেছিলেন এবং একটি করতে তার দুই

ঘন্টার মত সময় লেগেছিল। আমার বাড়ির পরিকল্পনার নির্ভুল একটি হুবহু অনুলিপি তৈরি করার জন্য যা যথেষ্ট ছিল।

আপনি কোনো শিশুর সাথে সেটি করতে পারবেন না। একটি ডিএনএ 'নীলনকশা' আর একটি শিশুর শরীরের বিভিন্ন অংশগুলোর পরস্পরের অনুরূপ নয় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিন্দুগুলোর মধ্য কোনো 'ম্যাপিং' করা যায় না। তাত্ত্বিকভাবে একটি উপায় থাকতে পারে, আর সেটি সম্পূর্ণ তুচ্ছ কোনো ধারণা নয়। প্রতিটি ঘর পরিমাপ করে সতর্কভাবে সৃষ্টি করা আমার বাড়ির পরিকল্পনাগুলো একটি কম্পিউটারে ডিজিটাইজ করা সম্ভব। একটি আধুনিক জেনেটিক গবেষণাগার যে-কোনো কম্পিউটার তথ্যকে ডিএনএ কোড বা সংকেতে রূপান্তর করতে সক্ষম, এবং আমার বাড়ির ডিজিটাইজড পরিকল্পনাটি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আপনি সেই ডিএনএ অণুটিকে একটি টেস্ট টিউবে ভরে আরেকটি জেনেটিক ল্যাবে পাঠাতে পারেন, যেমন জাপানে, যেখানে তারা সেই ডিএনএ অণুটি পড়তে পারবেন এবং বাড়ির পরিকল্পনার রেখচিত্রের বিশ্বস্ত একটি সংস্করণ ছাপাতেও পারবেন। এরপর আমার বাড়ির হুবহু একটি প্রতিলিপির জাপানেও নির্মাণ করা যেতে পারে। হয়তো অন্য কোনো গ্রহে এই ধরনের কিছু ঘটে যখন পিতা-মাতারা তাদের জিনগত তথ্য তাদের সন্তানদের কাছে পাঠাতে চান: পিতামাতার শরীরগুলো 'স্ক্যান' করা হয় এবং এটিকে তারপর একটি নীলনকশায় পরিণত করা হয়, এরপর সেটি ডিএনএ'তে ডিজিটাইজ করা হয় (অথবা সেই গ্রহে 'ডিএনএ' সমতূল্য কিছু)। এই ডিজিটাইজড স্ক্যান এরপর পরবর্তী প্রজন্মের শরীর তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের এই গ্রহে এই ধরনের কোনো কিছুই ঘটে না। আর আমি আপনাকে বলছি, আমার সন্দেহ আছে এভাবে এটি কখনোই কাজ করবে না, এমনকি যে-কোনো গ্রহেও এমন কিছু হবে না। এর একটি কারণ (বহু কারণের মধ্যে শুধুমাত্র একটি) পিতামাতার শরীরের একটি স্ক্যান মূল শরীরের কিছু বিষয় যেমন, কোনো ক্ষতচিহ্ন কিংবা ভাঙ্গা কোনো পা প্রতিলিপি না করে পারে না। প্রতিটি প্রজন্ম অতীতের সব পূর্বসূরিদের শরীরের সব ক্ষত আর ভাঙ্গা হাত-পা সেক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত করবে।

হ্যাঁ, ডিএনএ একটি 'ডিজিটাল' কোড, ঠিক কম্পিউটার কোডের মত। এবং হ্যাঁ, ডিএনএ পিতামাতা থেকে তাদের শিশুদের মধ্যে ডিজিটাল তথ্য হস্তান্তর করে এবং এভাবে অগণিত প্রজন্মের মধ্যে সেই তথ্য প্রবাহিত হয়। কিন্তু না, যে তথ্যটি হস্তান্তরিত হচ্ছে সেটি একটি নীলনকশা নয়। কোনো অর্থেই এটি শিশুর একটি মানচিত্র নয়। এটি পিতামাতার শরীরের একটি স্ক্যানও নয়। একটি

জেনেটিক ল্যাব এটি পড়তে সক্ষম হবে, কিন্তু তারা সেখান থেকে একটি শিশুকে প্রিন্ট করে বের করতে পারবে না। মানব ডিএনএ তথ্যকে একটি শিশুদের রূপান্তরিত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সেই ডিএনএ অণুটিকে কোনো নারী শরীরে মধ্যে স্থাপন করা!

যদি ডিএনএ কোনো শিশুর একটি নীলনকশা না হয়ে থাকে, তাহলে এটি কী? এটি 'কীভাবে একটি শিশু তৈরি করতে হয় তার একগুচ্ছ নির্দেশাবলী' এবং সেটি খুবই ভিন্ন একটি বিষয়। এটি অনেকটা কেক বানানোর রেসিপির মত। অথবা একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের মত, যার নির্দেশগুলো ক্রমানুসারে মান্য করতে হয়: প্রথমে এটা করো, তারপর ওটা করো, তারপর যদি এটা কিংবা ওটা সত্য হয়, তাহলে এটা... নতুবা করো... এবং এভাবে বহু সহস্র নির্দেশ। একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম খুব দীর্ঘ একটি রেসিপির মত, এর শাখা-প্রশাখাসহ যা আরো জটিল। একটি রেসিপি হচ্ছে খুব সংক্ষিপ্ত একটি প্রোগ্রামের মত, যেখানে ডজন খানেকের মত কিছু নির্দেশ থাকে। এবং একটি রেসিপি প্রতিবর্তনযোগ্য (আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া) নয়, যেভাবে কোনো একটি গাড়ি বা বাড়ি নির্মাণ প্রতিবর্তনযোগ্য। আপনি শুধু একটি কেক নিয়ে এবং সেটি পরিমাপ করে এর মূল রেসিপিটি আর কিন্তু পুণনির্মাণ করতে পারবেন না। এটি কী করছে সেটি দেখে আপনি কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রামকে (মূল প্রোগ্রামটি) পুণনির্মাণ করতে পারবেন না ।

যে উপায়ে বাড়ি তৈরি করা হয় সেটি হচ্ছে 'টপ ডাউন' পদ্ধতি। এখানে এই 'টপ' অর্থে, স্থপতির পরিকল্পনা হচ্ছে সবার উপরে। একজন স্থপতি এক গুচ্ছ বিস্তারিত পরিকল্পনা আঁকবেন: একটি পরিকল্পনা যেখানে সঠিকভাবে প্রতিটি রুমের মাপ থাকা থেকে শুরু করে, প্রতিটি দেয়াল কী দিয়ে তৈরি হবে, কীভাবে এটি শেষ করতে হবে, কোথা দিয়ে পানির পাইপ আর বৈদ্যুতিক কেবল যাবে, ঠিক কোথায় প্রতিটি দরজা বা জানালা হবে, ঠিক কোথায় চিমনি, ফায়ার প্লেস আর ভারবাহী লিন্টেল থাকবে তার বিস্তারিত নির্দেশ থাকবে। এই পরিকল্পনাটি রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী আর পানির মিস্ত্রী সবাই পাবেন, তারা সবাই সেটি খুব সতর্কতার সাথে অনুসরণ করবেন। এটি হচ্ছে টপ-ডাউন নির্মাণ (উপর থেকে নীচ বরাবর), যা স্থপতি - বরং স্থপতির পরিকল্পনা - থেকে শুরু হয়, যা উপর থেকে পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবে। এটাই হচ্ছে 'নীলনকশা' অনুসরণ করে নির্মাণ।

বটম-আপ (নীচ থেকে উপর বরাবর) নির্মাণ খুবই ভিন্ন এর চেয়ে। সবচেয়ে সেরা উদাহরণ যা আমি জানি সেটি হচ্ছে একটি উইপোকার ঢিবি। দশ নং ছবিটি (ছবির অ্যালবাম অধ্যায়) দেখুন এবং বিস্মিত হন। বটম-আপ আর টপ-ডাউন ডিজাইনের মধ্যে পার্থক্য - এদের মধ্যকার সম্ভাব্য সদৃশ্যতা এবং পরিণতিগুলোর জটিলতাগুলো ব্যাখ্যা করতে ড্যানিয়েল ডেনেট একটি চমৎকার তুলনা করেছিলেন। এই জোড়া অলঙ্করনে ডান দিকে আছে 'লা সাগারাডা ফ্যামিলিয়া', বার্সিলোনায় অবস্থিতি একটি সুন্দর চার্চ। বাম দিকে আছে একটি উইপোকার ঢিবি, অষ্ট্রেলিয়ার আয়রন রেঞ্জ ন্যাশনাল পার্কে এর ছবিটি তুলেছিলেন ফিওনা স্টুয়ার্ট। এটি একটি মাটির ঢিবি, যা তৈরি করেছে উইপোকাদের একটি কলোনি। আসলে উইপোকাদের এই ঢিবির বেশির ভাগ অংশ ভূগর্ভস্থ। উপরে বিস্তারিত 'চার্চ' হচ্ছে একগুচ্ছ জটিলাকৃতির চিমনি, যেগুলো ভূগর্ভস্থ নীড়ের জন্য বায়ু সঞ্চালন এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কাজ করে।

এই সদৃশ্যতা আসলেই চমকে দেবার মত। কিন্তু বার্সেলোনার চার্চটি এর শেষ বিন্দু অবধি পরিকল্পনা অনুসারে নীলনকশা ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়েছিল। বিখ্যাত কাটালান (স্প্যানিশ) স্থপতি আন্টনি গাউডি (১৮৫২-১৯২৬) এটি পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু কেউ বা কোনো কিছু উইপোকা ঢিবির ডিজাইন করে না। এমনকি তাদের ডিএনএও নয়। একক উইপোকা শ্রমিকরা এটি নির্মাণ করেছে খুব সাধারণ কিছু নিয়ম অনুসরণ করে। একটি উইঢিবির কেমন দেখতে হওয়া উচিত সেই বিষয়ে কোনো উইপোকারই অস্পষ্টতম কোনো ধারণাও নেই। তাদের কারো মস্তিষ্কে কিংবা ডিএনএ'তে এমন কিছু নেই - যেমন ধরুন একটি মাটির চার্চের কোনো ছবি কিংবা পরিকল্পনা। কখনোই কোথাও কোনো উইপোকার ঢিবির ছবি, অথবা নীলনকশা, অথবা কোনো পরিকল্পনা থাকে না। অন্য উইপোকারা কী করছে এবং সর্ম্পূণ একটি ঢিবি কেমন দেখতে হতে পারে সে বিষয়ে কোনো ধারণা ছাড়াই প্রতিটি একক টারমাইট সদস্য একা একাই শুধুমাত্র একগুচ্ছ সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে।

সেই নিয়মগুলো ঠিক কী হতে পারে সেটি আমি জানিনা, কিন্তু এটি সেই ধরনের একটি জিনিস যা আমি একটি সাধারণ নিয়ম শব্দটি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি: 'কাদার কোনো সুচালো মোচাকৃতির মত কোনো কিছুর কাছে এলে, আরো এক দলা কাদা এর উপর লেপে দাও'। পারস্পরিক যোগাযোগ করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে হিসাবে সামাজিক পতঙ্গগুলো কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে - সাংকেতিক গন্ধ যাদের বলে 'ফেরোমন'। সুতরাং যে নিয়মগুলো কোনো একক কর্মী উইপোকা অনুসরণ করে যখন তারা তাদের একটি ঢিবি বানায় সেটি

হয়তো নির্ভর করে কোনো সুনির্দিষ্ট 'নির্মাণ' অংশের গন্ধ 'এই ফেরোমন' অথবা 'ঐ ফেরোমনের' মত। যখন সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করার মাধ্যমে 'ডিজাইন' আবির্ভূত হয়, যেখানে কোথাও সার্বিক কোনো পরিকল্পনার অস্তিত্ব নেই, এটিকে বলা হয় 'বটম-আপ' ডিজাইন যা টপ-ডাউনের ডিজাইনের বিপরীত।

বটম-আপ 'ডিজাইনের' আরো একটি সুন্দর উদাহরণ প্রদর্শন করছে ছবি ১১, স্টার্লিং পাখির ঝাক, বহু সংখ্যক স্টার্লিং শীতের সময় যখন একত্র হয়। এই ক্ষেত্রে যা আসলে 'ডিজাইন' করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আচরণ, এক ধরনের ভাসমান ব্যালে নৃত্যের মত, কোনো নির্মাণ বা কাঠামো নয়। সুতরাং 'কোনো স্থপতি নেই' বলার পরিবর্তে আমি বরং বলবো, কোনো 'কোরিওগ্রাফার বা নৃত্য পরিচালক নেই'। কেউ জানেন না কেন পাখিগুলো এটি করে, কিন্তু যখনই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এই পাখিগুলো ঝাকে ঝাকে একত্রিত হয়, যেখানে একক পাখিদের সংখ্যা কয়েক হাজার অবধি হতে পারে। তারা একই সাথে দ্রুত এবং এত ত্রুটিহীন সমন্বয়ে ওড়ে যে, পরস্পরের সাথে তাদের কোনো ধাক্কা লাগে না। তারা সবাই একই সাথে ঘুরছে, বাঁক খাচ্ছে যেন তারা সবাই কোনো প্রধান একটি পাখির নির্দেশ নির্ভুলভাবে অনুসারণ করছে। স্টার্লিং পাখিদের ঝাক একটি একক প্রাণীর মতোই আচরণ করে। এই 'প্রাণীটির' এমন একটি সুনির্দিষ্ট আর স্বতন্ত্র প্রান্তসীমাও আছে। আপনার আসলেই উচিত হবে এই পার্থিব বিস্ময়টির কোনো মুগ্ধ করার মত চলচ্চিত্র দেখা, ইউ টিউবে 'স্টার্লিং উইন্টার ফ্লকস' লিখে খুঁজে দেখুন।

যখন আপনি এই ঝাকগুলোকে ঘুরপাক খেতে, দ্রুত উপরে উঠতে আর নীচের দিকে ঝাপ দিতে দেখবেন, যেন পাখিরদের এই মহাসমাবেশটি একটি দানবীয় প্রাণী, আপনি বাধ্য হবেন অনুভব করতে যে, অবশ্যই এই ঝাকে একটি 'মাস্টার' বা প্রধান নিয়ন্ত্রক বা উড্ডয়ন-সমন্বয়ক আছে, হয়তো একক নেতা একটি পাখি যে কিনা বাকি সবার সাথে টেলিপ্যাথির মাধ্যমে যোগাযোগ করছে: 'বা দিকে এবার ঘোরো, এবার উপরে, একটি চক্কর, এবার ডান দিকে বাঁক খাও....', আসলেই সম্পূর্ণভাবেই মনে হতে পারে যে, এটি টপ-ডাউন ডিজাইনেরই একটি উদাহরণ। কিন্তু আসলেই এটি তা নয়। এখানো কোনো পরিচালক নেই, কোনো সমন্বয়ক পরিচালক নেই, কোনো স্থপতি নেই, কোনো নেতা পাখি নেই। আমরা এখন বুঝতে সক্ষম হয়েছি এমন একটি উপায়ে ঝাকটির একক পাখিগুলো প্রত্যেকেই একটি 'বটম-আপ' কিছু নিয়ম অনুসরণ করে, আর একত্রে এটি এমন একটি প্রভাব সৃষ্টি করে যা দেখে 'টপ-ডাউন' ডিজাইন মনে হতে পারে। এটি আবারো সেই উইপোকাদের মত, কিন্তু আরো

দ্রুততর সময়ের মাত্রায়। এবং তারা যা সৃষ্টি করে সেটি কাদা মাটির কোনো ‘চার্চ’ নয়, বরং আকাশে ভাসমান বিস্ময়কর সুন্দর একটি ব্যালে নৃত্যের প্রদর্শনী – যেখানে কোনো নৃত্য পরিচালক নেই।

বুদ্ধিদীপ্ত কম্পিউটার প্রোগ্রামার ক্রেইগ রেনল্ডস এই ‘বটম-আপ’ নৃত্য-পরিচালকহীন নৃত্যের শক্তিকে খুব সুন্দরভাবে প্রদর্শন করেছিলেন। ঝাক বাধা পাখিদের আচরণে কৃত্রিম মডেল বা সিম্যুলেশন তৈরি করতে তিনি ‘বয়েডস’ নামে একটি প্রোগ্রাম লিখেছিলেন। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে, রেনল্ডস পুরো পাখির ঝাকটির গতিবিধির বিন্যাস প্রোগ্রাম করেছিলেন। তিনি সেটি করেননি। কারণ সেটি একটি ‘টপ-ডাউন’ নির্দেশনা হতো । এর পরিবর্তে তার ‘বটম-আপ’ প্রোগ্রামটি কাজ করেছিল এভাবে: তিনি শুধু একটি মাত্র পাখির গতিবিধি প্রোগ্রাম করার করতে - সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম বেধে দিতে - প্রচুর সময় ব্যয় করেছিলেন, যেমন: ‘তোমার নিকটবর্তী পাখিগুলো কী করছে তার উপর নজর রাখো, যদি তোমার প্রতিবেশী এটা এবং এটা করে, তুমি অবশ্যই এটা এবং এটা করবে’। একটি পাখির জন্যে তার নিয়মগুলো ত্রুটিহীনভাবে প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি এটি হুবহু অনুলিপি বা ‘ক্লোন’ তৈরি করেছিলেন: একটি পাখির কয়েক ডজন অনুলিপি তৈরি করেছিলেন, এবং এরপর সেগুলোকে কম্পিউটারে ‘মুক্ত’ করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি দেখেন কীভাবে পুরো ঝাকটি আচরণ করছে। বয়েডসগুলো আসল পাখির মতোই ঝাক বেধে আচরণ করেছিল, প্লেট ১২ এর আরো সুন্দর একটি সিম্যুলেশন চিত্র প্রদর্শন করছে, যা রেনোল্ডসের প্রোগ্রামটিকে আরো বিস্তারিত করেছিল। সান ফ্রান্সিসকো এক্সপ্লোরেটোরিয়ামের জন্য এটি প্রোগ্রাম করেছিলেন জিল ফানটাউৎসা।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে রেনোল্ডস পুরো ঝাকটির স্তরে পাখিগুলোর সার্বিক আচরণ প্রোগ্রাম করেননি। তিনি একক পাখির স্তরে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ প্রোগ্রামটি করছিলেন। পাখির সামগ্রিক ঝাকটির আচরণ তারই পরিণতি হিসাবে ‘আবির্ভূত’ হয়েছে। ভ্রূণগত বিকাশ এর লক্ষ্য পূরণ করতেও ঠিক এ ধরনের ‘বটম-আপ’ প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে, যেখানে কোনো ভ্রূণের প্রতিটি একক কোষ ঝাকের একটি একক পাখি সদস্যের মত আচরণ করে। ভ্রূণগত বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে কোষদের নানা ধরনের ‘গতিবিধি’, যেখানে ঝিল্লিগুলো অথবা কোষগুচ্ছের আস্তরণ গতিময়তার সাথে ভাজ হয়, গর্ত সৃষ্টি করে ভিতরে প্রবেশ করে। সুতরাং উড়ন্ত স্টার্লিংদের মতোই আমরা এখানে কোনো ‘নৃত্য পরিচালক নেই’ বলার সাথে সাথে কোনো ‘স্থপতি নেই’ নিয়েও কথা বলছি।

ডিএনএ কীভাবে একটি শিশু তৈরি করে সেটি নিয়ে ভ্রূণতাত্ত্বিকরা কাজ করেন। এই প্রক্রিয়াটির অনেক কিছুই এখন আমাদের জানা হয়ে গেছে, কিন্তু আমি এখানে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো না। কারণ সেটি করতে পুরো একটি বইয়ের দরকার হবে। আর এই বইটি বিষয় সেটি নয়। আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে শুধু বুঝতে হবে যে ভ্রূণ বিকাশ প্রক্রিয়াটি - যে প্রক্রিয়া কোনো জীব শরীর তৈরি হয়- সেটি একটি 'বটম-আপ' প্রক্রিয়া। ঠিক যেভাবে একটি উইপোকাদের ঢিবি তৈরি হয়, অথবা এক ঝাক স্টার্লিং পাখি পারস্পরিক সমন্বয়ে ঝাক বেধে ওড়ে। এখানেও কোনো নীলনকশা নেই। এর পরিবর্তে, বিকাশমান ভ্রূণের প্রতিটি কোষই এর নিজস্ব ছোটো স্থানীয় নিয়মগুলো মেনে চলে, যেভাবে একক উইপোকাগুলো একটি কাদার ক্যাথিড্রাল তৈরি করে অথবা ঘুরতে থাকা স্টার্লিং পাখির ঝাকে একক কোনো পাখি করে থাকে।

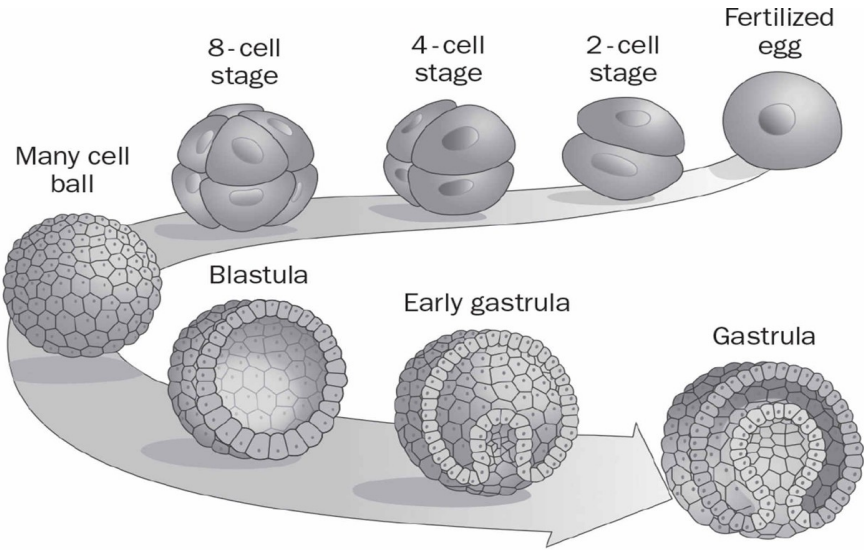

কীভাবে এসব বটম-আপ নিয়মগুলো কাজ করে সেটি প্রদর্শন করতে আমি আরো খানিকটা অগ্রসর হবো – ভ্রূণ জীবনের সূচনা পর্বে। আপনি হয়তো যেমন জানেন, নিষিক্ত ডিম্বাণু একটি একক কোষ। এটি বেশ বড় আকারের একটি কোষ। এটি দ্বি-বিভাজিত হয়ে দুটি কোষ তৈরি করে। তারপর বিভাজিত কোষ দুটির প্রত্যেকটি আবার দ্বি-বিভাজিত হয় এবং চারটি কোষ তৈরি করে। এরপর এই চারটি পুনরায় বিভাজিত হয়ে আটটি কোষ তৈরি করে, এবং এভাবে চলতে থাকে। প্রতিটি বিভাজনের পর, কোষগুচ্ছটির সামগ্রিক আকার মূল নিষিক্ত ডিমটির মত একই আকারে থাক। এই জিনিস দুই, চার, আট, ষোল.. এভাবে ক্রমশ বাড়তে থাকা কোষগুলোর মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায় - এবং একটি ঘন

বল বা গোলক তৈরি করে। কোষ সংখ্যা একশ বা তার কাছাকাছি পৌঁছালে কোষগুলো নিজেদের সংগঠিত (স্থানীয় 'বটম-আপ' নিয়ম মেনে) করে একটি ফাঁপা বলে রূপান্তরিত করে, এটিকে বলে ব্লাস্টুলা। আরো একবার, এই ব্লাস্টুলার আকৃতি মূল নিষিক্ত ডিম্বাণুটির সমান, এবং এখন কোষগুলো নিজেরাই আকারে খুব ক্ষুদ্র। এই বলটির বহির্ভাগ হচ্ছে কোষের একটি আস্তরণ।

কোষগুলো যখন বার বার বিভাজিত হতে থাকে, কোষ সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া অব্যাহত থাকে, কিন্তু বলটি আকারে আরো বড় হয় না। এর পরিবর্তে, আবার স্থানীয় নিয়ম মেনে প্রতিটি কোষ, বহির্ভাগের দেয়ালের খানিকটা অংশ বলটির মাঝখানে দিকে খানিক ডেবে যায়। পরিশেষে এই ভিতরে ডেবে যাওয়া অংশটি এতটাই ভিতরে প্রবেশ করে যে বলটির ভিতরের স্তর একটি মাত্র কোষের বদলে দুটি স্তরের কোষ দিয়ে আবৃত হয়। এই দ্বি-স্তর বিশিষ্ট বলটিকে বলা হয় গ্যাস্ট্রুলা, আর যে প্রক্রিয়ায় এটি সৃষ্টি হয় তাকে বলে গ্যাস্ট্রুলেশন।

স্বীকার করছি একটি গ্যাস্ট্রুলা খুব বেশি জটিল কিছু নয়, এবং এটি আদৌ কোনো শিশুর মত দেখতে নয়। কিন্তু আমি মনে করি আপনি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে প্রতিটি কোষ 'বটম-আপ' নিয়মগুলো অনুসরণ করে নিজে নিজেই কাজ করে একটি গ্যাস্ট্রুলা তৈরি করতে পারে - দ্বি-স্তর বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রুলা তৈরি করতে ব্লাস্টুলার বহির্ভাগের কোষস্তর বা দেয়ালটি আরো সম্প্রসারিত করে এটিকে কেন্দ্র অভিমূখে ভাজ করিয়ে একটি গর্ত সৃষ্টি করে। এবং ভ্রূণের সর্বত্র এর এই ধরনের 'বটম-আপ' নিয়মগুলো স্থানীয়ভাবে তাদের কাজ করা অব্যাহত রাখে এর আকৃতি পরিবর্তন করতে, যেন একটি ধীর স্থিতিশীল গতিতে এটি আরো বেশি একটি শিশু সদৃশ হয়ে ওঠে।

গ্যাস্ট্রুলেশনের পরে, আরেকটি খানিকটা একই ধরনের 'গর্ত' তৈরি হবার প্রক্রিয়া ঘটে। এই ক্ষেত্রে এটির নাম 'নিউরুলেশন'। এই ভেতর মূখী গর্ত হওয়া শেষ হয় মূল ভাজ থেকে একটি ফাঁপা নল পৃথক হয়ে যাবার মাধ্যমে, যা পরিশেষে মূল স্নায়ুরজ্জুতে রুপান্তরিত হওয়ার জন্য নিয়তি-নির্দিষ্ট (সেই স্নায়রজ্জুটি যা আমাদের প্রত্যেকের শরীরে পেছনে পিঠ বরাবর মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থান করে)। আবারো এই নিউরুলেশেনর এই ভাজ বা গর্ত সৃষ্টি হবার প্রক্রিয়াটি কাজ করে এককভাবে প্রতিটি কোষ যখন 'বটম-আপ' স্থানীয় নিয়ম অনুসরণ করে। নীচের ছবিটি দেখাচ্ছে কীভাবে স্নায়ুরজ্জু তৈরি হয়, প্রথমে 'ডেন্টিং' বা ভিতর অভিমূখে একটি ভাজ বা গর্ত সৃষ্টি করা এবং তারপর ভাজ

হওয়া অংশটি যখন মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখানে খুটিনাটি বিষয়গুলো গ্যাস্ট্রুলেশন থেকে ভিন্ন, কিন্তু সেই একই 'বটম-আপ' মূলনীতি এখানে স্থানীয়ভাবে কাজ করছে।

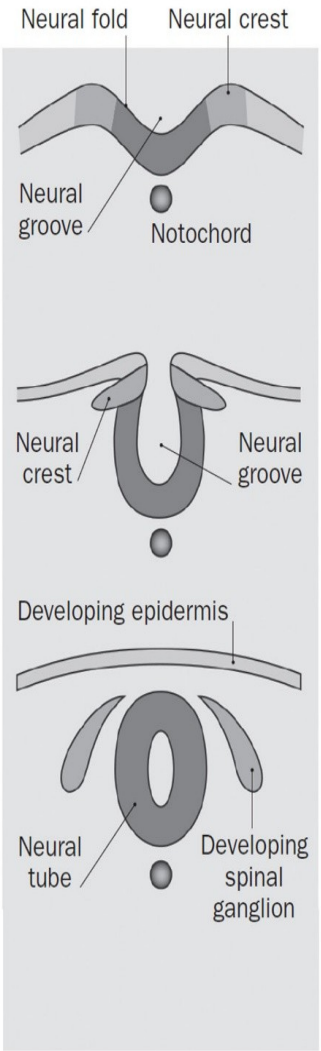

আপনার মনে আছে কীভাবে ক্রেইগ রেনোল্ডস এক ঝাক পাখির আচরণ নিয়ে একটি কম্পিউটার সিম্যুলেশন লিখেছিলেন - 'বয়েডস' - শুধু একটি মাত্র বয়েডের আচরণ প্রোগ্রাম করার মাধ্যমে। তিনি তারপর তার এই 'বয়েড'টির অনেকগুলো অনুলিপি করেছিলেন এবং কীভাবে সেগুলো একসাথে আচরণ করে সেটি দেখেছিলেন। এবং সেগুলো উড়ন্ত, ঘুর্ণায়মান ঝাক সৃষ্টি করেছিল, সত্যিকারের স্টার্লিং পাখির ঝাকের মত। রেনোল্ডস পুরো ঝাকের আচরণ কখনো প্রোগ্রাম করেননি। স্থানীয় নিয়ম অনুসরণ করা একক বয়েডগুলোর আচরণের পরিণতি হিসাবে বটম-আপ উপায়ে পুরো ঝাকের আচরণ 'আবির্ভূত' হয়েছিল।

বেশ, একজন গাণিতিক জীববিজ্ঞানী, জর্জ ওস্টার একই ধরনের কাজ করেছিলেন, কিন্তু বয়েডের বদলে তিনি একটি ভ্রূণের কোষ ব্যবহার করেছিলেন। তিনি একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখেছিলেন একটি একক কোষের আচরণ 'সিম্যুলেট' করতে। আর সেটি করতে তিনি বহু বিস্তারিত তথ্য ব্যবহার করেছিলেন কোনো একটি কোষ সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে যা কিছু জানতেন। আসলেই খুব জটিল খুঁটিনাটি বিষয়, কারণ কোষ বেশ জটিল একটি জিনিস। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এটি। বয়েডগুলোর সাথে যেমন করা হয়েছিল, ওস্টার একটি সামগ্রিক ভ্রূণের প্রোগ্রাম করেননি। শুধুমাত্র একটি কোষ প্রোগ্রাম করেছিলেন। তার মধ্যে অন্তভূক্ত ছিল এই কোষের বিভাজিত হবার প্রবণতা, যা একটি কোষ করতে পারে এমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।কিন্তু

কোষের আরো অনেক কাজ আছে, এবং ওসটার সেগুলোকে তার একক কোষের কাজের তালিকায় প্রোগ্রাম করেছিলেন। তিনি তারপর সেগুলো কম্পিউটার স্ক্রিনে বিভাজিত হতে দিয়েছিলেন কি ঘটে দেখতে।

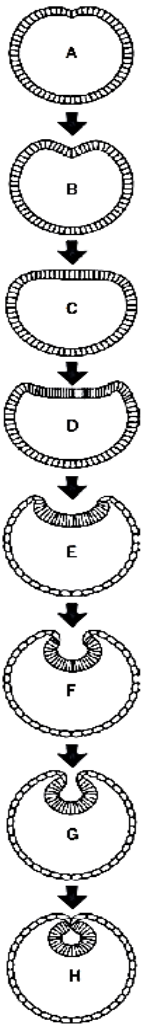

যখন কোষ বিভাজিত হয়েছিল, প্রতিটি অনুলিপি কোষ উত্তরাধিকার সূত্রে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য পেয়েছিল এবং মূল কোষের মত একই আচরণ। সুতরাং এটি ক্রেইগ রেনোল্ডসের একটি বয়েডকে ক্লোন করে বহু অনুলিপি সৃষ্টি করার মত, দেখতে কীভাবে তারা একটি ঝাকে আচরণ করে। ঠিক যেভাবে রেলোল্ডসের বয়েডগুলো স্টার্লিং পাখিদের মত ঝাক বেধেছিল, ওস্টারের কোষগুলো.... বেশ, তারা কী করেছিল দেখতে পরের পৃষ্ঠার ছবিটি ভালো করে লক্ষ করুন এবং এটিকে তুলনা করুন এই পৃষ্ঠার সত্যিকারের নিউরুলেশনের ছবির সাথে যা উপরেই আছে। অবশ্যই দুটো ছবি হুবহু একই রকম নয়। যেমন রেনোল্ডসের ঝাক বাধা বয়েডগুলো ঠিক আসল ঝাক বাধা স্টার্লিং পাখির মত নয়। উভয় ক্ষেত্রে, আমি আসলে যা করার চেষ্টা করছি সেটি হচ্ছে আপনাদের প্রদর্শন করতে যে, 'বটম-আপ' ডিজাইনের শক্তি আসলে কতটুকু, যেখানে কোনো স্থপতি/নৃত্য-পরিচালক নেই, শুধুমাত্র নিম্ন পর্যায়ের স্থানীয় কিছু নিয়ম।

এখানে আলোচনা করার জন্য ভ্রূণতত্ত্বের পরবর্তী ধাপগুলো খুবই জটিল। বিভিন্ন কলা - মাংসপেশী, অস্থি, স্নায়ু, ত্বক, যকৃত, বৃক্ক সবকিছুই কোষ-বিভাজনের মাধ্যমেই বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি কলার কোষ পরস্পর থেকে দেখতে খুব ভিন্ন, কিন্তু সবারই একই ডিএনএ আছে। তাদের এই ভিন্নতার কারণ হচ্ছে ডিএনএ বিভিন্ন অংশগুলো - ভিন্ন জিনগুলো -সেখানে সক্রিয় হয়। যে-কোনো একটি কলায়, বহু হাজার জিনের মধ্যে মাত্র অল্প কিছু জিন সক্রিয় হয়। এর মানে হচ্ছে যে প্রতিটি কলায়, প্রোটিনগুলো, ঐসব অপরিহার্য গবেষণা-সহকারী উৎসেচকগুলো যেগুলো ঐ কলার কোষে তৈরি হয় সেগুলো যত সংখ্যক

উৎসেচক তৈরি হওয়া সম্ভব তার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এবং সেগুলো আসলেই অন্য কোনো কলার কোষগুলো তৈরি করে। আর সেটাই বিভিন্ন কলার কোষগুলোকে ভিন্নভাবে বিকশিত করে। প্রতিটি কলাই বৃদ্ধি পায় কোষ-বিভাজনের মাধ্যমে স্থানীয় 'বটম-আপ' নিয়মগুলো অনুসরণ করে। এবং প্রতিটি কলাই বৃদ্ধি হওয়া বন্ধ করে দেয় যখন এটি সঠিক আকারে পৌঁছায়: আবারো সেই 'বটম-আপ' নিয়মগুলো অনুসরণ করে। মাঝে মাঝে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে এবং একটি কলা তার বৃদ্ধি থামাতে ব্যর্থ হয়: কোষগুলো তাদের আর বিভাজিত না হওয়ার নির্দেশ দেয়া স্থানীয় বটম-আপ নিয়মগুলোকে অবজ্ঞা করে। আর তখনই আমরা ক্যান্সারের মত একটি টিউমর পাই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটি হয় না।

এখন আসুন বটম-আপ ভ্রূণতত্ত্বের ধারণাটিকে নবম অধ্যায়ে বর্ণিত স্ফটিক ধারণাটির পাশাপাশি রাখি। পাইরাইট অথবা হীরা অথবা তুষারকণা ইত্যাদি স্ফটিকগুলো তাদের সুন্দর আকৃতিগুলো গড়ে তোলে স্থানীয় 'বটম-আপ' নিয়মগুলো অনুসরণ করে। ঐসব ক্ষেত্রে নিয়মগুলো হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন গঠনের নিয়মগুলো। ঐসব নিয়মানুসারে সংঘটিত অণুর বিন্যাসকে আমরা প্যারেডে সজ্জিত সৈন্যদের সাথে তুলনা করেছিলাম। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে কেউই একটি স্ফটিকের আকৃতি ডিজাইন করেননি। স্থানীয় নিয়মগুলো অনুসরণ করার মাধ্যমে এদের আকৃতি 'আবির্ভূত' হয় ।
তারপর আমরা দেখেছিলাম কীভাবে রাসায়নিক বন্ধনের সূত্রগুলো - পরস্পরের সাথে জিগস ধাঁধার টুকরোর মত খাপে খাপ যুক্ত হওয়ার সদৃশ একটি প্রক্রিয়ায় এটি সাধারণ স্ফটিক ছাড়াও আরো বিস্তারিত জটিল জিনিস সৃষ্টি করতে পারে: প্রোটিন অণু। তারপর একই ধরনের জিগস প্রক্রিয়া প্রোটিন শিকলগুলোকে বাধ্য করে কুণ্ডলী পাকিয়ে 'গিঁট' তৈরি করতে। এবং এই গিটঁগুলো মধ্য থাকা খাঁজ বা ফাটলগুলো তাদের উৎসেচক হিসাবে কাজ করতে সক্ষম করে তোলে, অনুঘটনক হিসাবে যে উৎসেচকগুলো কোষ অভ্যন্তরে খুব সুনির্দিষ্ট কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে। আমি আগে যেমন বলেছিলাম, 'ফাটল বা খাঁজ' আসলেই অতিসরলীকরণ। এই গিঁটযুক্ত অণুগুলোর কিছু আসলে ক্ষুদ্র যন্ত্র, মিনিয়েচার 'পাম্প' অথবা ক্ষুদ্র 'ওয়াকার' বা হাঁটতে সক্ষম যন্ত্র, যা আসলেই আক্ষরিকভাবে কোষের মধ্যে দুটি পা ব্যবহার করে হাঁটে, ব্যস্তভাবে রাসায়নিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে। ইউ টিউবে 'ইয়োর বডিস মলিক্যুলার মেশিনস' শব্দগুলো ব্যবহার করে খুঁজে দেখুন, পুরোপুরিভাবে আপনি বিস্মিত হবেন।

উৎসেচকগুলো আবার অন্য উৎসেচকগুলোকে সক্রিয় করে, যেগুলো আবার অন্যান্য সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। এবং কোষ অভ্যন্তরে ঘটা ঐসব রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোই কোষগুলোকে স্থানীয় নিয়ম মেনে একটি ভ্রূণ তৈরি করতে একত্রে কাজ করায়, যেভাবে আমরা জর্জ ওসটারের সিম্যুলেশন বা কৃত্রিম মডেলে দেখেছি। এবং তারপর একটি শিশু তৈরি করে। এবং এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ নিয়ন্ত্রণ করে ডিএনএ, আবারো একই জিগস মূলনীতি অনুসরণ করে। শেষ পর্যায় অবধি এটিও স্ফটিকের মতো, কিন্তু খুবই বিশেষ ধরনের বিস্তারিতভাবে জটিল একটি স্ফটিক।

এই প্রক্রিয়া জন্মের সাথেই থেমে যায় না। এটি চলতে থাকে, শিশুটি ক্রমশ বড় হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃদ্ধ হয়। এবং অবশ্যই, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ডিএনএ'র ভিন্নতা - যা উদ্দেশ্যহীন মিউটেশনের কারণে মূলত সৃষ্ট - সেই প্রোটিনগুলোয় ভিন্নতা সৃষ্টি করে যা ডিএনএ'র প্রভাবে 'স্ফটিকীকরণ' অথবা 'গিঁট' সৃষ্টি করে। এই পার্থক্যগুলোর পরোক্ষ অথবা পুঞ্জীভূত প্রভাব বেশ পরে, পরিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক শরীরগুলোর ভিন্নতায় নিজেদের প্রকাশ করে। হয়তো প্রাপ্তবয়স্ক চিতা খানিকটা বেশি দ্রুত দৌড়াতে সক্ষম। অথবা খানিকটা ধীরে। হয়তো ক্যামেলিয়নের জিহবাটি ছুড়লে সেটি খানিকটা বেশি দূর অবধি যায়। হয়তো তৃষ্ণায় মারা যাবার আগে কোনো উট মরুভূমিতে আরো কিছু মাইল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। হয়তো গোলাপের কাটাগুলো খানিকটা বেশি পরিমানে ধারলো হয়। হয়তো গোখরা সাপের বিষ খানিকটা বেশি শক্তিশালী হয়। ডিএনএ'তে যে-কোনো মিউটেশন বা পরিবর্তনের একটি প্রভাব থাকতে পারে, প্রোটিন, কোষ রসায়ন এবং ভ্রূণবিকাশের বিন্যাসের অন্তর্বর্তীকালীন প্রভাবগুলোর দীর্ঘ ধারাবাহিক শৃঙ্খলের শেষে। এবং এটি কোনো জীবের টিকে থাকার ক্ষেত্রে খানিক বেশি নয়তো খানিকটা কম সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। আর সেটি জীবটির প্রজনন সফল হবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করতে পারে। এবং সেটি পরিবর্তনের জন্য দায়ী ডিএনএ'কে পরবর্তী প্রজন্মের শরীরে হস্তান্তরিত হবার সম্ভাবনাটি বাড়াতে কিংবা কমাতে পারে। সুতরাং প্রজন্মান্তরে, বহু হাজার আর মিলিয়ন বছর ধরে, জনগোষ্ঠীতে টিকে থাকা জিনগুলো হচ্ছে 'ভালো' জিন। যে জিনগুলো ভালো শরীর গঠন করতে দক্ষ যা দ্রুত দৌড়াতে পারে। অথবা যার দীর্ঘ জিহবা আছে। অথবা পানি ছাড়াই আরো বেশ কয়েক মাইল মরুভূমি অতিক্রম করতে পারে।

সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন, সেই মূল কারণটি যা ব্যাখ্যা করতে পারে কেন সব প্রাণী আর উদ্ভিদ তারা যা করে সেই কাজটিতে খুবই দক্ষ। আর কোন কাজটি করতে তারা বিশেষভাবে দক্ষ সেই বিস্তারিত বিষয়টি প্রজাতি ভেদে ভিন্ন। কিন্তু চূড়ান্তভাবে সবাই একটি কাজ করতে খুব দক্ষ: যথেষ্ট পরিমান দীর্ঘ সময় অবধি বেঁচে থাকতে পারে, যেন পরবর্তী প্রজন্মে তারা তাদের ডিএনএ হস্তান্তর করতে পারে, যে ডিএনএটি তারা যা-ই করুক না কেন সেই বিষয়ে দক্ষতা দিয়েছিল। বহু সহস্র প্রজন্মের ওপর এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণে, আমরা লক্ষ করি (অথবা আমরা লক্ষ করবো যদি আমার যথেষ্ট দীর্ঘ সময় অবধি বাঁচতে পারি) কোনো একটি জনগোষ্ঠীতে জীবদের গড়পড়তা রূপটি পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ বিবর্তন ঘটেছে। বহু শত মিলিয়ন বছর পরে, এত বেশি বিবর্তন ঘটে যে মাছের মত দেখতে কোনো পূর্বসূরি প্রাণী শ্রিউর মত দেখতে কোনো উত্তরসূরিদের আবির্ভাবের কারণ হয়, এবং বহু বিলিয়ন বছর পরে, এত বেশি বিবর্তন হয় যে ব্যাকটেরিয়ামের মত পূর্বসূরিরা আপনি কিংবা আমার মত উত্তরসূরিদের আবির্ভাবের কারণ হয়।

একটি জীবিত সত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সবকিছু যেমন সেটি তেমন, কারণ এর পূর্বসূরিরা বহু প্রজন্মব্যাপী সেই ভাবে বিবর্তিত হয়েছে । যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত মানুষ এবং মানব মস্তিষ্ক। আর ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন হওয়া মানব মস্তিষ্কের একটি বৈশিষ্ট্য, ঠিক যেমন এর সঙ্গীত আর যৌনতা পছন্দ করার প্রবণতা। আর সেই কারণে যুক্তিযুক্ত হবে এমন কিছু ভাবা যে, আমাদের নিয়ে অন্য যে-কোনো বিষয়ের মত ধর্মীয় বিশ্বাস ধারণ করার প্রতি প্রবণতাটিরও একটি বিবর্তনীয় ব্যাখ্যা আছে। এবং আমাদের অন্য কিছু প্রবণতার ক্ষেত্রেও এটি একই ভাবে প্রযোজ্য, যেমন, আরো নৈতিক হওয়া অথবা ভালো আচরণ করা। বিবর্তনীয় সেই ব্যাখ্যাটি কী হতে পারে? সেটি পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়।

১১ আমরা কী ধার্মিক হবার জন্য বিবর্তিত হয়েছি? আমরা কি ভালো আচরণ করতে বিবর্তিত হয়েছি?

খুব সম্প্রতি সময়ের আগ পর্যন্ত প্রায় সবাই কোনো না কোনো এক ধরনের ঈশ্বরের ধারণায় বিশ্বাস করতেন। পশ্চিম ইউরোপের বাইরে, এখন যেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ একটি জনগোষ্ঠী কেবল ধার্মিক, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীব্যাপী অধিকাংশ মানুষ এখনো কোনো একজন ঈশ্বর বা দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, বিশেষ করে যদি তারা বিজ্ঞানে

সুশিক্ষিত না হয়ে থাকেন। ঈশ্বর/দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসের কী একটি ডারউইনীয় ব্যাখ্যা থাকা উচিত নয়? ধর্মীয় বিশ্বাস, কোনো ধরনের ঈশ্বর বা দেব-দেবীর উপর বিশ্বাস কী আমাদের পূর্বসূরিদের বাঁচতে, আর ধর্মীয় বিশ্বাসের জিনটিকে পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তর করতে সহায়তা করেছিল?

আমি সন্দেহ করছি, এর উত্তর সম্ভবত 'হ্যাঁ'। বেশ, এক ধরনের হ্যাঁ। অবশ্যই এর মানে এই না যে ঈশ্বর/দেব-দেবীর অস্তিত্বে মানুষ বিশ্বাস করেন - সেটি যে ঈশ্বর/দেব-দেবী হোক না কেন - তারা আসলেই আছেন বা তাদের আসলেই অস্তিত্ব আছে। সেটি পুরোপুরিভাবে পৃথক একটি প্রশ্ন। কোনো কিছুর উপর বিশ্বাস করা, যার আসলেই অস্তিত্ব নেই সেটি এমনকি আপনার জীবনও বাঁচাতে পারে। আর এটি ঘটতে পারে বেশ কিছু বিচিত্র উপায়ে।

আপনার কী গ্যাজেল আর জেব্রাদের কথা স্মরণ আছে (আগের একটি অধ্যায়ে যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম) যাদের অতিমাত্রায় ভয় পাওয়া আর যথেষ্ট পরিমান ভয় না পাবার মধ্যে সূক্ষ্ম একটি ভারসাম্যে আসতে হয়? এখন কল্পনা করুন আপনি হচ্ছেন সেই আদি মানুষদের একজন, বহু দিন আগে আমাদের পূর্বসূরিদের অতীতে আফ্রিকার সমতলে আপনার বাস। একটি গ্যাজেলের মত আপনাকে সিংহ আর চিতাদের যথেষ্ট পরিমানে ভয় করা আর এমন অতি মাত্রায় ভয় করা যে আপনি আপনার জীবন কাটাতে পারবেন না, এই দুটির মধ্যে একটি সঠিক ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হবে। মানুষের ক্ষেত্রে সেটি হতে পারে ইয়াম (গাছ আলু) খুঁজতে মাটিতে গর্ত খোড়া অথবা কোনো প্রজনন সঙ্গীর মন ভোলানোর চেষ্টা করা। আপনি একটা শব্দ শুনলেন, ইয়াম খোড়া থামিয়ে আপনি চোখ তুলে চারপাশে তাকালেন। আপনি ঘাসের মধ্যে খানিকটা নড়াচড়ার আভাস পেলেন, সেটি হয়তো একটি সিংহ হতে পারে। আবার এর পরিবর্তে সেটি শুধুমাত্র বাতাসের শব্দও হতে পারে। আপনি একটি বেশ বড় কন্দ মাটিতে থেকে খুড়ে বের করতে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, এবং আপনি এই মুহূর্তে সেই কাজটি থামাতে চাচ্ছেন না। কিন্তু সেই আওয়াজটি একটি সিংহ হতে পারে।

আপনি যদি বিশ্বাস করেন, শব্দটির উৎস হচ্ছে একটি সিংহ এবং এটি আসলেই একটি সিংহ, সেই সঠিক বিশ্বাসটি হয়তো আপনার জীবন বাঁচাতে পারে। এটি বোঝা খুব সহজ। কিন্তু পরের অংশটি বোঝা অপেক্ষাকৃতভাবে কঠিন। এমনকি যদি এই বিশেষ ঘটনায় সেটি সিংহ নাও হয়ে থাকে, রহস্যজনক কোনো শব্দ বা নড়াচড়া মানে বিপদ, এমন কোনো সাধারণ 'নীতি' আপনার জীবন বাঁচাতে পারে। কারণ মাঝে মাঝে এটি আসলেই একটি সিংহ হতে পারে। আপনি যদি এটিকে আরো বেশি মাত্রায় নিয়ে যান, যখন ঘাসের মধ্যে প্রতিটি খসখস শব্দে

আপনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, তাহলে সেই গাছ আলু অনুসন্ধান এবং জীবন-যাপনের অন্য কাজগুলো সম্পন্ন করতে আপনাকে বেশ সমস্যায় পড়তে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই ভারসাম্যটি ঠিক করতে পারেন, তারপরও তিনি মাঝে মাঝে সিংহের উপস্থিতি বিশ্বাস করতে পারেন, যখন আসলেই কোনো সিংহ সেখানে নেই, যা কিনা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে,। আর সেটি বিশ্বাস করার প্রবণতা মাঝে মাঝে আপনার জীবন বাঁচাতে পারে। এটি একটি উপায় যেখানে অস্তিত্ব নেই এমন কিছুর উপর বিশ্বাস আপনার জীবন রক্ষা করতে পারে।

বিষয়টিকে আরো খানিকটা কারিগরী উপায়ে বলার একটি কৌশল হচ্ছে এই রকম। 'এজেন্সি' বা কার্যকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার মানবিক একটি প্রবণতা আছে। আর 'এজেন্সি' কী? বেশ, একটি 'এজেন্ট' হচ্ছে এমন কিছু যা কোনো একটি উদ্দেশ্যসহ পরিকল্পিতভাবে কিছু করতে সক্ষম (কার্যকর্তা)। যখন বাতাস লম্বা ঘাসগুলো নাড়া দিয়ে যায়, এখানে কোনো 'এজেন্সি' নেই। বাতাস 'এজেন্ট' নয়। সিংহ হচ্ছে একটি এজেন্ট। একটি সিংহ হচ্ছে এজেন্ট যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে খাওয়া। এটি জটিল পরিকল্পিত উপায়ে এর আচরণ পরিবর্তন করে যেন সে আপনাকে শিকার করতে পারে, এবং উদ্যম ও নমনীয়তার সাথে এটি এমনভাবে কাজ করে যেন আপনার পালিয়ে যাবার সব প্রচেষ্টা এটি প্রতিহত করতে পারে। এজেন্সির ব্যাপারে আতঙ্কিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এটি সময় আর প্রচেষ্টার অপচয় হতে পারে, কারণ সন্দেহভাজন এজেন্ট বাতাসের মত কিছুও হতে পারে। গড়পড়তাভাবে আপনার জীবন যত বেশি বিপদজ্জনক হবে, ততই সর্বত্র এজেন্টের উপস্থিতি দেখার মত পরিস্থিতির দিকে ভারসাম্যটি ঝুঁকে পড়া উচিত এবং সেই কারণে কখনো কখনো অসত্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়।

ইদানীং আমরা মূলত আর সিংহ অথবা স্যাবার-টুথ বাঘদের নিয়ে আতঙ্কিত থাকি না। কিন্তু আধুনিক মানুষও অন্ধকারে আতঙ্কিত হতে পারেন। শিশুরা 'বগিমেন' বা ভুত ভয় পায়। প্রাপ্তবয়স্করা চোর আর ছিনতাইকারীদের নিয়ে শঙ্কিত। রাতে বিছানায় একা শুয়ে থাকা অবস্থায় হয়তো আপনি কোনো শব্দ শুনলেন।এটি বাতাস হতে পারে। এটি পুরোনো বাড়ির কাঠও হতে পারে, যখন সেগুলো এর জায়গামত বসে না, তখন শব্দ করতে পারে। কিন্তু এটি অস্ত্রসহ কোনো অনুপ্রবেশকারী চোরও হতে পারে। হয়তো সেটি চোরের মত সুনির্দিষ্ট কিছু নাও হতে পারে, আপনার উদ্বিগ্ন হবার কারণ হচ্ছে, আপনি অজ্ঞাতনামা কোনো এজেন্টকে ভয় পাচ্ছেন, বাতাস অথবা শব্দ করা কড়িকাঠের মত 'এজেন্ট নয়' এমন কিছুর পরিবর্তে। কোনো এজেন্টের প্রতি ভয় - এমনকি

যদিও অযৌক্তিক, এমনকি কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে যদিও সেটি বেমানান হয় - পূর্বসূরি অতীত থেকে আমাদের মধ্যে সেটি লুকিয়ে থাকতে পারে। আমার সহকর্মী ড. অ্যান্ডি থমসন তার 'হোয়াই উই বিলিভ ইন গড(স)' বইয়ে এভাবে বলেছিলেন: 'কোনো একটি ছায়াকে চোর বলে আমাদের ভুল করার সম্ভাবনা অনেক বেশি, এবং একটি চোরকে ছায়া ভেবে আমাদের ভুল করার সম্ভাবনা কম'। এজেন্ট দেখার ক্ষেত্রে আমাদের একটি পক্ষপাতিত্ব আছে, এমনকি যখন কোনো এজেন্ট সেখানে থাকে না। আর আমাদের চারপাশে এজেন্সি দেখাই হচ্ছে মূলত ধর্ম।

আমাদের পূর্বসূরিদের ধর্ম ছিল 'অ্যানিমিস্টিক' বা সর্বপ্রাণবাদী: তারা সর্বত্র এজেন্টের উপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন, এবং প্রায়শই সেগুলোকে তারা দেবতা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। আর এভাবেই গ্রিক দেব-দেবীরা তাদের যাত্রা শুরু করেছিল, আর স্টিফেন ফ্রাইয়ের 'মিথোস' নামে চমৎকার একটি বইয়ে স্পষ্টভাবেই যা আমরা দেখেছি। সারা পৃথিবীব্যাপী নদী আর বজ্রপাতের দেবতা, সমুদ্র দেবতা আর চন্দ্র দেবতা, অগ্নি দেবতা আর সূর্য দেবতা, গহীন বনের দেবতা - হয়তো দানবও - ছিল। সূর্য একজন দেবতা ছিলেন, প্রার্থনা আর বিসর্জন দেবার মাধ্যমে যে এজেন্টকে উপাসনা করতে হবে, সন্তুষ্ট রাখতে হবে, অন্যথায় তিনি হয়তো পরবর্তী তিন দিন উদিত না হবার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আগুনও একজন দেবতা ছিলেন, তিনিও আনুগত্য আর ভোগ কামনা করতেন নয়তো তিনি হয়তো নিভে যেতে পারেন। বজ্রপাত একজন দেবতা ছিলেন, এই ধরনের ভয়ঙ্কর শব্দ দেবতা ছাড়া আর কেই বা করতে পারে? আবহাওয়া খামখেয়ালী আচরণ করে, যা পূর্বধারণা করা সম্ভব নয়, কিন্তু জীবনের জন্যে যা ছিল অপরিহার্য, তাই খুব স্বাভাবিক ছিল ভাবা, নিশ্চয়ই কোনো এজেন্টের খামখেয়ালি মেজাজ এই আচরণের জন্যে দায়ী। এই অনাবৃষ্টি বন্ধ করার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উপায় আছে। বৃষ্টি দেবতার উদ্দেশ্যে একটা বড় ধরনের বলি দান নিশ্চয়ই এই সমস্যা সমাধান করতে পারে। একটি ভয়ানক ঝড় কেবলই আমাদের বাড়ি ঘর ধ্বংস করেছে, নিশ্চয়ই আমরা ঝড়ের দেবতাদের যথেষ্ট পরিমানে তুষ্ট করতে পারিনি আমাদের উপাসনা দিয়ে, এবং সেই কারণে তারা আমাদের উপর ক্ষুদ্ধ হয়েছেন।

ইয়াওয়ে মানুষের মনে বিবর্তিত হয়ে ইহুদীদের একমাত্র দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন এবং কালক্রমে তিনি খ্রিস্টান এবং মসুলমানদেরও একমাত্র ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। কিন্তু এর আগে তিনি একজন 'ঝড়ের দেবতা' ছিলেন, কানানাইট জনগোষ্ঠীর উপাস্য বহু দেবতাদের মধ্যে মাত্র একজন, যেখান থেকে

ইহুদী জনগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল। ব্রোঞ্জ যুগের অন্যান্য কানাইনাট দেবতারা, ইয়াওয়ের পাশাপাশি যাদের উপাসনা করা হতো, তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন উর্বরতার দেবতা "বা'ল", দেবতাদের প্রধান 'এল', এবং তার স্ত্রী দেবী 'আশেরাহ'। ধর্মের ইতিহাসের কিছু বিশেষজ্ঞদের মতে ইয়াওয়ে পরে মানুষের মনে 'এল' এবং 'আশেরাহ একত্রিত হয়ে ইহুদীর এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পরিণত হয়েছিল। সুতরাং ব্রোঞ্জ যুগের সর্বপ্রাণবাদ পরবর্তীতে ক্রমশ এর বাহুল্য বর্জন করে লৌহ যুগের একেশ্বরবাদে (একজন ঈশ্বর) রূপান্তরিত হয়েছিল। পরবর্তীতে খ্রিস্ট ধর্ম এবং ইসলাম ইহুদীদের এই ঈশ্বরকে তাদের ঈশ্বর রূপে গ্রহন করে নিয়েছিল। এবং আরো পরে কানানাইটদের সেই ঝড়ের দেবতা আরো বেশি জটিলতর হয়ে উঠেছিলেন, এবং হার্ভার্ড আর অক্সফোর্ডের পণ্ডিত অধ্যাপকদের ধর্মতত্ত্ব বইগুলোর একজন নায়কে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে, মানুষ আবহাওয়া দেবতাদের তুষ্ট করতে বিসর্জন বা বলি দান করতো কোনো একটি অনাবৃষ্টি থামাতে। কিন্তু কেন তারা ভাবতেন, এমন কিছু করলে হয়তো তাদের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হতে পারে? মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে 'প্যাটার্ন-সিকার' (বা বিন্যাস-অনুসন্ধানী) - প্রাকৃতিক নির্বাচন আমাদের মস্তিষ্কে কোনো প্যাটার্ন বা বিন্যাস লক্ষ করার একটি প্রবণতা তৈরি করে দিয়েছে: কিসের পরে কি ঘটছে - আমরা ঘটনার ধারাবাহিকতাগুলো লক্ষ করি। আমরা লক্ষ করি, বিদ্যুচ্চমকের পর বজ্রপাতের শব্দ হয়, ধুসর কালো মেঘ আকাশে জমলে বৃষ্টি হয়, যদি বৃষ্টি না হয় খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় না। কিন্তু 'কিসের পর কি ঘটে' বিষয়টি বেশ জটিল। দেখা গিয়েছিল 'কিসের পর কি ঘটে' এই ধারাবাহিকতার অর্থ কিন্তু 'সবসময় কিসের পরে কি ঘটে' নয় বরং 'মাঝে মাঝে কিসের পর কি ঘটে'। কোনো নারী গর্ভবতী হন যৌন মিলনের পরে, কিন্তু সেটি সবসময়ই ঘটে না - মাঝে মাঝে ঘটে।

প্রায়শই আমরা ভাবি যে আমরা কোনো একটি বিন্যাস লক্ষ করছি, যখন কিনা সেখানে আসলেই কোনো বিন্যাসের অস্তিত্ব নেই। মাঝে মাঝে আমরা সেই বিন্যাসগুলো লক্ষ করতে ব্যর্থ হই যখন কিনা আসলেই সেখানে বিন্যাস আছে। যখন আমরা এই সব বিন্যাস শনাক্ত করার চেষ্টা করি, পরিসংখ্যানবিদ হিসাবে পরিচিত গণিতজ্ঞরা তখন সেখানে ভুল করার দুটি উপায় চিহ্নিত করেছেন। এই দুটি উপায়কে তারা বলেন, ফলস পজিটিভ এবং ফলস নেগেটিভ । একটি 'ফলস পজিটিভ' হচ্ছে যখন আপনি কোনো বিন্যাস দেখতে পাচ্ছেন বলে ভাবছেন কিন্তু আসলেই সেখানে কোনো বিন্যাস নেই। কুসংস্কার হচ্ছে খুব সাধারণ একটি ফলস পজিটিভ ভ্রান্তি। একটি ফলস নেগেটিভ হচ্ছে যখন আপনি

কোনো একটি বিন্যাস লক্ষ করতে ব্যর্থ হন, কিন্তু যখন সেখানে আসলেই একটি বিন্যাস আছে। মশার কামড় এবং ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবার মধ্য আসলেই একটি বিন্যাস আছে । কিন্তু অবশ্যম্ভাবীভাবে এটি ঘটবে না। ১৮৯৭ সালে স্যার রোনাল্ড রসের আগে আর কেউই এই বিন্যাসটি নিয়ে সময় ব্যয় করেননি । কালো বিড়ালের আপনার পথ অতিক্রম করা আর এর পরিণতিতে দুর্ভাগ্যে পতিত হবার মধ্যে আসলেই কোনো সত্যিকারের বিন্যাস নেই। কিন্তু বহু কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এই বিশেষ ফলস পজিটিভটি বিশ্বাস করেন।

গত বছর আমরা বৃষ্টির দেবতার নিকটে প্রার্থনা করেছিলাম এবং তারপর বৃষ্টি হয়েছিল। নিশ্চয়ই এই বিন্যাসটি অবশ্যই একটি অর্থ আছে?

না, এটি অর্থহীন। একটি ফলস পজিটিভ। যা-ই হোক না কেন বৃষ্টি হবার কথা ছিল। কিন্তু কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলা অত সহজ কাজ নয়।

শিশুটি জ্বর নিয়ে অসুস্থ। আমরা দেবতাকে তুষ্ট করতে একটি ছাগল কোরবানি দিয়েছিলাম এবং শিশুটিও আরোগ্য লাভ করেছিল। সুতরাং পরবর্তীতে কারো বেশি জ্বর উঠলে আমাদের উচিত হবে ছাগল কোরবানি দেয়া।

রোগ-প্রতিরোধতন্ত্র প্রায়শই কোনো ব্যক্তিকে ম্যালেরিয়া থেকে নিরাময় করতে পারে। কিন্তু সেটি কোনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বলার চেষ্টা করুন, যিনি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করেন যে, একটি ছাগল কোরবানী দিলেই কেবল ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি মিলবে।

এমন কি যদি আপনি কোনো অপরিবর্তনীয় বিন্যাসও লক্ষ করেন - কোনো কিছু যখন অন্য কোনো কিছুর পরে প্রতিবারই নির্ভরযোগ্যভাবে ঘটছে - এটি কিন্তু প্রমাণ করে না যে আগের কোনো ঘটনাই হচ্ছে পরবর্তী ঘটনাটি ঘটার কারণ। রুন্টন অ্যাকর্ন গ্রামের চার্চের ঘড়িটি সবসময়ই পার্শ্ববর্তী রুন্টন পারভা গ্রামের চার্চের ঘড়ির চেয়ে এক ঘন্টা আগে বাজে। কিন্তু রুন্টন অ্যাকর্নের ঘড়িটি কি রুন্টন পারভার ঘড়িটি বাজার কারণ হতে পারে? শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ এককভাবেই এই প্রশ্নটি সমাধান করতে পারে না। এমন কি বারবার পর্যবেক্ষণও নয়। কোনো একটি ঘটনার সম্ভাব্য কারণ প্রদর্শন করতে একটি মাত্র নিশ্চিত উপায় হচ্ছে - 'পরীক্ষা' করে দেখা। আপনাকে পরিস্থিতিটি আপনার উদ্দেশ্য যাচাই করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। রুন্টন অ্যাকর্ন টাওয়ারের উপরে উঠুন এবং ঘড়িটি বন্ধ করে দিন। রুন্টন প্রাভার ঘড়িটি কি এক ঘন্টা পরে বাজতে ব্যর্থ হয়েছে? এরপর পরীক্ষামূলকভাবে রুন্টন অ্যাকর্নের ঘড়িটি আরো দশ মিনিট এগিয়ে দিন। তারপরও কি রুন্টন পারভার ঘড়িটি ঠিক এর পরপরই

বাজে? অবশ্যই আপনাকে এই পরীক্ষাটি সম্মানজনক সংখ্যকবার পুনরাবৃত্তি করে দেখতে হবে কোনো ধরনের 'দৈবক্রমে ঘটবার' অর্থাৎ শুধুমাত্র উদ্দেশ্যহীন ভাগ্য হবার সম্ভাবনাটিকে পুরোপুরিভাবে বাতিল করতে।

আপাতদৃষ্টিতে আসলেই কোথাও বিন্যাসের উপস্থিতি আছে কিনা সেটির জন্য সঠিক পরীক্ষা করতে বেশ পরিশীলিত এবং হয়তো এই ধরনের পরীক্ষা করতে আগ্রহী আর একাগ্র মন থাকতে হবে। চার্চের ঘড়ি সংক্রান্ত পরীক্ষাটি করার উদ্যোগ নেবার জন্য আপনাকে আসলেই বিশেষভাবে আগ্রহী হতে হবে। আর যদি প্রশ্ন হয় ঘাসের মধ্য থেকে আসা শব্দটি আসলেই একটি সিংহ কিনা, পরীক্ষামূলক কোনো পদক্ষেপ প্রাণনাশক প্রমাণিত হতে পারে। তাই বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই, এর পরিবর্তে আমাদের পূর্বসূরিরা কুসংস্কারেই আশ্রয় নিয়েছিল।

বিখ্যাত পরীক্ষমূলক মনোবিজ্ঞানী বি. এফ. স্কিনার কবুতরদের মধ্যে কুসংস্কারের উপস্থিতি প্রমাণ করেছিলেন। তার পরীক্ষাধীন কবুতরগুলো কিছু বিন্যাস 'লক্ষ' করেছিল যা কিনা আসলেই সেখানে ছিল না: ফলস পজিটিভ। আটটি কবুতরের প্রত্যেকটিকে একটি করে 'স্কিনার বক্স' নামে পৃথক বাক্সে রাখা হয়েছিল। প্রতিটি বাক্সে বিদ্যুত নিয়ন্ত্রিত ফিডিং বা খাদ্য সরবরাহ করার যন্ত্র ছিল, যা ক্ষুধার্ত কবুতরদের খাদ্য সরবরাহ করতে পারে। স্বাভাবিকভাবে এই বাক্সগুলোয় খাদ্য সরবরাহ করার যন্ত্রটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন এটি শুধু তখনই খাদ্য সরবরাহ করে যখন এর মধ্য অবস্থানরত পাখিটি 'কিছু' (কোনো এক ধরনের আচরণ) করে, যেমন, বাক্সটির দেয়ালে থাকা একটি সুইচে ঠোকরানো। কিন্তু স্কিনার তার এই বিশেষ পরীক্ষাটির জন্য ভিন্ন কিছু করেছিলেন। তিনি খাদ্য সরবরাহ করার যন্ত্র আর পাখিদের আচরণের মধ্যকার সংযোগটি ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। পাখিটি যা-ই কিছু করুক না কেন, সে খাদ্য পাবে কিনা তার উপর সেগুলোর কোনো প্রভাব ছিল না। বাক্সের পাখিটির আচরণ নির্বিশেষে - অথবা আসলেই যদি এটি কিছুই না করে – অনিয়মিতভাবে সেই বাক্সে খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল।

পরীক্ষার ফলাফল ছিল বিস্ময়কর। আটটি পাখির ছয়টি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নানা ধরনের অভ্যাস গড়ে তুলেছিল। একটি পাখি ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘুরতো কেবল, খাদ্য পুরস্কার পাবার মধ্যবর্তী বিরতি পর্বে সাধারণত দুই থেকে তিনবার সে ঘুরতো। আমরা বলতে পারি এর একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ছিল যে, ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক বরাবর চক্কর দেবার কারণে খাদ্য সরবরাহ আসে। দ্বিতীয় একটি পাখি বাক্সটির উপরের কোনাগুলোর একটি দিয়ে বারবার এর মাথাটি

বের করতে শুরু করে। এটি 'ভেবেছিল' যে, এটাই খাদ্য সরবরাহের যন্ত্রটিকে খাদ্য সরবরাহ করতে প্ররোচিত করবে। অন্য দুটি পাখি খাদ্যের আশায় তাদের মাথা দিয়ে পেন্ডলুাম সুলভ একটি আচরণে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। তারা প্রথমে দ্রুত মাথা বাম থেকে ডানে ঘোরায় তারপর সেটিকে ধীরে ধীরে এর স্বাভাবিক অবস্থানে নিয়ে আসে। আরেকটি পাখির কুসংস্কারাচ্ছন্ন অভ্যাস ছিল মাথাটি উপরে দিকে নাড়ানো, যেন কোনো অস্তিত্বহীন বস্তুকে এটি উপরের দিকে ছুড়ে মারছে। এবং ষষ্ঠ পাখিটি এর ঠোকরানোর জন্যে মেঝে বেছে নিয়েছিল, তবে তার ঠোঁট কিন্তু মেঝে স্পর্শ করতো না।

স্কিনার এগুলোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচরণ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং আমি মনে করি তার সিদ্ধান্তে তিনি সঠিক ছিলেন। যা অবশ্যই সেখানে ঘটেছিল সেটি হচ্ছে, একটি পাখি হঠাৎ করেই সুনির্দিষ্ট এক ধরনের আচরণ শুরু করেছিল, ধরুন বাক্সের একটি কোন দিয়ে এর মাথা বের করা, আর সেটি ঘটেছিল খাদ্য সরবরাহ করার যন্ত্রটি সক্রিয় হবার ঠিক আগে। পাখিটি 'ভেবেছিল' (অবশ্যই আবশ্যিকভাবে সচেতনতার সাথে নয়) তার মাথার এই আচরণই হচ্ছে বাক্সে খাদ্য আসার কারণ। সুতরাং আবারও এটি সেই আচরণটির পুনরাবৃত্তি করেছিল। এবং, যখন এটি ঘটেছিল, সেটি ঘটনাক্রমে পরবর্তী খাদ্য সরবরাহের ঠিক আগেই ঘটেছিল। প্রতিটি পাখি ভিন্ন ভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনো আচরণ শিখেছিল, এবং বাক্সে ঘটনাক্রমে খাদ্য আসার ঠিক আগে এটি যা কিছু করছিল সেটি পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে। এবং সেটাই, মনে হয় সম্ভাব্য কারণ, কেন আমাদের পূর্বসূরিরা কোনো শিশুর জয় নিরাময় করতে যেমন, ধরুন প্রার্থনা, অথবা একটি ছাগল বিসর্জন দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছিল। স্কিনারের কবুতরগুলো আর মানুষের মধ্য অন্য সাদৃশ্যটি হচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায়, স্থানীয় মানুষ বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস গড়ে তোলে, ঠিক যেভাবে ছয়টি ভিন্ন কবুতর তাদের 'স্থানীয়' স্কিনার বাক্সে তাদের অদ্ভুত আচরণগুলো গড়ে তুলেছিল।

তারা যা-ই কিছু করুক না কেন, রুলে হুইল কিংবা ওয়ান-আর্মড ব্যান্ডিট জুয়ার খেলায় জুয়াড়ীরা দৈবক্রমে পুরষ্কৃত হন। একজন জুয়াড়ী ভাবেন যখনই তিনি তার 'ভাগ্যবান শার্ট'টি পরেন তখন তার ভাগ্য আরো বেশি সুপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। অথবা কোনো একবার তিনি সৌভাগ্যের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং সাথে সাথেই একটি জ্যাকপট জিতেছিলেন। ঠিক স্কিনারের কবুতরগুলোর মত, তিনি সেই আচরণটির পুনরাবৃত্তি করেন। তার আর কখনোই জ্যাকপট জেতা হয় না ঠিকই কিন্তু সেই প্রার্থনা করার অভ্যাসটি তিনি আর ছাড়তে পারেন না। আপনি

কোনো সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে একটি স্লট মেশিনকে জ্যাকপট দেওয়াতে পারবেন না অথবা, কোনো রুলে হুইলের বলকে আপনার ইচ্ছামত জায়গায় পড়তে বাধ্য করতে পারবেন না। কিন্তু তারপরও মন্টে কার্লো থেকে লাস ভেগাস অবধি জুয়াড়ীরা তাদের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব এমন সম্ভাব্য সবধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে পূর্ণ।

বহুদিন আগে, যখন কম্পিউটারের সাথে স্ক্রিন যুক্ত হয়নি তখন স্ক্রিনের পরিবর্তে কম্পিউটার থেকে তথ্য টেলিপ্রিন্টারে প্রিন্ট করা হতো। একবার ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার রুমে কাজ করার সময়, কম্পিউটারের উত্তরের প্রত্যাশায় আমি একজন ছাত্রকে দেখেছিলাম বেশ অধৈর্য্য হয়ে অপেক্ষা করছে। বারবার সে তার আঙ্গুলের গিট দিয়ে টেলিপ্রিন্টারের উপর বাড়ি দিচ্ছিল, যদিও তার অবশ্যই জানা ছিল তার পক্ষে কোনোভাবেই কম্পিউটারকে দ্রুত কাজ করতে প্ররোচিত করা সম্ভব নয়। হয়তো এই কাজটি এর আগে একবার সে করেছিল ঘটনাক্রমে কম্পিউটারের ফলাফল প্রিন্ট করার ঠিক আগেই, এবং সে তার এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন অভ্যাসটি আর কখনোই ছাড়তে পারেনি। স্কিনারের কবুতরগুলোর মতোই।

ধরুন কোনো এক অনাবৃষ্টির সময় আমাদের পূর্বসূরিরা হয়তো বৃষ্টি দেবতার উদ্দেশ্য কোনো কিছু বিসর্জন দেবার কথা ভেবেছিলেন। প্রতি দিন তারা সেটি করেছিলেন। এবং পরিশেষে বৃষ্টি এসেছিল। বৃষ্টি দেবতাকে অবশেষে প্ররোচিত করতে হয়তো বহু বিসর্জনের দরকার হয়েছিল - যেভাবে তারা ভেবেছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ কখনোই বৃষ্টি দেবতার উদ্দেশ্যে কোনো কিছু বিসর্জন না করে পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করেননি বৃষ্টি এমনিতেই আসে কিনা। একজন বিজ্ঞানী হলে সেটি করতেন। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরিরা বিজ্ঞানী ছিলেন না, এবং তারা বৃষ্টি দেবতাকের উদ্দেশ্যে বিসর্জন 'না' দেবার ঝুঁকি নিতে সাহস পাননি।

অবশ্যই, আমি এই দৃশ্যটি কেবল অনুমান করছি। কিন্তু আমি মনে করি এমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এমন কি আজ পর্যন্ত ঠিক এটাই বহু উপজাতির গোত্রীয় মানুষরা করে থাকেন। এবং স্কিনারের পরীক্ষাগুলো অবশ্যই অনুমান নয়। এগুলো আসলেই ঘটেছিল। এছাড়াও এটি অনুমান নয় যে, মানব জুয়াড়ীরা ভাগ্যবান সংখ্যা, ভাগ্যবান চার্ম বা তাবিজ কবজ এবং প্রার্থনায় বিশ্বাস করেন। যখনই ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে সে সংক্রান্ত কোনো অনিশ্চয়তা থাকে (যাকে আমরা বলি 'চান্স' বা 'ভাগ্য') এবং আমরা একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি চাই, তখনই মানুষের প্রার্থনা করা, অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনো অভ্যাস গড়ে তোলার প্রবণতা আছে । কুসংস্কার নিজে সম্ভবত আমাদের পূর্বসূরিদের টিকে থাকতে

কোনো সহায়তা করেনি। কিন্তু পৃথিবীর সব প্রপঞ্চের মধ্যে বিন্যাস লক্ষ করার একটি সাধারণ প্রবণতা - যখন ঘটনাগুলো গুরুত্বপূর্ণ অন্য ঘটনাগুলোর পর সাধারণত ঘটে থাকে, সেগুলো লক্ষ করার প্রচেষ্টাটি সম্ভবত সহায়তা করেছিল। এবং কুসংস্কার হচ্ছে এরই একটি উপজাত। যেভাবে জেব্রারা শিকারী প্রাণীদের খাদ্যে পরিণত হওয়া, আর যথেষ্ট পরিমানে খাদ্য গ্রহন করার ঝুঁকির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে, মানব বিন্যাস-অনুসন্ধানকারীদেরও এই দুটির ঝুঁকির মধ্যে একটি ভারসাম্যে পৌঁছাতে হয়: কোনো একটি বিন্যাস লক্ষ করার ঝুঁকি যখন সেখানে কোনো বিন্যাস নেই (কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'মিথ্যা' পজিটিভ) এবং যখন একটি বিন্যাস থাকে এবং সেটি লক্ষ করতে ব্যর্থ হবার ঝুঁকি ('মিথ্যা' নেগেটিভ)। আর বিন্যাসগুলো লক্ষ করার প্রবণতাটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের সমর্থন পায়। কুসংস্কার আর ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে এই প্রবণতারই একটি উপজাত।

এই বিষয়টি নিয়ে আরেকটি চিন্তার ধারা আছে। আমাদের আদিমতম মানব পূর্বসূরিরা খুবই বিপজ্জনক একটি এলাকায় বসবাস করতেন, আফ্রিকার সাভানা। সেখানে পায়ের নীচে ছিল বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু, মাকড়শা আর সেন্টিপিডরা। যেখানে গাছে লুকিয়ে থাকতো বিপজ্জনক চিতাবাঘ আর অজগর, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতো সিংহ। আর নদীতে ছিল কুমির। প্রাপ্তবয়স্করা এই সব বিপদের কথা জানতেন, কিন্তু এই বিপদের ঝুঁকিগুলো সম্বন্ধে শিশুদের জানানো আবশ্যক ছিল। পিতামাতারা নিশ্চয়ই তাদের সন্তানদের এইসব বিপদগুলো সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে আধুনিক শহরে পিতামাতারা তাদের শিশুদের রাস্তা পার হবার আগে ডানে-বামে ভালো করে দেখে নিয়ে পার হবার জন্য সতর্ক করে দেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন সন্তানদের বিপদের ঝুঁকি সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়ার এই সব পিতামাতার আচরণগুলোকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হতে সহায়তা করেছিল। আর প্রাকৃতিক নির্বাচন সেই জিনগুলোকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হতে সহায়তা করেছিল যেগুলো শিশুদের মস্তিষ্কে তাদের পিতামাতাকে বিশ্বাস করার বিষয়টি গভীরভাবে প্রোথিত করে দেয়।

এটুকু বোঝা অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক সহজ। এখন খানিকটা জটিল অংশ। যদি প্রাপ্তবয়স্করা কখনও তাদের শিশুদের ভালো উপদেশের সাথে খারাপ কোনো উপদেশ দিয়ে থাকেন, ভালো উপদেশগুলো থেকে খারাপ উপদেশগুলো পৃথক করার কোনো উপায় কিন্তু শিশু মস্তিষ্কের নেই । আর যদি শিশুর মস্তিষ্ক সেই পার্থক্য করতে সক্ষম হতো তাহলে প্রাপ্তবয়স্কদের উপদেশ এমনিতেই আর

দরকার হতো না। কারণ শিশুরা সেটি সম্বন্ধে 'জানতো', যেমন ধরুন, সাপ হচ্ছে বিপজ্জনক একটি প্রাণী। মূল বক্তব্যটি হচ্ছে যে, যদি শিশুরা ইতোমধ্যেই সেই বিষয়ে জানতো, পিতামাতার তাহলে সেটি সম্বন্ধে কোনো কিছু বলার আর কোনো দরকার হতো না। সুতরাং যদি, কোনো কারণে, কোনো পিতামাতা তার শিশুকে অনুপযোগী কোনো উপদেশ দেন - যেমন, 'তোমাকে দিনে মোট পাঁচবার প্রার্থনা করতে হবে' - শিশুটির পক্ষে জানার কোনো উপায় নেই যে, এই উপদেশটি অর্থহীন। প্রাকৃতিক নির্বাচন শিশুর মস্তিষ্কে গভীরভাবে গেথে দিয়েছে সেই নিয়মটি, 'তোমার পিতামাতা যা কিছু বলেন সেটি বিশ্বাস করো'। এবং সেই নিয়মটি তার পূর্ণ শক্তি নিয়েই সক্রিয় হয়ে ওঠে এমনকি যখন 'আপনার পিতামাতা যা কিছু বলেন' সেটি আসলেই অসত্য আর অর্থহীন। অথবা যার ভিত্তি সেই কবুতর-সদৃশ কুসংস্কার।

কিন্তু আপনি সম্ভবত ভাবছেন, কেনই বা একজন পিতামাতা তাদের সন্তানদের অর্থহীন অথবা অসত্য কিছু বলবেন? বেশ, পিতামাতারাও একসময় শিশু ছিলেন। তাদেরকেও একসময় তাদের পিতামাতারা উপদেশ দিয়েছিলেন। তাদেরও কোন উপদেশটি ভালো আর কোন উপদেশটি খারাপ আর অর্থহীন সেটি বিচার করার কোনো উপায় ছিল না। খারাপ কিংবা ভালো নির্বিশেষে উপদেশগুলো পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। আর কীভাবে এই কবুতর-সদৃশ কুসংস্কারগুলো প্রথম শুরু হয়েছিল সেটি সম্ভবত গল্পটিরই একটি অংশ। প্রজন্ম অতিক্রান্ত হলে, অর্থহীন কুসংস্করাচ্ছন্ন উপদেশগুলো পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত এবং সম্প্রসারিত হয়েছিল সেই একই 'চাইনিজ হুইসপার' (কান-কথা) প্রভাবে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে যেভাবে সেটিকে আমরা কাজ করতে দেখেছিলাম। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন ধরনের উপদেশ এভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়েছিল। আর ঠিক সেটাই আমরা লক্ষ করি ঘটেছিল, যখন পৃথিবীর নানা জায়গায় বিষয়টি আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি।

অবশ্যই কিছু বুদ্ধিমান শিশু, যখন তারা বড় হয়, তারা এই ধারণকৃত বিশ্বাসগুলোর পক্ষে থাকা প্রমাণগুলো ওজন করে দেখে, এবং আগের প্রজন্মের বাজে অর্থহীন উপদেশগুলো থেকে নিজেদের মুক্ত করে আনতে সফল হয় - উপদেশগুলোর অর্থহীনতা বুঝতে পারার মত প্রাপ্তবয়স্কতা অর্জন করে। এই বইয়ের শিরোনামের কথা ভাবুন। কিন্তু সেটি সবসময় ঘটে না, আর আমি বিশ্বাস করি এটি আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করে কীভাবে ধর্মগুলোর সূচনা হয়েছিল এবং কেন সেগুলো এখনো টিকে আছে।

এটি এক ধরনের ‘বাইপ্রোডাক্ট’ বা উপজাত তত্ত্ব। অর্থহীন অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসগুলো, যেমন, দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করা অথবা ম্যালেরিয়া নিরাময় করতে ছাগল কোরবানি দেয়ায় প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহারসিদ্ধ বিশ্বাসগুলোর উপজাত - অথবা বরং পিতামাতা, শিক্ষক, যাজক এবং অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা বিশ্বাস করতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের রূপ দেয়া শিশু মস্তিষ্কের একটি উপজাত হিসাবে এটি সঞ্চারিত হয়। আর এটিকে এভাবে হস্তান্তরিত হতে বিশেষভাবে সহায়তা করে প্রাকৃতিক নির্বাচন, কারণ বয়োজ্যেষ্ঠরা শিশুদের যা কিছু বলেন তার অধিকাংশই সাধারণ কান্ডজ্ঞান-নির্ভর ব্যবহারসিদ্ধ।

‘বাইপ্রোডাক্ট’ বা উপজাত তত্ত্বটি ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি সত্যিকারের ডারউইনিয় ব্যাখ্যা। সত্যিকারের ডারউইনিয় ব্যাখ্যাগুলো মূলত কোনো একটি জনগোষ্ঠীর জিনপুল বা জিনসম্ভারে নির্বাচিত জিনগুলোর ক্রমান্বয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি। আরো কয়েক ধরনের ব্যাখ্যা আছে যা আপাতদৃষ্টিতে ডারউইনিয় ব্যাখ্যা মনে হলেও কিন্তু সেগুলো আসলে তা নয়। যেমন, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য পুরো একটি গোষ্ঠী অথবা জাতি হয়তো আরো ভালো ভাবে বেঁচে থাকতে পারে। আর এর মানে ধর্ম নিজেই টিকে থাকতে পারে। দুটি জাতির কথা কল্পনা করুন যাদের ধর্মীয় বিশ্বাস পরস্পর থেকে ভিন্ন। এদের মধ্যে একটি জাতির যুদ্ধপ্রিয় একজন ঈশ্বর/দেবতা আছেন: ইয়াওয়ে/আল্লাহ অথবা ভাইকিংদের যুদ্ধপ্রিয় দেবতাদের মত। এই ঈশ্বর/দেবতাদের যাজকরা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার পূণ্য সম্বন্ধে ধর্ম প্রচারণা করেন। হয়তো তারা প্রচার করেন, শহীদ (শহীদের মৃত্যু) হয়েছেন এমন কোনো যোদ্ধা শহীদদের জন্যে নির্মিত একটি বিশেষ বেহেশতে সরাসরি প্রবেশ করবেন। অথবা সরাসরি ‘ভালহালায়’ (নর্স পুরাণের স্বর্গ) প্রবেশ করবেন। এই জাতির যাজকরা গোত্রীয় ঈশ্বর/দেবতাদের জন্য যুদ্ধ করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে এমন তরুণদের এমনকি স্বর্গে সুন্দরী কুমারীদের সান্নিধ্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন (আপনি কী আমার মত সেই হতভাগা কুমারীদের জন্য দুঃখ অনুভব করছেন?)। এর ব্যতিক্রম অন্য জাতির ঈশ্বর/দেবতারা হচ্ছেন শান্তিপ্রিয়। তাদের যাজক যুদ্ধে সমর্থনে কোনো প্রচারণা করেন না। তারা যুদ্ধে শহীদ হওয়া যোদ্ধাদের স্বর্গীয় পরমানন্দের প্রতিশ্রুতি দেন না। হয়তো তারা আদৌ কোনো স্বর্গের কথা প্রচার করেন না। বাকি সবকিছু যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে কোন জাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধাদের দেখবো? কোন জাতিটির অন্য জাতিটিকে পরাজিত করার বেশি সম্ভাবনা আছে? এবং সেই কারণে, এ দুটি ধর্মের কোনটি বেশি প্রসার লাভ হবার সুযোগ পাবে? এই প্রশ্নের মধ্যেই এর উত্তর আছে। ইতিহাসই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে আরব থেকে পুরো মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারতীয়

উপমহাদেশে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটেছে। আর দক্ষিণ এবং মধ্য-আমেরিকায় স্প্যানিশ আগ্রাসনকারীদের দ্বারা খ্রিস্ট ধর্মের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও একই ভাবে এটি প্রযোজ্য ।

যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়াও অন্য কিছু সম্ভাব্য উপায়ে ধর্মগুলো জাতি বা গোত্রগুলোকে সহায়তা করতে পারে। প্রস্তাব করা হয়েছে যে, আমি মনে করি আপাতদৃষ্টিতে যা যুক্তিসঙ্গত, একটি ভাগ করে নেয়া ধর্ম এবং একগুচ্ছে প্রাচীন আচার আর ঐতিহ্য সমাজগুলোকে নিজেদের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করতে এবং এমন কিছু উপায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে সহায়তা করেছিল যা সমাজের প্রতিটি সদস্যকেই উপকৃত করেছিল। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা নির্বুদ্ধিতা মনে হতে পারে, কারণ আধুনিক বিজ্ঞান জানে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা, আবহাওয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু যদি ছন্দময় বৃষ্টির জন্য নাচে অংশ নিতে সবার একত্রিত হওয়ার আচারটি গোত্র অভ্যন্তরে সৌহার্দ্য আর সহযোগিতা বাড়াতে সহায়তা করে থাকে? ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং শ্রদ্ধেয় সহকর্মীরা ধারণাটিকে সে পরিমান গুরুত্ব দিয়েও ভেবেছেন [যেমন, জোনাথন হাইট, 'ইন রাইটিয়াস মাইন্ড' (লন্ডন, পেনগুইন, ২০১২) এবং ইউভাল নোয়া হারারি, 'সেপিয়েন্স' (লন্ডন, ভিন্টেজ, ২০১৪)]। ধর্মের এই সমৃদ্ধশালী অবস্থানের জন্য ডারউইনিয় নয় এমন আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে অধীন সমাজগুলোর উপরে তাদের প্রাধান্য টিকিয়ে রাখতে রাজা এবং যাজকরা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এছাড়া আরো একটি (এবং আসলেই এটি সত্যিকারের ডারউইনিয় কারণ হবার বেশ নিকটবর্তী) তত্ত্ব হচ্ছে যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ধারণাগুলোসহ এই ধারণাগুলো 'নিজেই', জিন থেকে যে ধারণাগুলো পৃথক করতে আমি 'মিম' নাম দিয়েছিলাম, জনগোষ্ঠীর মনের মধ্যে এর সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করতে প্রতিদ্বন্দ্বী 'মিম'গুলোর সাথে জিন-সদৃশ একটি উপায়ে প্রতিযোগিতা করে। এসব বিচিত্র তত্ত্বগুলো নিয়ে এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার মত পরিসর নেই। এই সংক্রান্ত কী ধরনের বিতর্ক চলমান সেই বিষয়ে আপনাকে খানিকটা ধারণা দিতেই আমি কেবল সেগুলো উল্লেখ করলাম। কিন্তু আমাকে আমার আলোচনায় আরো অগ্রসর করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমি সেই প্রশ্নে ফিরে আসবো, কেন প্রাকৃতিক নির্বাচন ভালোত্ব বা পরার্থবাদ সমর্থন করে - অন্ততপক্ষে, সীমিত এক ধরনের 'ভালোত্ব', যা হয়তো নৈতিকতা, কোনটি ভালো সেই সংক্রান্ত বোধ এবং ভালো কাজ করার একটি বাঞ্ছনীয়তা বা কাম্যতার এক ধরনের বিবর্তনীয় ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু প্রথমে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, আমি

মনে করি নৈতিকতার পরিবর্তনগুলো, যা নিয়ে আমি অধ্যায় ছয়ে আলোচনা করেছিলাম, সেগুলো আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক নির্বাচন হয়তো আমাদের মস্তিষ্কে সীমিত আকারের ভালোত্ব বা পরার্থবাদ গড়ে দিয়েছে। কিন্তু এটি স্বার্থপরতার ভিত্তিও সেখানে গড়ে দিয়েছে। এবং প্রায়শই যা হয়ে থাকে, এখানে একটি ভারসাম্য আছে। ইতিহাসে যা ঘটেছে সেটি হচ্ছে, এই ভারসাম্যটি পরিবর্তিত হয়েছে, এটি সরে এসেছে 'ভালো'র দিকে, যেমন আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখেছিলাম।

তাহলে, এই ভালোত্ব বা পরার্থবাদের বিবর্তনীয় ভিত্তি কী? অধ্যায় আটে আমরা দেখেছি যে, বিবর্তন মূলত কোনো জনগোষ্ঠীর জিন সম্ভারে সফল জিনগুলোর সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়া (আর 'সফলতা' মানে এটাই বোঝায়)। জিন, যা কোনো সদস্যকে দ্রুত গতিতে দৌড়াবার জন্য সক্ষম করে তোলে (যদিও অতটা দ্রুত না যে যে তার পা রেসে ঘোড়ার মত সহজে ভেঙ্গে যেতে পারে), সেই জিনগুলো জনগোষ্ঠির জিন সম্ভারে ক্রমশ সংখ্যায় বাড়তে থাকে। যে জিনগুলো এমন মথ, গিরগিটি আর ব্যাঙ তৈরি করে যাদের গাছের বাকলে প্রেক্ষাপটে সহজে দেখা যায় না, সে জিনগুলো সংখ্যায় ক্রমশ বাড়তে থাকে। যে জিনগুলো পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের প্রতিপালন ও সুরক্ষা করায়, সেগুলোর সংখ্যা জনগোষ্ঠীতে বাড়তে থাকে। কারণ সেই একই জিনের অনুলিপিগুলো তাদের প্রতিপালন ও সুরক্ষা করা শিশুদের শরীরে টিকে থাকে। সুতরাং নিজের শিশুদের প্রতি ভালো আচরণ করার কারণটি বোঝা আদৌ কঠিন নয়, অন্ততপক্ষে যখন প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে ভাববেন।

কিন্তু আপনার জিনের অনুলিপি শুধুমাত্র আপনার নিজের সন্তানের শরীরেই থাকে না। আপনার নাতি-নাতনী, ভাইপো, ভাতিজা, ভাই এবং বোনের শরীরেও সেগুলো থাকে। সম্পর্ক যতই দূরের হয়, ততই অনুরূপ জিন ভাগ করে নেবার সম্ভাবনাও হ্রাস পেতে থাকে। যে জিনটি আপনার শিশু অথবা আপনার বোনের জীবন বাঁচায়, ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা আছে, সেই জিনটি আপনার বোন আর সন্তান দুজনেই ভাগাভাগি করে নেবে। আপনার ভাইপোর জীবন বাঁচানোর জন্য জিনটির ২৫ শতাংশ সম্ভাবনা থাকবে সেই ভাইপোর শরীরে থাকার যার জীবন বাঁচানো হয়েছে। আর প্রথম কাজিনদের জীবন বাঁচানো জিনের ১২.৫ শতাংশ সম্ভাবনা আছে সেই কাজিনের শরীরের থাকার, যার জীবন আপনি রক্ষা করবেন [এই শতাংশগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে। খানিকটা কঠিন। আপনি হয়তো পড়েছেন যে, আর যা-ই হোক না কেন আমাদের জিনের অধিকাংশই আমরা ভাগ করে নেই অন্য সবার সাথে। এটি সত্য, এবং এছাড়াও শিম্পাঞ্জি

আর অন্য বহু প্রাণীদের সাথে আমরা আমাদের অধিকাংশ জিন ভাগ করে নেই। জ্ঞাতিভাইদের (কাজিন) মত আত্মীয়দের জন্য আমি যে সংখ্যাটি উল্লেখ করেছি সেটি কোনো একটি আত্মীয়ের একটি জিনটি ভাগ করে নেবার সম্ভাবনার প্রতি তথ্যনির্দেশ করছে - যা এক ধরনের 'বেসলাইন' (যে জনগোষ্ঠীতে সবার সেই জিনটি বহন করার সম্ভাবনা) সম্ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি হবে।]

সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচন সেই একক সদস্যদের সহায়তা করে যারা একজন প্রথম কাজিনের জীবন বাঁচাতে অথবা সহায়তা করতে খানিকটা ঝুঁকি নেয়। কিন্তু ভাইঝির জীবন বাঁচাতে আরো বড় ঝুঁকি নেয়া একক ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক নির্বাচন সহায়তা করে। বোন বা পুত্রের জীবন বাঁচাতে নির্বাচন এমনকি আরো বড় এবং বেশি পরিমানে ঝুঁকি নেয়। সরাসরি তাদের জীবন বাঁচানোই শুধু নয়, তাদের যে-কোনো উপায়ে সহায়তা করাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যেমন তাদের খাওয়ানো, শিকারী প্রাণী থেকে তাদের রক্ষা করা অথবা খারাপ আবহাওয়া থেকে তাদের সুরক্ষা করা।

তাত্ত্বিকভাবে, প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি ভাইকে খাওয়ানো ততটাই সমর্থন করে যতটা এটি কোনো ছেলে খাওয়ানো সমর্থন করে। কিন্তু ব্যবহারিক পর্যায়ে কোনো ভাই বা বোনকে খাওয়ানোর চেয়ে পুত্র বা কন্যাকে কার্যকর উপায়ে খাওয়ানোর সুযোগ বেশি থাকে। আর সেই কারণেই পিতামাত্রার প্রতিপালন ভাইবোনের প্রতিপালনের তুলনায় অনেক বেশি সাধারণ । ভাইবোনের প্রতিপালন আসলে আরো খুব বেশি পরিমানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সামাজিক পতঙ্গ যেমন, পিপড়া, মৌমাছি, ভীমরুল আর উইপোকাদের ক্ষেত্রে। এছাড়াও কিছু পাখি যেমন আমেরিকার একর্ন উডপেকার এবং আফ্রিকার স্তন্যপায়ী যেমন, ন্যাকেড মোল র‍্যাটদের ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাণীদের ক্ষেত্রে এমন কিছু প্রত্যাশা করা যায় না যে, তারা আসলেই 'জানে' তাদের নিকটাত্মীয়রা কারা। জিনের প্রাকৃতিক নির্বাচন পাখিদের মস্তিষ্কে এমন কোনো একটি নিয়ম গড়ে দেয়া না যে, 'তোমার সন্তানদের খাওয়া দাও'। এর পরিবর্তে মস্তিষ্কে গড়ে ওঠা নিয়মগুলো হয় খানিকটা এরকম, 'যে-কোনো কিছুকে খাওয়া দাও যা এর মুখ খোলে এবং তোমার নীড়ের মধ্যে চিৎকার করে খাদ্য দাবি করে'। আর এভাবে অন্য পাখির নীড়ে তাদের ডিম পাড়ার মাধ্যমে কোকিলরা পার পেয়ে যায়। শিশু কোকিল সাধারণত আগেই ডিম থেকে বের হয়ে আসে, এবং খাদ্যের প্রতিযোগিতা কমাতে এটি অন্য ডিমগুলোকে তার পালক মায়ের নীড় থেকে বাইরে ফেলে দেয়। পালক পাখি পিতামাতা তাদের মস্তিষ্কে জিনের বেধে দেয়া নিয়মের অনুগত থাকে: 'তোমার নীড়ে চিৎকার করে

আর মুখ খোলে এমন কিছুকে খাওয়া দাও'। আর ঠিক সেটাই শিশু কোকিলরা করে থাকে। এবং সেই কারণে এটি খাওয়াও পায়।

আমাদের বন্য পূর্বসূরিরা সম্ভবত বেবুনদের মত ক্ষুদ্র, ভ্রাম্যমান দল হিসাবে বসবাস করতো। পরবর্তীতে তারা ক্ষুদ্র গ্রামে বসবাস করতে শুরু করে। এই দুটো পরিস্থিতিতে তাদের পরিস্থিতি একটি সম্প্রসারিত পরিবারের সমতূল্য ছিল। গ্রাম বা দলের প্রায় সবাই সম্পর্কে আপনার চাচা, মামা, জ্ঞাতিভাই কিংবা ভাইপো বা ভাইঝি হতো। সুতরাং মস্তিষ্কে গড়ে ওঠা এমন, 'সবার সাথে ভালো আচরণ করো' নিয়মটি 'তোমার জিনগত আত্মীয়দের প্রতি সদয় আচরণ করো' নিয়মটিরই সমতূল্য হতো। আমরা অধিকাংশই এখন আর ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করি না। আর আপনি যাদের চেনেন তারা সবাই আপনার জ্ঞাতি ভাই কিংবা ভাইঝি বা অন্য ধরনের আত্মীয়, সেটিও সত্য নয়। কিন্তু সেই নিয়মটি, 'সবার সাথে ভালো আচরণ করো', এখনো আমাদের মস্তিষ্কে লুকিয়ে আছে। সেটি হয়তো ডারউইনিয় কারণের একটি অংশ হতে পারে যা ব্যাখ্যা করে কেন আমরা অন্যদের প্রতি সদয় আর বন্ধুসুলভ আচরণ করার প্রবণতা প্রদর্শন করি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর একটি উলটো পিঠও আছে। তাদের ক্ষুদ্র দল বা গ্রামে আমাদের পূর্বসূরিদের মস্তিষ্কে গড়ে ওঠা 'পূর্বপরিচিত নয় এমন যে কারো সাথে শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করো' নিয়মটি 'আত্মীয় নয় এমন যে কারো সাথে শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করো' নিয়মের সমতূল্য ছিল। অথবা 'তুমি এবং তোমার পরিচিত কারো চেয়ে দেখতে ভিন্ন এমন যে-কারো সাথে শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করো'। এ ধরনের মস্তিষ্কের আইনগুলো জাতিগত বিদ্বেষ বা বর্ণবাদের জৈববৈজ্ঞানিক ভিত্তি হতে পারে। অথবা 'অন্য' হিসাবে মনে করা এমন কারো প্রতি শত্রুভাবাপন্ন আচরণ, যেমন, সাম্প্রতিক সময়ের অভিবাসীরা।

কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কে শুধু অবচেতন গড়পড়তা নিয়মগুলোই শুধু নেই। পিপড়া আর অ্যাকর্ন উডপেকারদের ব্যতিক্রম, কে কার আত্মীয় আসলেই সেটি জানার জন্য মানব মস্তিষ্কের চিন্তা করার শক্তি আছে, আর ভাষা যে শক্তিকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। মস্তিষ্কে গড়ে ওঠা 'সবার সাথে ভালো আচরণ করো' নিয়মটিকে অতিক্রম করে যেতে পারে মস্তিষ্কের আরো সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম: 'তাদের প্রতি ভালো আচরণ করো, যাদের তুমি আসলেই তোমার আত্মীয় বলে জানো' ।

কালাহারি মরুভূমির !কুং জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরকে যে-কোনো আধুনিক মানুষের মতোই আমাদের পূর্বসূরিদের সমপরিমান নিকটবর্তী ভাবা হয়ে থাকে। উত্তর থেকে কৃষ্ণাঙ্গ আগ্রাসনকারী আসার বহু আগে থেকেই হালকা বাদামী

রঙের !কুংরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করতো। শিকারী-সংগ্রাহক ! কৃরা পারিবারিক গোষ্ঠী হিসাবে বসাবাস করে। প্রতিটি গোষ্ঠী নির্দিষ্ট একটি শিকার করার এলাকার উপর তাদের মালিকানা দাবী করে। যদি কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত এলাকায় অজান্তে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে বেশ বিপদে মুখে পড়তে হয়, যদি না সে এলাকাটির মালিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয় তাদের গোষ্ঠীর কারো সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। একবার গাও নামে একজন ব্যক্তি খাদুম নামে একটি এলাকায় ধরা পড়েছিল, সেটি ছিল তার নিজস্ব এলাকার সীমানার বাইরে। খাদুমের স্থানীয়রা তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গাও তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে খাদুমের কোনো এক ব্যক্তির নাম এবং তার বাবার নাম একই। এবং আরো আবিষ্কৃত হয়েছিল যে খাদুমে এমন একজন আছেন যার নামও হচ্ছে গাও। এর ইঙ্গিত করেছিল তাদের কিছু সাধারণ আত্মীয়-স্বজন আছে। এরপর খাদুমের মানুষের গাওকে গ্রহন করে নিয়েছিল এবং তাকে খাদ্য দিয়েছিল।

নিউ গিনির কেন্দ্রে অবস্থিত পর্বতগুলো বহু সহস্র বছর ধরেই বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৯৩০ এর দশকে অষ্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভিযাত্রীরা সেখানে বসবাস করা প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষ আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়েছিলেন। এ ‘নিউ গিনি হাইল্যান্ডার্স’রা বাইরের পৃথিবী থেকে আসা কাউকেই এর আগে কোনোদিনও দেখেনি। উভয়পক্ষের জন্যই প্রথম সাক্ষাতটি বেশ ভীতিকর একটি অভিজ্ঞতা ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য প্রস্তাব করছে যে নিউ গিনি হাইল্যান্ডাররা প্রায় ৫০০০০ বছর ধরে সেখানে বসবাস করছেন। কিছু গোত্র এখনোও কালাহারির !কুংদের মত শিকারী-সংগ্রাহক। অন্য গোত্রগুলো তাদের শিকার-সংগ্রাহক জীবনযাত্রা পরিবর্তন করে নয় হাজার বছর আগে কৃষিকাজ শুরু করেছিল। স্বতন্ত্রভাবে মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, চীন আর মধ্য-আমেরিকায় কৃষিকাজের সূচনা হবার মাত্র কিছু সময় সময় পর থেকেই। নিউ গিনি হাইল্যান্ডাররা বহু শত গোত্রে বিভক্ত ছিল, যারা পারস্পরিকভাবে অবোধ্য ভাষায় কথা বলে। এবং তারা অন্য গোত্রের সদস্যদের প্রতি বৈরী। !কুঙদের মতোই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল এমনকি একই গোত্রের প্রতিবেশী দল আর উপদলগুলো, যারা স্বগোত্রীয় হলেও আত্মীয়তার গোষ্ঠী হিসাবে ভিন্ন। কিছু এলাকায়, পুরুষরা যারা ভিন্ন আত্মীয় গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ভুল করে প্রবেশ করে, তাদের প্রাণ হারাবার ঝুঁকি আছে। এই ভয়ঙ্কর নিয়তি থেকে তাকে বাঁচাতে পারে শুধুমাত্র কথোপকথন, যেখানে তারা তাদের মধ্যে কোনো সাধারণ পরিচিত আত্মীয় আছে কিনা সেটি অনুসন্ধান করে দেখে। যদি তারা তাদের একজন সাধারণ আত্মীয়কে খুঁজে বের করতে পারে, শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে

তারা বন্ধুর মতোই পরস্পরের বিদায় নেয়। যদি তা না হয়, তাহলে যুদ্ধ, সাধারণত যা আমৃত্যু হবার সম্ভাবনাই বেশি।

আত্মীয়তা ছাড়াও আরো একটি উপায় আছে যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক নির্বাচন 'ভালোত্ব' গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে, যে ভালোত্ব হয়তো আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর এ তত্ত্বটিকে বলে 'রেসিপ্রকাল আলট্রুইজম' বা পারস্পরিক পরার্থবাদ। আজ যদি আমি আপনার সাথে ভালো একটি কাজ করি, সম্ভাবনা আছে যে কাল হয়তো আপনি আমার জন্য ভালো কিছু করবেন। এবং শর্তটি উল্টে দিলেও এটি সত্য। এটি হচ্ছে 'রেসিপ্রকেশন' বা 'পারস্পরিক বিনিময়'। এবং 'পরার্থবাদ', হচ্ছে 'ভালো' আচরণ করা বোঝানোর জন্যে আরেকটি শব্দ। সুতরাং 'পারস্পরিক পরার্থবাদ' হচ্ছে যে আপনার সাথে ভালো আচরণ করছে তার সাথেও পাল্টা ভালো আচরণ করা।

পারস্পরিক পরার্থবাদের জন্য কোনো সজ্ঞান সচেতনতার প্রয়োজন নেই। প্রাকৃতিক নির্বাচন সেই জিনগুলোকে সহায়তা করতে যারে যা পারস্পরিক পরার্থবাদ প্রদর্শন করতে নির্দেশনা দেয় এমন মস্তিষ্ক গড়ে তোলে , এমনকি যখন তারা সজ্ঞানে বিষয়টি অনুধাবন করছেন না। বিজ্ঞানী জেরাল্ড উইলকিনসন 'ভ্যাম্পায়ার' বাদুড়দের নিয়ে চমৎকার একটি পরীক্ষা করেছিলেন। এই বাদুড়গুলো বড় আকারের প্রাণীর শরীর থেকে রক্ত পান করে, যেমন গরু। তারা সারাদিন গুহার অন্ধকারে বসে বিশ্রাম নেয়, রাতের বেলায় তারা তাদের খাদ্য রক্তের জন্য শিকারে বের হয়। আর রক্ত পান করার মত বড় শিকার পাওয়াও বেশ কঠিন। কিন্তু যদি একটি বাদুড় এমন কোনো শিকার খুঁজে পায় যার অনেক রক্ত আছে। এত বেশি পরিমানে যে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়টি প্রচুর পরিমানে রক্ত পান করে, এবং তারপর পেটের মধ্যে বাড়তি পরিমান রক্ত নিয়ে তাদের দিনের আশ্রয় সেই গুহায় ফিরে আসে । কিন্তু যে বাদুড়টি রক্ত পান করার জন্য শিকার খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে, তার অভুক্ত মারা যাবার বেশ সম্ভাবনা আছে। ছোটো আকারের বাদুড়গুলো আমাদের চেয়েও সেই বিপজ্জনক প্রান্তসীমায় অবস্থান করে যেখানে তাদের অভুক্ত হয়ে মারা যাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। উলকিনসন বিশ্বাসযোগ্যভাবে সেটি প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন।

রাতের শিকার শেষে বাদুড়রা যখন গুহায় ফিরে আসে, তাদের মধ্যে কিছু বাদুড় শিকার না পেয়ে অভুক্ত থাকে। আর কেউ কেউ বাড়তি রক্ত তাদের পাকস্থলীতে বহন করে আনে। ক্ষুধার্ত বাদুড়গুলো এ সব অতি পরিমান রক্ত পান এবং পেটের মধ্যে বাড়তি রক্ত বহন করে আনা বাদুড়গুলোর কাছে রক্ত ভিক্ষা করে, ক্ষুধার্ত বাদুড়দের খাওয়াতে যারা বমির মাধ্যমে কিছু রক্ত তাদের পেট থেকে

বের করে আনে। পরের দিন এই দেয়া নেয়ার ভূমিকাটা উলটে যেতে পারে। আগের রাতে রক্ত খুঁজে পাওয়া ভাগ্যবানরা হয়তো এ রাতে না খেয়ে থাকে, এবং যারা গতকাল অভুক্ত ছিল আজ তারা পেটে বাড়তি রক্ত বহন করছে। সুতরাং তাত্ত্বিকভাবে, প্রতিটি বাদুড় একটি ভালো শিকারের রাতের পর উদারতা প্রদর্শন করার মাধ্যমে সুবিধা পেতে পারে, খারাপ শিকারের একটি রাতে তাদের ঋণ পরিশোধ হবার প্রত্যাশায়।

এরপর উইলকিনসন একটি বুদ্ধিদীপ্ত পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি বন্দী বাদুড়দের নিয়ে কাজ করেছিলেন, যাদের দুটি ভিন্ন গুহা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। একই গুহার বাদুড়গুলো পরস্পরের পরিচিত কিন্তু অন্য গুহার বাদুড়রা পরস্পর অপরিচিত। উইলকিনসন পরীক্ষামূলকভাবে পালাক্রমে একটি করে বাদুড়কে অভুক্ত রেখেছিলেন, এরপর তাদেরকে অন্য বাদুড়ের সাথে রেখেছিলেন দেখতে তাদের কেউ তাকে খাওয়া দেয় কিনা। কখনো তিনি তাদের পরিচিত একই গুহার বন্ধুদের সাথে রেখেছিলেন, অন্য সময় পরীক্ষাধীন বাদুড়কে তিনি ভিন্ন গুহার বাসিন্দার সাথে রেখেছিলেন। এবং প্রতিবারটি একই ধরনের ফলাফল পেয়েছিলেন তিনি: যদি তারা আগে থেকেই অভুক্ত বাদুড়টিকে চেনে, হ্যাঁ, তাহলে তারা তাকে খাইয়েছিল - আর যদি সে 'ভুল' গুহার বাসিন্দা হয় - তাহলে তারা সেই বাদুড়টিকে কোনো খাদ্য দেয় না। অবশ্যই, একই গুহার বাদুড়রা জিনগতভাবে পরস্পরের আত্মীয় হতে পারে। উলকিনসন এবং তার এক সহযোগীর পরবর্তী গবেষণা প্রদর্শন করেছিল যে, পারস্পরিক পরার্থবাদ - উপকারের প্রতিদান দেয়া - এই ক্ষেত্রে আত্মীয়তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

উইলকিনসনের গবেষণার ফলাফল সম্ভবত আপনার কাছে পুরোপুরিভাবে বোধগম্য। কারণ আপনি হচ্ছেন মানুষ, আর এভাবে মানুষ প্রায়শই আচরণ করে। কে আমাদের উপকার করেছে সে বিষয়ে আমাদের শক্তিশালী একটি বোধ আছে। এবং আমরা জানি আমরা কার উপকার করেছি। আমরা এর প্রতিদান প্রত্যাশা করি। আমরা ঋণ পরিশোধ করার একটি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, এবং সেটি করতে ব্যর্থ হলে অপরাধবোধে আক্রান্ত হই। এবং আমরা ক্ষুব্ধ হই, বিশ্বাসভঙ্গের অনুভতি দ্বারা আক্রান্ত হই, যদি কেউ ঋণ বা কোনো একটি উপকারের প্রতিদান দিতে ব্যর্থ হয়।

এবার বহু দিন আগে আমাদের পূর্বসূরি অতীতের কথা চিন্তা করুন। নিজেকে এমন কারো অবস্থানে ভাবুন যে কিনা ঐসব ছোটো গ্রাম অথবা দলগুলোর একটির সদস্য। সেখানে আপনি শুধু সবাইকে চিনবেনই না, নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে কী ধরনের ঋণ আর দায়িত্ব-কর্তব্য আছে সেটিও স্মরণ করতে

পারবেন। এছাড়াও হয়তো জানবেন যে, বাকি জীবন আপনি এই একই গ্রামেই কাটাবেন। গ্রামের প্রত্যেকেই ভবিষ্যত অভিমুখে সুদীর্ঘ সময় ধরে সম্ভাব্য উপকার-অনুগ্রহ প্রদানকারী। 'সবার সাথে ভালো আচরণ করো, অন্ততপক্ষে প্রথমবার অথবা ততক্ষণ অবধি, যখন তাদের বিশ্বাস করার জন্য তোমার কাছে কোনো ভালো কারণ থাকবে না' মস্তিষ্কের এ নিয়মটি খুব সম্ভবত প্রাকৃতিক নির্বাচনই গড়ে দিয়েছে। আপনি কখনোই জানতে পারবেন না যে, কখন আপনার সে উপকারের প্রতিদান দরকার হতে পারে এবং খুবই সম্ভাব্য যে, আমাদের বর্তমান মস্তিষ্ক পূর্বসূরিদের মস্তিষ্কের একই নিয়ম উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। এমনকি যদিও আমরা এখন বড় শহরে বাস করি, যেখানে আমরা এমন মানুষগুলোর সান্নিধ্যে আসতে থাকি যাদের আমরা আর কখনো দেখা পাবো না, তারপরও আমরা এখনো মস্তিষ্কের সেই নিয়মটি বহন করছি: 'কোনো ভালো কারণ যদি না থাকে তাহলে সবার সাথে ভালোভাবে আচরণ করো'।

পারস্পরিক পরার্থবাদে, উপকার বা সহায়তা বিনিময়ের ধারণাটি সব ধরনের বাণিজ্যেরই মূলে অবস্থান করছে। ইদানীং, আমাদের মধ্যে অল্প কিছু মানুষই নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করে থাকেন, নিজেদের কাপড় বোনেন, নিজেদের মাংসপেশীর শক্তি ব্যবহার করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যান। আমাদের খাদ্য এখন এমন কোনো খামার থেকে আসে যা পৃথিবীর আরেক প্রান্তে অবস্থিত হতে পারে। আমাদের পরনের কাপড়গুলো এখন কিনতে হয়, গাড়ি বা সাইকেল ব্যবহার করে আমরা যাতায়াত করি, অথচ এই যানবাহনগুলো কীভাবে বানাতে হয় তার সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমরা ট্রেইন বা প্লেনে উঠি যা বহু শত ভিন্ন মানুষদের শ্রমে কোনো কারখানায় তৈরি হয়েছে - তাদের কেউই সম্ভবত জানেন না কীভাবে এটি একত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সব জিনিসের বিনিময় মূল্য হিসাবে আমরা টাকা দেই। আর আমরা সেই টাকা উপার্জন করেছি আমরা যা করতে 'পারি' তা করার মাধ্যমে। আমার ক্ষেত্রে বই লেখা আর বক্তৃতা দেয়া, একজন চিকিৎসকের ক্ষেত্রে রোগীর রোগ নিরাময় করা, কোনো আইনজীবির ক্ষেত্রে আদালতে মামলা লড়াই করা, কোনো গ্যারেজ মিস্ত্রির জন্য গাড়ি ঠিক করা।

আমাদের অধিকাংশের জন্যই বেঁচে থাকার কাজটি খুব কঠিন হয়ে যাবে যদি দশ হাজার আগে পূর্বসূরিদের সেই সময়ে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অতীতের সে সময়ে অধিকাংশ মানুষ নিজেরাই নিজেদের খাদ্য চাষাবাদ কিংবা খুঁজে, শিকার অথবা মাটির খুড়ে সংগ্রহ করতো। প্রস্তর যুগে সম্ভবত প্রত্যেকেই নিজেই নিজের বর্শা তৈরি করতো। কিন্তু তখন এমন দক্ষ কেউ হয়তো ছিল যে

কিনা চকমকি পাথর ঘষে ধারালো বর্শার ফলা বানাতে পারতো। একই সাথে সেখানে শিকারে খুব দক্ষ এমন শিকারীও ছিল, যারা খুব শক্তিসহ দ্রুত আর নির্ভুল বর্শা নিক্ষেপ করতে পারতো, কিন্তু তারা হয়তো ধারালো বর্শা নির্মাণ করতে অদক্ষ ছিল। আর এমন পরিস্থিতিতে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়ের স্বাভাবিক আর কী হতে পারে? তুমি আমাকে ধারালো বর্শা বানিয়ে দাও, এর বিনিময়ে তোমাকে এটি ব্যবহার করে পাওয়া শিকারের মাংস দেবো।

পরবর্তীতে ব্রোঞ্জ যুগে এবং তারপর লৌহ যুগে, বিশেষজ্ঞ কারিগররা মাংসের বিনিময়ে ধাতুর বর্শা বানাতো। বিশেষজ্ঞ কৃষকরা কারিগররা শস্য বপন করার জন্য প্রয়োজনীয় যে মাটি খোড়ার যন্ত্রগুলো তাদের তৈরি করে দিত , তার বিনিময় মূল্য হিসাবে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত শস্য বিনিময় মূল্য হিসাবে দিত। আরো পরে, বিনিময় পরোক্ষ একটি উপায়ে পরিণত হয়েছিল। 'যদি শিকার করার যন্ত্র বানিয়ে দাও তাহলে আমি তোমাকে শিকারের মাংস দেবো' এমন প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে মানুষ 'টাকা' অথবা এর সমতূল্য জিনিস বিনিময় করতে প্রস্তাব করেছিল, যেমন একটি লিখিত ঋণপত্র, একটি স্মারক হিসাবে যে ভবিষ্যতে এই ঋণটি পরিশোধ করা হবে।

ইদানীং সরাসরি 'বার্টার' বা কিছুর বিনিময়ে কিছু যেখানে টাকা বিনিময় হয় না খুবই দুর্লভ। এটি এমনকি বহু জায়গায় অবৈধ কারণ এটির উপর কোনো কর আরোপ করা যায় না। কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে বিভিন্ন দক্ষতার মানুষদের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা। এবং মস্তিষ্কের নিয়মটি 'যখন সন্দিহান, ভালো আচরণ করো' এখনো আমাদের মস্তিষ্কে আছে আরো প্রাচীন সহযোগী নিয়মগুলোর সাথে, যেমন 'সন্দিহান হবার জন্যে প্রস্তুত থাকো, যদি না তুমি একটি বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলে না থাকো'।

সুতরাং ভালো, পরার্থবাদী, উপকারে সহযোগিতাপূর্ণ হবার জন্য আসলেই কিছু ডারউইনিয় চাপ আছে, যা আমাদের ভালো আর মন্দের ধারণা আর বোধের মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি পরবর্তীতে এই বোধগুলো আসলেই নিমজ্জিত হয় নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেভাবে আমরা আলোচনা করেছিলাম। আর এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই পঞ্চম অধ্যায়ের উপসংহারটিকে বদলে দেয় না: 'ভালো' হবার জন্য আমাদের ঈশ্বরের দরকার নেই।

১২ বিজ্ঞান থেকে সাহস নেয়া

জীবন্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য আর জটিলতা যে কোনো 'ডিজাইনার' বা সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই সৃষ্টি হতে পারে এমন ধারণা ডারউইন আসার আগে প্রায় সবার কাছেই অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। এমনকি এমন কোনো সম্ভাবনা নিয়ে ভাবার জন্য সাহসের প্রয়োজন ছিল। ডারউইনের সেই সাহস ছিল, এবং আমরা এখন জানি যে, তিনি সঠিক ছিলেন। এখনো বিজ্ঞানে অনেক অমীমাংসিত সমস্যা আছে - আমরা যতদূর বুঝতে পেরেছি তার মধ্যে কিছু শূন্যস্থান এখনো বিদ্যমান। এবং দৃশ্যপটে ডারউইন আসার আগে জীবন সম্বন্ধে যা বলা হতো সেই ধরনের কিছু বলার জন্য কিছু মানুষ এখনো প্রলুব্ধ হন। 'কীভাবে বিবর্তনীয় পদ্ধতিটি শুরু হয়েছিল একেবারে প্রথমে আমরা এখনো সেটি বুঝতে পারিনি, সুতরাং নিশ্চয়ই ঈশ্বর এটির সূচনা করেছিলেন'। 'কেউ জানে না কীভাবে এ মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে, সুতরাং নিশ্চয় ঈশ্বর এটি তৈরি করেছিলেন'। 'আমরা জানি না পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রগুলো কোথা থেকে এসেছে, সুতরাং নিশ্চয়ই ঈশ্বর সেগুলো সৃষ্টি করেছিলেন'। আমাদের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে যেখানেই কোনো শূন্যস্থান আছে, মানুষ ঈশ্বরকে দিয়ে সেই শূন্যস্থানটি পুরণ করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু শূন্যস্থানগুলো নিয়ে একটি সমস্যা হচ্ছে যে, বিজ্ঞানের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করার বিরক্তিকর একটি অভ্যাস আছে। ডারউইন সবচেয়ে বড় শূন্যস্থানটি পূরণ করেছিলেন। আর আমাদের সবারই প্রত্যাশা করার সাহস থাকা উচিত, একসময় বিজ্ঞান অবশিষ্ট শূন্যস্থানগুলোও পূরণ করবে। আর শেষ অধ্যায়ের মূল ভাবনা হচ্ছে সেটাই।

সব জীবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এমন ধারণা এক সময় খুব সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান (কমন সেন্স) হিসাবে বিবেচিত হত। ডারউইন এই বিশেষ জ্ঞানটিকে বিস্ফোরিত করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত সরল কিছু উদাহরণ দিয়ে শুরু করে পরে আরো গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে এই অধ্যায়টি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের উপর আমাদের আত্মবিশ্বাসের অবমূল্যায়ন করেই শুরু হচ্ছে। প্রতিটি উদাহরণই শেষ হবে পৌনঃপুনিকভাবে একটি বাক্যাংশ ফিরে আসার মাধ্যমে, 'আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বের সাথে (সিরিয়াসলি) কথাটি বলছেন না!' (বা ইউ ক্যাননট বি সিরিয়াস, এটি মহান লন টেনিস খেলোয়াড় জন ম্যাকেনরো'র একটি স্মরণীয় উদ্ধৃতি, যিনি প্রায়শই এই বাক্যটি ব্যবহার করতেন আম্পায়ারদের লাইনের উপর বল পড়া সংক্রান্ত সন্দেহজনক সিদ্ধান্তগুলোকে প্রশ্ন করতে)। তারপর আমরা আরো বৃহত্তর উদাহরণে ফিরে আসবো: আপাতদৃষ্টিতে সেই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান, যা দাবী করছে যে, এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং অন্য এযাবৎ অমীমাংসিত সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য অবশ্যই একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকতে হবে।

২০১৪ সালে, যুক্তরাষ্ট্রে ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল, একজন কিশোর খাবার পানির একটি জলাধারের মধ্যে মূত্রত্যাগ করছে। সেই কারণে স্থানীয় পানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ পুরো জলাধারটি থেকে পানি বের করে দিয়ে এটিকে পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ জন্যে তাদের খরচ হয়েছিল প্রায় ৩৬০০০ ডলার। আর যে পরিমান পানি জলাধার থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল তার পরিমান ছিল প্রায় ১৪০ মিলিয়ন লিটার। প্রস্রাবের পরিমান হয়তো ছিল এক লিটারের এক-দশমাংশ। সুতরাং সেই জলাধারে পানি আর প্রস্রাবের অনুপাত ছিল প্রায় প্রতি এক বিলিয়ন অংশে এক ভাগ।এছাড়াও সেই জলাধারের মধ্য মরা পাখির অবশেষ আর অন্য ধরনের ময়লাও ছিল, স্পষ্টতই সবার নজর এড়িয়ে বহু প্রাণীও সেখানে প্রস্রাব করেছিল। কিন্তু এত বেশি সংখ্যক মানুষ এতটাই অরুচি আর বিরাগ অনুভব করেছিলেন যে, 'জানা আছে' এমন একটি মাত্র মানুষ সেখানে প্রস্রাব করেছে এমন তথ্যই জলাধারটিকে পানি শূন্য করে পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এটি কী যুক্তিসঙ্গত কোনো কাজ ছিল? আপনি কী করতেন যদি আপনি এই জলাধারের দায়িত্বে থাকতেন?

যখনই আপনি এক গ্লাস পানি পান করবেন, খুবই উচ্চ সম্ভাবনা আছে যে, আপনি অন্তত একটি অণু পান করবেন যা জুলিয়াস সিজারের মূত্রথলির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল।

আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বের সাথে এটি বলছেন না ! কিন্তু এটি সত্য।

আর যুক্তিটি হচ্ছে এরকম। বাষ্পীভবন, বৃষ্টি, নদী ইত্যাদির মাধ্যমে পৃথিবীর সব পানি বিরতিহীনভাবে রিসাইকেল বা পুনর্ব্যবহৃত হচ্ছে। যে-কোনো একটি সময়ে অধিকাংশ পানি থাকে সাগরে এবং কালক্রমে সমুদ্রের মাধ্যমে পৃথিবীর বাকি পানি সঞ্চালিত হতে থাকে। এক গ্লাস পানিতে পানির অণুর সংখ্যা প্রায় ১০ ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন। আর এই পৃথিবীতে মোট পানির পরিমান প্রায় ১.৪ বিলিয়ন ঘন কিলোমিটার, যা 'শুধুমাত্র' প্রায় ৪ ট্রিলিয়ন পূর্ণ গ্লাসের সমান। আমি 'শুধুমাত্র' বলেছি কারণ ৪ ট্রিলিয়ন একটি পূর্ণ গ্লাসে থাকা ১০ ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন অণুর তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র একটি সংখ্যা। সুতরাং পৃথিবীতে সম্ভাব্য পূর্ণ গ্লাসের সংখ্যার চেয়ে প্রতিটি পূর্ণ গ্লাসে ট্রিলিয়ন গুণ বেশি সংখ্যক পানির অণু আছে।

আর সেকারণে বেশ নিরাপদভাবেই এটি বলা যেতে পারে যে, আপনি জুলিয়াস সিজারের প্রস্রাবের কিছু অংশ পান করেছেন। অবশ্যই এখানে জুলিয়াস সিজার 'বিশেষ' কেউ নন, তার প্রস্রাবেরও কোনো বিশেষত্ব নেই। আপনি একই কথা বলতে পারেন তার বন্ধু ক্লিওপ্যাট্রা অথবা যিশু সম্বন্ধেও। অথবা যে কেউই,

শুধুমাত্র রিসাইকেল বা পুনর্ব্যবহৃত হবার পক্রিয়াটি ঘটার জন্য যথেষ্ট পরিমান সময় হাতে থাকতে হবে। যা একটি পূর্ণ গ্লাসের জন্য সত্য সেটি একটি জলাধারের জন্য বহু গুণে সত্য। যুক্তরাষ্ট্রের সেই জলাধার শুধু সেই কিশোরের প্রস্রাবই শুধু ধারণ করে নেই, যে কিনা ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল, সেখানে আরো বহু মিলিয়ন মানুষের প্রস্রাব আছে, যার মধ্য অন্তর্ভুক্ত আট্টিলা দ্য হান এবং উইলিয়াম দ্য কনকেরর, এবং খুব সম্ভবত আপনিও।

বাতাসও পানির মত একই ভাবে পুনর্ব্যবহৃত হয়, শুধুমাত্র আরো দ্রুতগতিতে, এবং একই ধরনের হিসাব নিকাশ এখানেও প্রযোজ্য। পৃথিবীতে বিদ্যমান ফুসফসের সংখ্যার চেয়ে একটি ফুসফুসে বাতাসের অণুর সংখ্যা বহু গুণে বেশি । আপনি প্রায় নিশ্চিতভাবে কিছু অণু শ্বাস নিয়েছেন যা অ্যাডলফ হিটলারের প্রশ্বাসের সাথে বের হয়েছে। এবং হিটলারের ব্যক্তিগত সচিব আমাদের জানিয়েছিলেন তার মুখে বাজে গন্ধ ছিল।

বিজ্ঞান খুবই বিস্ময়কর হতে পারে। আমরা সেই সাহস নিয়ে কথা বলছিলাম, এই ধরনের বিস্ময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য যা আপনার প্রয়োজন। সেই সাহস যা অমীমাংসিত রহস্যগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত।

টি. এইচ. হাক্সলি (ডারউইনের বন্ধু এবং প্রথম অধ্যায়ে যার সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল) বলেছিলেন, ‘বিজ্ঞান প্রশিক্ষিত আর সুবিন্যস্ত সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়’। কিন্তু আমি ঠিক নিশ্চিত নই তিনি এক্ষেত্রে সঠিক কিনা। এই অধ্যায়ে যে গল্পগুলো আমি বলতে যাচ্ছি সেগুলো স্পষ্টতই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করে। গ্যালিলিও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করেছিলেন যখন তিনি দেখিয়েছিলেন, বাতাসের প্রতিরোধ ছাড়া (আপনাকে এই পরীক্ষাটি শূন্যস্থানে করতে হবে) একটি কামানের গোলা আর একটি পালককে যদি এক সাথে উপর থেকে ফেলা হয়, একই মুহূর্তে সেগুলো মাটি স্পর্শ করবে।

আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বের সাথে এটি বলছেন না, গ্যালিলিও! কিন্তু এটি সত্য।

আর গ্যালিলিও সঠিক এই কারণে। আইজাক নিউটনে প্রস্তাবনা অনুযায়ী মহাকর্ষীয় বল দ্বারা এই মহাবিশ্বে প্রতিটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আর এই আকর্ষণের শক্তি বস্তু দুটির ভরের (আপাতত এই মুহূর্তে ভরকে বরং ওজনের মত কিছু ভাবুন - যদিও একটি পার্থক্য আছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেই পার্থক্য নিয়ে আমরা আলোচনা করবো) গুণফলের সমানুপাতিক। কামানের গোলা পালকের চেয়ে অনেক বেশি ভারী, সুতরাং মাধ্যাকর্ষণ (বা অভিকর্ষ) এর ওপর বেশি শক্তিশালী বল প্রয়োগ করবে। কিন্তু কামানের গোলার পালকের

চেয়ে বেশি পরিমান শক্তির দরকার হবে একই গতির ত্বরণ অর্জন করতে। এই দুটি শক্তি পরস্পরকে ঠিক বাতিল করে দেয়, আর ফলাফল হচ্ছে পালক আর কামানের গোলাটি একই সাথে মাটিতে পড়ে।

আমি বলেছিলাম, কেন ভর আর ওজন এক নয় সে বিষয়টি আমি স্পষ্ট করবো । আমাদের এ গ্রহে, কোনো একটি বস্তুর 'ভর', যেমন কোনো একজন ব্যক্তি, এর ওজনের সমান, ধরুন ৭৫ কিলোগ্রাম। কিন্তু একটি মহাশূন্য স্টেশনে, মানুষের কোনো 'ওজন' নেই, তার ওজন হচ্ছে শূন্য, কিন্তু তার ভর কিন্তু তখনও ৭৫ কিলোগ্রাম। মহাশূন্য স্টেশনের একটি কামানের গোলা বেলুনের মতোই ভাসবে, কিন্তু আপনি যদি এটিকে কেবিনের অন্য দিকে ছুড়ে মারতে চান, তাহলে বুঝতে পারবেন এর যথেষ্ট ভরের কারণে কাজটি করতে আপনাকে বেশ পরিশ্রম করতে হবে। আপনি যখন এটিকে শক্তি দিয়ে সামনের দিকে ধাক্কা দেবেন, যদি না আপনার পেছনে ভারসাম্য রাখার জন্য কোনো দেয়াল থাকে, আপনি একই সাথে কামানের গোলার বিপরীত দিক বরাবর নিজেকে একটি ধাক্কা দেবেন। যা আসলেই একটি বেলুনের মত নয়। যখন কামানোর গোলাটি কেবিনের অন্য দিকের দেয়ালের সাথে ধাক্কা খাবে, বেশ জোরেই একটি সংঘর্ষ হবে, এবং হয়তো কিছু এটি ভেঙ্গে ফেলতে পারে। যদি এটি কারো মাথায় গিয়ে আঘাত করে এটি বেশ ব্যথার কারণ হবে (আবারো, এটি বেলুনের মত নয়) এমনকি যদিও কামানের গোলা আর মাথা দুটোরই ওজন সেখানে শূন্য। একটি কামানের গোলার ওজন হচ্ছে এই গোলাটির ওপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের নিম্নমূখী টানের পরিমাপ। (মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ বলের কারণে ভূপৃষ্ঠের উপরস্থ সকল বস্তু ভূকেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ভরসম্পন্ন বস্তুসমূহে ওজন অনুভূত হয়। একটি বস্তুর ভর যত বেশি হয়, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে তার ওজনও তত বেশি)। আর এটির ভর হচ্ছে সেই বস্তুর সমষ্টি যা এটি ধারণ করে। আপনি যদি কোনো মহাশূন্য স্টেশনে একটি কামানের গোলা ওজন করেন, ওজন মাপার মেশিন আর কামানের গোলা দুটোই স্বাধীনভাবে ভাসবে, সুতরাং কামানের গোলা ওজন মাপার যন্ত্রের উপর কোনো চাপই প্রয়োগ করবে না। এর ওজন হবে শূন্য।

একই জিনিস ঘটবে যদি আপনি কোনো ওজন মাপার যন্ত্রের উপর বসে একটি প্লেন থেকে নীচে লাফিয়ে পড়েন। আপনি এবং ওজন মাপার যন্ত্রটি একই গতিতে নীচে পড়তে থাকবে। সুতরাং আবারো, আপনি ওজন মাপার যন্ত্রটির উপর কোনো চাপ দিতে পারবেন না এবং সেটি আপনার ওজন 'শূন্য' হিসাবে

প্রদর্শন করবে। আপনি যখন উপর থেকে নীচের দিকে পড়ছেন তখন আপনার ওজন শূন্য, কিন্তু আপনার ভর একই থাকছে।

এটি আপনাকে ধারণা দিয়েছে যে, কেন কামানের গোলা (এবং মানুষ আর ওজন মাপার যন্ত্র) কোনো মহাশূন্য স্টেশনে ওজনহীন ভেসে বেড়ায়। অনেকেই ভাবেন এর কারণ তারা পৃথিবী থেকে বহু দূরে আর সেকারণে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের আকর্ষণের আওতার বাইরে অবস্থান করছে। কিন্তু পুরোপুরিভাবে সেটি ভুল। এটি খুব সাধারণ একটি ভুল। আসলেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান সমূদ্র পৃষ্ঠে যত শক্তিশালী হয়, প্রায় সেই পরিমানেই থাকে, কারণ মহাশূন্য স্টেশনটি পৃথিবী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কোনো মহাশূন্য স্টেশনে কোনো বস্তুর ওজনহীন কারণ - ওজন মাপার যন্ত্রের উপর বসে প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়া সেই ব্যক্তির মত - এখানেও বস্তুগুলো নিরন্তরভাবে 'নীচে পড়ছে', এই ক্ষেত্রে পৃথিবীর চারপাশে, চাঁদও পৃথিবীর চারপাশে বিরতিহীনভাবে পড়ছে। চাঁদের ওজন নেই কিন্তু এর ভর ১০ হাজার বিলিয়ন বিলিয়ন কিলোগ্রাম।

'চাঁদের ওজন নেই আর এটি পৃথিবীর চারপাশে বিরামহীন নীচে পড়ছে'?

আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বের সাথে এটি বলছেন না ! কিন্তু এটি সত্য।

আমাদের গ্রহটিকে আমরা বহু উপত্যকা দিয়ে গর্ত আর পর্বতমালা দিয়ে খচিত অমসৃণ এবড়ো থেবড়ো একটি গোলক হিসাবে ভাবি। আর যা-ই হোক, মাউন্ট এভারেস্টই প্রায় ৯ কিলোমিটার উঁচু এবং প্রথম দুজন মানুষ যারা এর চুড়ায় উঠেছিলেন তাদেরকে এই অর্জনের জন্যে বীরের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যদি আপনি পৃথিবীর আকারটিকে একটি পিংপং বলের সমান সংকুচিত করে আনেন, তাহলে এর পৃষ্ঠটা সবদিকেই মসৃণ মনে হবে, এমনকি মাউন্ট এভারেস্টও আপনার স্পর্শানুভূতিতে ধরা দেবে না: খুব সুক্ষ্ম স্যাণ্ড পেপারের এক টুকরো বালির মত ক্ষুদ্র হবে।

আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বের সাথে এটি বলছেন না ! কিন্তু এটি সত্য।

আপনি নিজেই এই হিসাবটি করতে পারবেন। একটি পিংপং বলের মাপ নিন, আপনি এভারেস্টের উচ্চতা জানেন, এরপর পৃথিবী ব্যাস কত দেখুন, এবার অংক কষে সমাধান করে দেখুন।

গ্রহরা কেন গোলাকৃতির হয়? মাধ্যাকর্ষণীয় বল এটিকে সবদিক থেকে ভিতর অভিমূখে টানে। এমনকি শক্ত ভূমিও তরলের মত আচরণ করে, যদি যথেষ্ট সময় দেয়া হয়। ক্ষুদ্রতর বস্তু, যেমন, ধূমকেতুগুলো গোলাকৃতির নয় বরং

এবড়ো-থেবড়ো এবং বেঢপ আকারের হয়ে থাকে। এর কারণ কোনো আকৃতিতে টেনে ধরে রাখার জন্য এর মাধ্যাকর্ষণ খুবই দুর্বল। গোলাকৃতির হবার জন্যে প্লেটো আকারে যথেষ্ট বড়। তবে বেশ কিছু পরিচিত 'প্লানেটেসিমাল' বা গ্রহাণুর চেয়ে এটি আকারে ছোটো, আর সেকারণে প্লুটোকে গ্রহের মর্যাদা থেকে পদাবনতি করা হয়েছে। আর এটি বহু মানুষকে হতাশ করেছে। কিন্তু এটি শুধুমাত্র সংজ্ঞার একটি ব্যাপার: সেমানটিকস বা শব্দার্থগত একটি বিষয়। মার্স বা মঙ্গল গ্রহ, পৃথিবী থেকে আকারে ছোটো হবার কারণে এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সুতরাং কম পরিমান শক্তি এর পর্বতগুলোকে ভিতরের দিকে টেনে রাখে, আর সে কারণে মঙ্গলে) এভারেস্টের চেয়ে উঁচু পর্বত সৃষ্টি করতে পারে (এবং করেছে)। একটি পিংপং বলের আকারে মঙ্গল গ্রহটি স্পর্শানুভূতিতে পৃথিবীর তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রভাবে অমসৃণ মনে হবে, কিন্তু এর ক্ষুদ্র চাঁদগুলো, ফোবোস আর ডেইমস আসলেই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি এবড়ো থেবড়ো। এগুলো দেখতে আলুর মত।

অতীতে কোনো একটি সময়, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান হিসাবে অনুভূত হতো যে, পৃথিবী স্থির দাড়িয়ে আছে এবং সূর্য, চাঁদ আর নক্ষত্ররা এর চারপাশে ঘুরছে। এর চেয়ে স্বাভাবিক বিষয় আর কী হতে পারে? যে মাটিতে আপনি দাড়িয়ে আছেন, সেটি স্থির পাথরের মত অনড় অনুভূত হয়। প্রতিদিন সূর্য উপরে আকাশের দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে অভিমূখে যাচ্ছে, এবং যদি আপনি ধৈর্য ধরে তাদের পরিবর্তিত অবস্থানগুলো পর্যবেক্ষণ করেন, দেখবেন নক্ষত্ররাও একই কাজ করছে। গ্রিক গণিতজ্ঞ অ্যারিস্টার্কাস (৩১০ - ২৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। আর পৃথিবীর ঘূর্ণনই হচ্ছে কারণ যা আকাশে সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে যাচ্ছে আমাদের এমন একটি ধারণা দেয়। বহু শতাব্দীর জন্য এই সাহসী সত্যটা বিস্মরিত হয়েছিল, অবশেষে সেটি পুনরায় আবিষ্কার করেছিলেন পোল্যান্ডের নিকোলাউস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)। আর ধারণাটি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের এতই বিপরীত ছিল যে এটি সমর্থন করার কারণে গ্যালিলিওকে নির্যাতনের হুমকি দেয়া হয়েছিল।

<u>আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বের সাথে এটি বলছেন না, গ্যালিলিও ! আর যদি প্রত্যাহার না করেন, আমরা আপনাকে নির্যাতন করবো।</u>

যদি পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকান, আপনি লক্ষ করবেন যে আফ্রিকার পশ্চিম উপকুল আর দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল দেখলে মনে হয় যেন জিগস পাজলের টুকরোর মত এ দুটি পরস্পরের সাথে খাপ খাবে।১৯১২ সালে

জার্মান বিজ্ঞানী আলফ্রেড ভেগেনার এ পর্যবেক্ষণটি গুরুত্বেরে সাথে গ্রহন করার সাহস প্রদর্শন করেছিলেন এবং এর মানে কী হতে পারে সেটি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, পৃথিবীর মানচিত্র পরিবর্তিত হয়। তিনি বলেছিলেন, বিশাল একটি উপায়ে আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ দুটি আসলেই অতীতে কোনো একটি সময় পরস্পরের সাথে যুক্ত ছিল। তার জীবদ্দশায় সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন। কীভাবে মহাদেশের মত এত সুবিশাল কোনো কিছু কোনো মাঝ বরাবর বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি অর্ধাংশ তৈরি করবে - দক্ষিণ আমেরিকা আর আফ্রিকা, তারপর সমূদ্রে ভেসে বহু সহস্র মাইল দূরে সরে যাবে? কিন্তু আসলেই সেটি ঘটেছিল।

আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বের সাথে এটি বলছেন না ! কিন্তু এটি সত্য।

ভেগেনারের ধারণাটি সঠিক ছিল - তবে খানিকটা। প্রায় ১৩০ মিলিয়ন বছর আগ অবধি আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা সত্যিকারভাবেই পরস্পরের সাথে যুক্ত ছিল। তারপর এ দুটি মহাদেশীয় ভূখণ্ড ধীরে ধীরে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন আপনি চাইলে দুই ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী সংকীর্ণতম শূন্যস্থানটি লাফ দিয়ে পার হতে পারতেন। এর কিছু সময় পরে হয়তো আপনি সাতার কেটে পার হতে পারতেন। এখন সেই যাত্রায় এমনকি খুব দ্রুতগামী উড়োজাহাজেরও বহু ঘন্টা সময় লাগে। কেমন করে এটি ঘটেছিল সেটির ব্যাখ্যায় খুঁটিনাটি বিষয়গুলোয় ভেগেনার খানিকটা ভুল করেছিলেন। প্রমাণ এখন সন্দেহাতীত যে, পুরো পৃথিবীর পৃষ্ঠ বা ভূত্বকটি মূলত পরস্পরের সাথে যুক্ত এবং অধিক্রমণ করতে সক্ষম (একে অপরের দিকে চলাচল করতে সক্ষম) কতগুলো 'প্লেট' (বা পাত) দিয়ে তৈরি। এটি সেই বর্মের প্লেট বা পাতের মত। এগুলোকে 'টেকটোনিক প্লেট' বলা হয় (ভূত্বকীয় পাত) এবং এগুলো চলাচল করে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমানে ধীরে, আমাদের সংক্ষিপ্ত জীবদ্দশায় আমরা সেটি লক্ষ করতে পারি না। তাদের চলাচলের গতিকে নোখ বৃদ্ধি পাবার গতির হারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তবে নোখ বাড়ার মত এদের চলাচল মসৃণ নয়, আরো বেশি ঝাঁকুনীপূর্ণ অসমতল, বেশ কিছু সময় যা অনুভব করা সম্ভব নয়, তারপর হঠাৎ ভূকম্পনের মত একটি ঝাঁকুনি । আসলেই, এ ধরনের কম্পনই হচ্ছে ভূকম্পন।

টেকটোনিক প্লেট বা ভূত্বকীয় পাত শুধুমাত্র স্থলভূমি দিয়ে তৈরি নয়, প্লেটগুলোর বেশির ভাগ অংশই সমূদ্রের তলদেশে অবস্থান করে। মহাদেশগুলো হচ্ছে কেবল এসব প্লেটের উপর আরোহী উচ্চ স্থলভূমি। এই প্লেটগুলোই এর উপর আরোহী মহাদেশটি নিয়ে চলাচল করে। প্লেটগুলোর মধ্যে কোনো শূন্যস্থান নেই। যখন

তারা পরস্পরকে ধাক্কা দেয়, নানা কিছু ঘটতে পারে। যেমন ভূকম্পন । দুটি প্লেট হয়তো পরস্পরের পাশ দিয়ে একে অন্যে বিপরীত দিক বরাবর সরতে পারে (এটাই ঘটছে পশ্চিম-উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ভূমিকম্পপ্রবণ 'সান আন্দ্রিয়াস ফল্টে')। অথবা, একটি হয়তো পিছলে আরেকটির নীচে ঢুকে যেতে পারে, এই সাবডাকশন বা অধোগমন আন্দিজের মত সুবিশাল পর্বতমালাকে ধাক্কা দিয়ে উপরে তলে সৃষ্টি করতে পারে। অথবা হিমালয় পর্বতমালা, যার সৃষ্টি হয়েছিল যখন ভারতকে বহন করে আনা উত্তর দিক বরাবর গতিশীল বিশাল দ্বীপ সদৃশ প্লেটটি এশিয়ান প্লেটের নীচে জোর করে প্রবেশ করেছিল। প্লেট টেকটোনিকসের জন্য প্রমাণগুলো বিস্ময়কর এবং পুরোপুরিভাবে বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু আমি সেই বিষয়ে বিস্তারিত কোনো আলাপে এখানে যাবো না, কারণ আমি সেটি করেছিলাম 'দ্য ম্যাজিক অব রিয়েলিটি' বইটিতে। আমি শুধু বলতে চাই, এটি আসলেই খুব বিস্ময়কর আর খুব বেশি মাত্রায় সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বিরোধী।

এখন এত বেশি চমকে দেবার মত একটি উদাহরণ যে, এটি আসলেই ভীতিকর। অন্ততপক্ষে, আমি মনে করি এটি তাই। আপনি এবং যে চেয়ারে আপনি বসে আছেন (অথবা যে টেবিলে বসে আপনি খান, অথবা যে পাথরে আপনি হোচট খেয়ে আপনি আঙ্গুলে ব্যথা পেয়েছেন) সেগুলো প্রায় সম্পূর্ণভাবে শূন্যস্থান দিয়ে তৈরি।

<u>আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বের সাথে এটি বলছেন না ! কিন্তু এটি সত্য।</u>

সব পদার্থই পরমাণু দিয়ে তৈরি এবং প্রতিটি পরমাণু তৈরি হয় একটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস দিয়ে, যা ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে (ভালো শব্দের অভাবে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যদিও এটি খানিকটা বিভ্রান্তিকর) আরো অনেক ক্ষুদ্রতর একগুচ্ছ ইলেক্ট্রন। তাদের মধ্য শূন্যস্থান ছাড়া আর কিছু নেই। হীরা প্রবাদতুল্য কঠিন। আমরা অধ্যায় নয়ে যেমন দেখেছিলাম, একটি হীরা হচ্ছে খুব সুনির্দিষ্ট বিরতিতে সজ্জিত কার্বণ পরমাণুর স্ফটিক একটি জালিকা। আপনি যদি টেনিস বলের সমান স্ফীত হয়ে ওঠা একটি কার্বন নিউক্লিয়াস কল্পনা করেন, তাহলে এই হীরক জালিকায় এর সবচেয়ে নিকর্টবর্তী প্রতিবেশী টেনিস বলটি থাকবে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে। আর এদের মধ্যবর্তী স্থানটি শূন্যস্থান, ফাকা, কারণ ইলেক্ট্রন খুবই ক্ষুদ্রাকার, আর ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। আপনি যদি নিজের আকারটিকে সংকুচিত করতে পারেন সেই মাত্রায় যেখানে আপনি ঐসব বলগুলোর কোনো একটিকে আপনার ক্ষুদ্র র‍্যাকেট দিয়ে বাড়ি মারতে পারবেন, এ জালিকায় সবচেয়ে নিকটবর্তী টেনিস বলটির অবস্থান এত বেশি দূরে যে আপনি সেটি দেখতে পাবেন না।

আমার সহকর্মী স্টিভ গ্রান্ড তার ‘ক্রিয়েশন’ বইটিতে লিখেছিলেন:

> ‘আপনার শৈশবের কোনো অভিজ্ঞতার কথা ভাবুন। এমন কিছু যা আপনি স্পষ্টভাবেই মনে করতে পারেন, এমন কিছু যা আমি দেখতে পারবেন, অনুভব করতে পারবেন, এমনকি গন্ধও নিতে পারবেন, যে আসলেই আপনি সেখানে উপস্থিত আছেন। আর যা-ই হোক না কেন, আপনি আসলেই তো সেখানে এক সময় ছিলেন, ছিলেন না? এছাড়া কীভাবেই বা এসব মনে করতে পারলেন? কিন্তু এবার শুনুন আসল সত্যটি : আপনি সেখানে ছিলেন না। আজ আপনার শরীরে যে পরমাণুগুলো আছে তার একটি পরমাণুও তখন ছিল না যখন সেই ঘটনাটি ঘটেছিল’।

<u>আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বের সাথে এটি বলছেন না ! কিন্তু এটি সত্য।</u>

> ‘পদার্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সঞ্চালিত হয় এবং ক্ষণিকের জন্য সেগুলো একত্রিত হয়ে আপনাকে তৈরি করে। আর সেই কারণে আপনি যা-ই কিছু হোন না কেন, আপনি আর সেই উপাদানগুলো নন, যা দিয়ে আপনি তৈরি হয়েছিলেন। আর সেটি যদি আপনাকে প্রচন্ডভাবে শিহরিত করতে না পারে, আপনার ঘাড়ের লোমগুলো খাড়া করে তুলতে না পারে, তাহলে আবার পড়ে দেখুন যতক্ষণ না সেই বিস্ময়টি আপনি অনুভব করতে পারবেন, কারণ এটি গুরুত্বপূর্ণ’।

এর মানে কী তাহলে একজন মানুষ যাকে কিনা এই মাত্র গ্রেফতার করা হয়েছে ৩০ বছর আগে করা কোনো অপরাধে জন্যে, সে দোষী হবে না কারণ সে আর সেই একই ব্যক্তি নয়? আপনি কী বলবেন যদি আপনি জুরির একজন সদস্য হন, আর বাদিপক্ষের আইনজীবি এ যুক্তিটি উপস্থাপন করেন?

অন্য আরেকটি উদাহরণ আলোচনা করা যাক, যা আরো ভীতিকর। এটি আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বটি থেকে এসেছে। যদি একটি মহাকাশযানে চড়ে আলোর গতির প্রায় কাছাকাছি গতিতে আপনি যাত্রা শুরু করেন, এবং ফিরে আসেন যখন আপনার মহাকাশযানে থাকা ক্যালেন্ডার আপনাকে জানাচ্ছে আপনি পৃথিবী থেকে মাত্র ১২ মাস দূরে ছিলেন, আপনার বয়স মাত্র বাড়বে এক বছর, যখন কিনা পৃথিবীতে সে সময়ের মধ্যে আপনার সব বন্ধুরাই বৃদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। পৃথিবীর বয়স বেড়ে যাবে বহু শত বছর, কিন্তু আপনার বয়স বাড়ছে মাত্র এক বছর। মহাকাশযানের মধ্য সময় নিজেই, সেখানে থাকা সব ঘড়ি আর ক্যালেন্ডারসহ, সেই সাথে বয়স বাড়ার প্রক্রিয়া,

অন্তত পৃথিবীতে বাস করে এমন কোনো মানুষের তুলনায় মন্থর হয়ে যাবে। কিন্তু যারা মহাকাশযানে আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি ঘটবে না। মহাকাশযানে সবকিছুই পুরোপুরিভাবে স্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু পৃথিবীতে, লম্বা সাদা দাড়িসহ আপনার নিজের প্র-প্র-প্রপৌত্রের বয়স আপনার চেয়েও বেশি হতে পারে।

<u>নিশ্চয়ই আপনি গুরুত্বের সাথে এটি বলছেন না! কিন্তু এটি সত্য।</u>

এই অধ্যায়ের বার্তাটি হচ্ছে বিজ্ঞান নিয়মিতভাবে আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান আর ধারণাগুলোকে ওলটপালট করে দেয়। এটি এমন সব বিস্ময়ের মুখোমুখি করে যা আমাদের হতবুদ্ধিকর ধাঁধায় ফেলে দেয় এমনকি মর্মঘাতী হতে পারে। এবং কোনো উপসংহার বরাবর পরচালিত করা যুক্তিগুলো অনুসরণ করার জন্য আমাদের এক ধরনের সাহসের প্রয়োজন, এমনকি যখন সেই যুক্তি আমাদের এমন একটি উপসংহারের নিকটে নিয়ে যা আসলেই খুব বিস্ময়কর। আর সত্য বিস্ময়ের চেয়েও আরো অনেক বেশি কিছু হতে পারে, এটি এমনকি ভীতিকর হতে পারে। আমার নিজের কাছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের নির্ভেজাল অদ্ভুত বিষয়গুলোকে আসলেই খুব ভীতিকর মনে হয়। কিন্তু তারপরও কিছু অর্থে এটি অবশ্যই সত্য হতে হবে, কারণ পরীক্ষা কোয়ান্টাম তত্ত্বের গাণিতিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ইতোমধ্যেই সত্য প্রমাণ করেছে আর সেই নির্ভূলতা খুব সামান্য মাত্রার ভুল সহ উত্তর আমেরিকার প্রশস্ততা পূর্বধারণা করার সমতূল্য।

আর এই 'অদ্ভুত' ব্যাপারটি আসলে কী যা নিয়ে আমি কথা বলছি? এ বইয়ে ধারণা চূর্ণবিচূর্ণ করা অদ্ভুত পরীক্ষাগুলোর ফলাফল নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার কোনো সুযোগ নেই। আমি শুধু এসব কিছু পরীক্ষার অদ্ভুত ফলাফলগুলোর তথাকথিত 'কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন' উল্লেখ করবো। কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন বলে যে কিছু ঘটনা, কোয়ান্টাম ইভেন্টস, আসলে ঘটে না যতক্ষণ না সেটি ঘটেছে কিনা তা লক্ষ করার জন্য কেউ সেদিকে তাকান। এটি বোকার মত শোনায়, এবং এই ধারণাটি নিয়ে প্রহসন করেছিলেন অষ্ট্রীয় পদার্থবিদ এরউইন শ্রোডিংগার, কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা। শ্রোডিংগার এমন একটি বাক্সে বন্দী বিড়াল কল্পনা করেছিলেন, যেখানে হত্যা করার একটি বিশেষ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া যুক্ত করা আছে, যে প্রক্রিয়াটি সক্রিয় করে সেই ধরনের কোনো ঘটনা যাকে বলা হয় একটি কোয়ান্টাম ইভেন্ট। যতক্ষণ না আমরা বাক্সটি খুলছি, আমরা জানি না এর মধ্যে থাকা বিড়ালটি মৃত না বেঁচে আছে। কিন্তু নিশ্চয়ই বিড়ালটিকে হয় মৃত নয়তো জীবিত হতে হবে? অবশ্যই কী সেটাই হবার কথা নয়? কিন্তু 'কোপেনহেগেন' ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর উত্তর হচ্ছে না। কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যা নিয়ে ঠাট্টা

করেছিলেন শ্রোডিংগার, এই বিড়ালটি মৃতও না আর বেঁচেও নেই যতক্ষণ না আমরা সেই বাক্সটি খুলে ভিতরে দেখছি। স্পষ্টতই উদ্ভট ও অযৌক্তিক - এটাই শ্রোডিংগারের বক্তব্য ছিল। কিন্তু যত উদ্ভট হোক না কেন, এটাই মূলত কোপেনহেগেন ব্যাখ্যাটি যুক্তিসঙ্গত মনে করে। এবং কোপেনহেগেন ব্যাখ্যাটিকে সমর্থন করেছেন বহু বিখ্যাত পদার্থবিদ। একজন আমাকে সুন্দর একটি কার্টুন পাঠিয়েছিলেন। একটি পশু চিকিৎসকের চেম্বারের ওয়েটিং রুমে পোষা প্রাণীদের নিয়ে মালিকরা ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছেন, একজন নার্স বাইরে এসে অপেক্ষমান একজন ভদ্রলোককে বলছেন, 'আপনার বিড়ালটার ব্যাপারে, জনাব শ্রোডিংগার, আমার কাছে কিছু ভালো আর কিছু খারাপ খবর আছে'। আসলেই বুদ্ধিমান কার্টুনিষ্ট।

আপাতদৃষ্টিতে কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশনের অদ্ভুত এই বিষয়টি অন্য পদার্থবিদদের প্ররোচিত করেছিল এর একটি বিকল্প ব্যাখ্যা খুঁজতে, তাদের সেই বিকল্প ব্যাখ্যাটির নাম হচ্ছে 'মেনি ওয়ার্ল্ডস ইন্টারপ্রিটেশন অব কোয়ান্টাম থিওরি (এখানে মাল্টিভার্স তত্ত্বের সাথে এটি গুলিয়ে ফেললে চলবে না, যদিও প্রায়শই সেটি করা হয়, যে বিষয়ে আমি কিছুক্ষণ পরে আলোচনা করবো)। এই মেনি ওয়ার্ল্ড ব্যাখ্যায়, মহাবিশ্ব বিরতিহীনভাবে বহু ট্রিলিয়ন সংখ্যক বিকল্প বিশ্বে বিভাজিত হচ্ছে। ঐসব বিশ্বের কয়েকটিতে সেই বিড়ালটি ইতোমধ্যেই মৃত, আর অন্য কিছু বিশ্বে বিড়ালটি জীবিত। ঐসব বিশ্বের কয়েকটিতে আমি ইতোমধ্যে মৃত, আর অন্য কিছু বিশ্বে (অবশ্যই এই বিশ্বে যেখানে আমি এই শব্দগুলো টাইপ করছি) আমি এখনো জীবিত। কিন্তু আরো অন্য কোনো বিশ্বে আমার সবুজ গোফ আছে (বেশি সংখ্যক নয়)। একটি উপায়ে এই মেনি ওয়ার্ল্ড ব্যাখ্যা মনে হতে পারে কোপেনহেগেন ব্যাখ্যার চেয়ে খানিকটা কম উদ্ভট। অন্য একটি উপায়ে এটি আরো বেশি অদ্ভুত। চিন্তিত হবেন না যদি আপনি এই অনুচ্ছেদ আর আগের অনুচ্ছেদটি পড়ে সম্পূর্ণ হতভম্ব হয়ে যান। আমার নিজের অবস্থাও তাই। আর আমি ঠিক এই বিষয়টি বোঝাতে চাইছি। বৈজ্ঞানিক সত্য ভীতিকর হতে পারে এবং আর এর মুখোমুখি হতর আমাদের সাহসের প্রয়োজন।

পূর্ববর্তী এক শতাব্দীতে, পৃথিবী নিজ অক্ষে ঘূর্ণায়মান এবং সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে এমন ধর্মদ্রোহী ধারণায় গ্যালিলেওর নির্যাতনকারীরা আতঙ্কিত হয়েছিলেন। যে কেউই হয়তো আতঙ্কিত হতে পারেন যখন তারা প্রথমবারের মত আবিষ্কার করবেন, শক্ত যে মাটির উপর তারা দাড়িয়ে আছেন তা আসলেই প্রায় সম্পূর্ণভাবেই একটি শূন্যস্থান। কিন্তু অস্বস্তিকর হলেও এটি সত্য হওয়া

থামিয়ে দেয় না। আর আতঙ্কিত করার চেয়েও বৈজ্ঞানিক সত্যগুলো প্রায়শই চমকপ্রদ, সুন্দর, যা আমাদের বিস্ময়ে আচ্ছন্ন করে। বিজ্ঞানের ভীতিকর, বিস্ময়কর উপসংহারগুলোর মুখোমুখি হবার জন্য আপনার সাহসের প্রয়োজন। আর এই সাহসের সাথে আসে সুযোগ, সেই সব বিস্ময় আর সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতাকে উপভোগ করার সুযোগ। নিজেকে স্বস্তিদায়ক সান্ত্বনা, আপাতদৃষ্টিতে পোষ-মানা নিশ্চয়তাগুলো থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে 'বন্য' সত্যটাকে গ্রহন করার সাহস। আমার বন্ধু জুলিয়া সুইনি যেমন করেছিলেন যখন খ্রিস্টীয় ধর্মে তিনি তার বিশ্বাস হারিয়েছিলেন।

জুলিয়া সুইনি যুক্তরাষ্ট্রের একজন কমেডিয়ান এবং অভিনেতা। তিনি চমৎকার একটি কমিক স্টেজ শো লিখেছিলেন এবং অভিনয় করেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল 'লেটিং গো অব গড'। জুলিয়া খুব ধর্মনিষ্ঠ একটি ক্যাথলিক পরিবারের একজন মেয়ে। যখন তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন, তিনি তার বিশ্বাসগুলোকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলেন। তিনি সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন। অনেক কিছু তার কাছে অর্থবহ মনে হয়নি। তার ধর্মের অনেক কিছুই যেগুলো 'ভালো' হিসাবে তাদের শেখানো হয়েছিল, সেগুলোকে বরং তার কাছে খারাপ মনে হয়েছিল । তিনি বিজ্ঞান এবং নিরীশ্বরবাদ সংক্রান্ত অনেক বই পড়েছিলেন। তারপর একদিন যখন তার প্রশ্ন করার অভ্যাসটি বেশ অগ্রসর একটি ধাপ স্পর্শ করেছিল, তিনি তার মস্তিষ্কের মধ্যে একটি অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। প্রথমে এটি প্রায় অস্ফুট একটি উচ্চারণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, 'কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই'। তারপর এটি আরো জোরালো হয়ে উঠেছিল: 'কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই'। অবশেষে, একটি আতঙ্কিত আর্তচিৎকার... 'হায় ঈশ্বর, ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই'।

> আমি বসে ভেবেছিলাম, 'ঠিক আছে, আমি স্বীকার করছি, আমি বিশ্বাস করিনা যে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস অব্যাহত রাখার যথেষ্ট পরিমান প্রমাণ আছে। যদি কোনো সর্বোচ্চ সত্তা, কোনো সর্বোচ্চ সচেতনতা এবং কোনো অপ্রাকৃত কিছু না থাকে, আপনি যেমন প্রত্যাশা করেন এটি করবে, পৃথিবী ঠিক সেভাবেই আচরণ করবে।
>
> এবং আমার সেরা বিবেচনা আমাকে বলেছিল, ঈশ্বর আমাদের আবিষ্কার করার চেয়ে বরং আমাদেরই ঈশ্বরকে আবিষ্কার করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এবং আমি কেঁপে উঠেছিলাম। আমি অনুভব করেছিলাম যে আমি ভেলা থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছি ...

তারপর আমি ভেবেছিলাম, 'কিন্তু আমি তো জানি না কীভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করতে হয়। আমি জানি না কীভাবে আপনি সেটি করেন। কীভাবে আপনি ঘুম থেকে ওঠেন, কীভাবে আপনি দিন পার করেন? মনে হয়েছিল যেন আমি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। আমি ভেবেছিলাম, 'ঠিক আছে, শান্ত হও, এক মুহূর্তের জন্য ঈশ্বরে-বিশ্বাস-না-করা চশমাটি চোখে দিয়ে দেখার চেষ্টা করো, শুধু কয়েক সেকেন্ডের জন্য। শুধু ঈশ্বর-নেই চশমাটি চোখে দিয়ে দ্রুত চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখো, তারপর সাথে সাথেই চিন্তাটি ছুড়ে ফেল'। এবং আমি সেই 'চশমা' পরে ছিলাম এবং চারিদিকে তাকিয়েছিলাম।

বিব্রত তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি শুরুতে আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছিল। আমার আসলেই সেই চিন্তাটি হয়েছিল, 'বেশ, কীভাবে মহাশূন্য তাহলে এই পৃথিবীটি ভেসে আছে? তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, মহাশূন্যে আমরা শুধু প্রচণ্ড বেগে ছুড়ে চলছি? কি ভয়ানক একটি পরিস্থিতি'? আমি চাইছিলাম যেন যে দ্রুত বাইরে বের হয়ে পৃথিবীটাকে দুই হাতে ধরি যখন এটি মহাশূন্য থেকে নীচে আমার হাতের মধ্যে এসে পড়বে।

এবং তারপর আমার মনে হয়েছিল, 'ওহ হ্যাঁ, মাধ্যাকর্ষণ আর কৌণিক গতি আর ভরবেগ সম্ভবত আরো অনেক অনেক দীর্ঘ সময় আমাদের সূর্যের চারিদিকে ঘুর্ণায়মান রাখবে'।

জুলিয়া সাহসের সাথে যুক্তি আর প্রমাণগুলো অনুসরণ করেছিলেন, এমনকি যদিও সেটি তাকে তার শৈশবের স্বস্তির বলয় থেকে টেনে বের করে এনেছিল। এই অধ্যায়টি সাহসের সেই পদক্ষেপ আর ধাপগুলো নিয়ে, নিরীশ্বরবাদের পথে যাত্রা শুরু করার জন্য যা আপনার নেয়া প্রয়োজন। একটি বড় ধাপ মূলত পুরো মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত। আমরা পরে সেই বিষয়ে আলোচনা করবো। কিন্তু যেভাবে এই অধ্যায়ে আমার ভূমিকায় বলেছিলাম, এর চেয়ে এমনকি আরো বড় ধাপটি হচ্ছে জীবনের বিবর্তন বোঝা, আর সেই পদক্ষেপটি মানবতা ইতোমধ্যেই নিয়েছে। আমাদের উচিত সেখান থেকে সাহস নেয়া।

প্রায়শই আমি ভেবেছি চার্লস ডারউইনের রূপে বিবর্তনের সম্পূর্ণ সত্যটি অনুধাবন করতে মানবতার কেন উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি অবধি সময় নিতে হয়েছিল। আশাকরি অষ্টম আর নবম অধ্যায় প্রদর্শন করতে পেরেছে যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের ধারণাটি আসলেই বোঝার জন্য খুব

কঠিন কিছু ছিল না। এই মূলনীতিটি বুঝতে আপনার গণিত জানার কোনো দরকার নেই। ডারউইন গণিতজ্ঞ ছিলেন না, আলফ্রেড ওয়ালেসও গণিতজ্ঞ ছিলেন না, যিনি খানিকটা সময় পরে এ ধারণাটি স্বতন্ত্রভাবেই আবিষ্কার করেছিলেন। উনবিংশ শতকের আগে কেন কেউই সেটা বুঝতে পারেননি?

কেন অ্যারিস্টোটল (৩৮৩-৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বিবর্তনের বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি? পৃথিবী সবচেয়ে সেরা চিন্তাবিদ হিসেবে যিনি সন্মানিত। যৌক্তিক চিন্তাপ্রক্রিয়ার মূলনীতিগুলো মূলত তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে বহু প্রাণী আর উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং সেগুলোর বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও জীবদের উত্থাপিত সেই সুস্পষ্ট প্রশ্নটির উত্তর কী হতে পারে সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা ছিল না: 'কেন এই জীবদের অস্তিত্ব আছে?, কেন তারা এখানে'? আর্কিমিডিসের (২৮৭-২১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত কিছু ধারণা ছিল - গোছলের চৌবাচ্চার ভিতরে ও বাইরে - (এটি ওয়েবে খুঁজে দেখুন, যদিও দুঃখজনকভাবে গোছলের চৌবাচ্চা থেকে লাফিয়ে উঠে আসা আর্কিমিডিসের গল্পটি হয়তো পুনরাবৃত্তিযোগ্য একটি পুরাণ, সেই পুরাণগুলোর মতোই, যেগুলোর সাথে আমরা তৃতীয় অধ্যায় পরিচিত হয়েছিলাম।) কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের ধারণাটি কখনোই তার মনে উদয় হয়নি। এরাতোস্থেনিস (২৭৬-১৯৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) জানা দুরত্বের দুটি এলাকায় ঠিক মধ্য দিবসে সূর্যের ছায়ার দৈর্ঘ্য তুলনা করে পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেছিলেন। দারুণ উদ্ভাবনী একটি কৌশল। পৃথিবীর অক্ষের একপাশে হেলে হয়ে থাকার (অক্ষীয় আনতি, ভৌগোলিক নিরক্ষরেখা পৃথিবীর কক্ষীয় সমতলের সাপেক্ষে প্রায় ২৩.৪৪°কোণে হেলে রয়েছে।) পরিমানটি সঠিকভাবে তিনি পরিমাপ করেছিলেন (যে হেলে থাকার ব্যাপারটি আমাদের ঋতুগুলো দিয়েছে)। ঐসব অর্জনগুলো আমাদের অধিকাংশেরই আকাঙ্ক্ষা করা সম্ভব এমন অর্জন থেকে অনেক বেশি অসাধারণ মেধাবী অর্জন। যদিও ঐসব বুদ্ধিমান মেধাবী প্রাচীন গ্রিকদেরও ঘিরে ছিল প্রাণী আর উদ্ভিদরা (এবং অবশ্যই মানুষ) এবং তারা অবশ্যই ভেবেছিলেন কীভাবে এগুলো এত উদ্দেশ্যপূর্ণ, এবং এত সুন্দরভাবে 'পরিকল্পিত'। কিন্তু তাদের কখনোই চূড়ান্তভাবে খুব সাধারণ সেই ধারনাটির কথা মনে হয়নি - ডারউইনের ধারণাটি। এমনকি গ্যালিলেও সেটি ভাবেননি। ভাবেননি আইজাক নিউটনও, যিনি নিশ্চয়ই এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে এমন সবচেয়ে মেধাবী ব্যক্তিদের একজন ছিলেন [নিউটন নানা ধরনের স্ববিরোধিতার একটি জটিল মিশ্রণ ছিলেন। একজন বিস্ময়কর প্রতিভাবান যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী, যিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময় সাধারণ ধাতু থেকে স্বর্ণ নির্মাণ করার

অর্থহীন প্রচেষ্টায় (আলকেমি) কাটিয়েছিলেন। আর তার জীবনের বাকী অংশও সেই অর্থহীন কর্মকাণ্ডে পূর্ণ, যেমন বর্ণিত সংখ্যাগুলোর গুরুত্ব বোঝার জন্য বাইবেল বিশ্লেষণ। প্রসঙ্গক্রমে - যদিও এটি তার বুদ্ধিমত্তার উপর কোনো প্রভাব ফেলেছিল সেই অর্থে নয় - ডারউইনের ব্যতিক্রম, নিউটন খুব একটা নম্র স্বভাবে মানুষ ছিলেন না। তিনি তার প্রতিদ্বন্দী রবার্ট হুকের সাথে খুবই খারাপ আচরণ করেছিলেন, যদিও ঈর্ষা, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, অন্যদিক বরাবর থাকা উচিত ছিল। আর এর ঠিক উলটো আচরণ দেখি যখন তার কুকুর ডায়মন্ড একটি প্রদীপ ফেলে দিয়ে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুড়িয়ে দিয়েছিল, নিউটন যা নিয়ে কাজ করছিলেন, তিনি তার মেজাজ হারাননি শুধুমাত্র বলেছিলেন, 'ওহ! ডায়মন্ড, ডায়মন্ড, কী দুষ্টামি তুমি করেছ সেটি সম্বন্ধে তুমি কত কম জানো'। এভাবে অন্তত একটি পরিচিত গল্প এটি বর্ণনা করেছে। কিছু ইতিহাসবিদ দাবী করেন এমন কিছু কখনোই ঘটেনি। সে ক্ষেত্রে এটি আরো একটি ভালো উদাহরণ, অধ্যায় তিনে যোগ করার জন্যে, কীভাবে পুরাণ শুরু হতে পারে]। ইতিহাসজুড়ে আরো মহান দার্শনিকদের কারোরই এটি মনে হয়নি। এই ধারণাটি এতই সরল এবং এতই শক্তিশালী, আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে-কোনো নির্বোধের পক্ষেও এটি ধারণা করা সম্ভব ছিল। যে-কোনো নির্বোধের পক্ষেই একটি চেয়ারে বসে, খুব বেশি পরিমান শিক্ষা কিংবা গণিতে পাণ্ডিত্য ছাড়াই এটি অনুধাবন করার কথা ছিল। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন এমন সাধারণ শব্দজটের ধাঁধা সমাধান করার চেয়েও এটি সহজ হবার কথা (আমি আসলেই অন্তর থেকেই বলছি, কারণ আমি এই সাংকেতিক শব্দজট ধাঁধায় খুবই দুর্বল)। কিন্তু তারপরও উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের আগে কারোর মনেই এই ধারণাটি আসেনি। এই বিস্ময়করভাবে শক্তিশালী অথচ খুব সাধারণ ধারণাটি পৃথিবী শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাবান মনগুলোর অধরা রয়ে গিয়েছিল, অবশেষে এটি উদিত হয়ছিল দুইজন অ-গণিতজ্ঞ ভ্রমণরত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী এবং নমুনা সংগ্রাহকের মনে: চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। এছাড়াও এটি সম্ভবত একই সময় স্বতন্ত্রভাবে মনে এসেছিল তৃতীয় একজন ব্যক্তির মনে, প্রাট্রিক ম্যাথিউ নামের একজন স্কটিশ বাগান-রক্ষক।

কেন এতদিন সময় লেগেছিল? আমি মনে করে যা ঘটেছিল সেটি হচ্ছে এমন। আমি মনে করি, জীবিত যে-কোনো কিছুর জটিলতা, সৌন্দর্য আর 'উদ্দেশ্যময়তা' দেখে নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল যে, কোনো বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই এগুলো পরিকল্পনা করেছেন। সুতরাং অন্য কিছু এর কারণ হিসাবে বিবেচনা করার জন্যে সাহসের একটি বিশাল ঝাঁপ দরকার ছিল। সাহস বলতে

আমি শারীরিক সাহসকে বোঝাচ্ছি না, যেমন যুদ্ধের সময় কোনো সৈন্যের সাহসিকতা। আমি বোঝাতে চাইছি বৌদ্ধিক সাহসিকতা: আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত এমনকি হাস্যকর ধারণাগুলো নিয়ে চিন্তা করার সাহস এবং বলা : 'কী বলছেন আপনি, প্রায় অবিশ্বাস্য - কিন্তু যা-ই হোক না কেন, আসুন আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে সম্ভাবনাটিকে যাচাই করে দেখি'। কামানের গোলা আর পালক একই গতিতে মাটির উপর পড়তে পারে - 'সুস্পষ্টভাবেই' এমন কিছু প্রস্তাব করা হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু গ্যালিলেওর এই সম্ভাবনাটি যাচাই এবং প্রমাণ করে দেখানোর মত বৌদ্ধিক সাহস ছিল। আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ অতীতের কোনো এক সময় যুক্ত ছিল এবং ধীরে ধীরে ভূখণ্ড দুটি পরস্পর থেকে দূরে সরে গেছে এমন প্রস্তাবনা সম্পূর্ণভাবে হাস্যকর মনে হয়েছিল। কিন্তু এই ধারণাটি তাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সেটি দেখা সাহস ভেগেনারের ছিল। 'ডিজাইন' করা হয়েছে বলে অনুভূত হওয়া মানব চোখের মত অঙ্গটি আদৌ 'ডিজাইন' করা নয় এমন কিছু নিশ্চয়ই সম্পূর্ণভাবে হাস্যকর আর অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই 'হাস্যকর' সম্ভাবনাটি পরীক্ষা করে দেখার মত সাহস ডারউইনের ছিল। আর আমরা এখন জানি যে, তিনি সঠিক ছিলেন। এই ব্যাপারে সঠিক এবং প্রতিটি জীবের একেবারে শেষ খুঁটিনাটি বিষয় অবধি তার ধারণাগুলো ছিল সঠিক।

ডারউইনের আগে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের সাধারণ এই সত্যটি ঐসব বুদ্ধিমান গ্রিক, ঐসব প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ আর দার্শনিকদের চোখের সামনেই ছিল। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা সুস্পষ্ট মনে হয়েছিল সেটির মুখোমুখি হবার মত বৌদ্ধিক সাহস তাদের কেউই দেখাতে পারেননি। তারা সেই সব কিছুরই চমৎকার 'বটম-আপ' (বা নীচ থেকে পরিকল্পনাহীন সৃষ্টি) সৃষ্টির ব্যাখ্যাটিকে উপেক্ষা করেছিলেন, ভ্রান্তভাবেই তাদের মনে হয়েছিল এগুলোর উপর টপ-ডাউন (বা উপর থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি) সৃষ্টি যেন সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে। সত্যিকারের ব্যাখ্যাটি যে এত দৃষ্টি-আচ্ছন্নকারী সরল ছিল যে, এই বাস্তব সত্যটির অর্থ হচ্ছে, এর রহস্য অনুসন্ধান এবং বিস্তারিতভাবে এটি সমাধান করতে এমনকি আরো বেশি পরিমান সাহস জরুরী ছিল। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সত্যটি ঐসব মেধাবী মনকে এড়িয়ে যেতে পেরেছিল তার সুনির্দিষ্ট কারণ হচ্ছে এটি আসলেই খুব বেশি সরল একটি ধারণা। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, সম্পূর্ণ জীবজগতের জটিলতা আর বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করার কঠিন দায়িত্ব নেবার জন্য এটি আসলেই খুব বেশি মাত্রায় সরল।

প্রমাণ এখন আর ভিন্ন কোনো বিকল্পকে অনুমতি দেয় না, আমরা এখন জানি যে, ডারউইন সঠিক ছিলেন। কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার এখনো সমাধান করা বাকি আছে। যেমন, আমরা এখনো জানিনা - 'এখনো' - প্রায় চারশ কোটি (চার বিলিয়ন) বছর আগে ঠিক কীভাবে বিবর্তন প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল, কিন্তু জীবনের মূল রহস্য, কীভাবে এটি এত জটিল, এত বিচিত্র, এত সুন্দরভাবে পরিকল্পিত হয়ে উঠেছিল, সেটি সমাধান হয়েছে। আর এই বইয়ে আমার চূড়ান্ত বক্তব্যটি হচ্ছে : ডারউইন এবং গ্যালিলেও এবং ভেগেনারের বৌদ্ধিক সাহসের দৃষ্টান্তটির ভবিষ্যতে আরো বহু দূরে যেতে আমাদের অনুপ্রাণিত করা উচিত। ঐসব উদাহরণগুলো, আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর প্রস্তাবনাগুলো পরবর্তীতে যে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল সেই বাস্তবতাটির আমাদের নতুন সাহসে উদ্দীপ্ত করা উচিত, যখন আমরা আমাদের অস্তিত্বের অমীমাংসিত অবশিষ্ট কিছু ধাঁধা আর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবো: কীভাবে এই মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল? আর এটিকে পরিচালিত করার সূত্রগুলোই বা কোথা থেকে এসেছে?

প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা অগ্রসর করার আগে আমকে একটি সতর্কতা উল্লেখ করতে হবে। গ্যালিলেও, ডারউইন এবং ভেগেনার সাহসিকতাপূর্ণ বিস্ময়কর নানা ধারণা প্রস্তাব করেছিলেন এবং তারা সঠিক ছিলেন। বহু মানুষই সাহসিকতাপূর্ণ বিস্ময়কর বহু ধারণা প্রস্তাবনা করেন এবং যেগুলো ভুল, উন্মত্ত ভুল। সাহস তাই যথেষ্ট নয়। আপনাকে সেই ধারণা নিয়ে পরিশ্রম করতে হবে এবং আপনার ধারণাটিকে সঠিক প্রমাণ করতে হবে।

মহাবিশ্বের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বহু শতাব্দী ধরেই ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। এবং মহাবিশ্ব নিজেই আক্ষরিকার্থে প্রতি সেকেন্ডে আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে। একটি সময় মানুষ ভেবেছিল, মাথার উপরে ঘুরতে থাকা সূর্য আর চাঁদ, একটি অর্ধাবৃত্তাকার খোলসের মধ্য দিয়ে স্বর্গ অভিমূখে উঁকি দেওয়া ক্ষুদ্র ছিদ্র হিসাবে নক্ষত্রসহ এই পৃথিবী ছাড়া মহাবিশ্বের আর কিছু নেই। এখন আমরা জানি মহাবিশ্ব আমাদের সব ধারণার চেয়েও অনেক বিশাল। কিন্তু আমরা আরো জানি যে, কোনো এক সময়, এই মহাবিশ্ব আমাদের সব ধারণার চেয়েও ছোটো ছিল। আর আমরা জানি সেটি কখন ছিল। বর্তমানে হিসাব অনুযায়ী সেই ছিল ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে।

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব হচ্ছে বিংশ-শতাব্দীর একটি আবিষ্কার। এই পৃথিবীতে এখনো এমন মানুষ বেঁচে আছেন - আমার ১০২ বছর বয়সী মাও তাদের একজন - যারা এমন একটি মহাবিশ্বে জন্মগ্রহন করেছিলেন, যখন একটি মাত্র ছায়াপথের কথা মানুষ জানতো। এখন এমন একটি মহাবিশ্বে তিনি বাস করেন

যেখানে ১০০ বিলিয়ন ছায়াপথ পরস্পর থেকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে যখন মহাবিশ্ব নিজেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। অবশ্যই এভাবে বিষয়টি বলা সঠিক নয়। তিনি এবং শেক্সপিয়ার এবং গ্যালিলেও, এবং আর্কিমেডিস এবং ডায়নোসর সবাই জন্মগ্রহন করেছিল একই সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বে। কিন্তু যখন আমার মায়ের জন্ম হয়েছিল, ১৯১৬ সালে, একটি মাত্র ছায়াপথ, যাকে আমরা 'মিল্কি ওয়ে' নামে ডাকি, সেটি ছাড়া আর কোনো ছায়াপথের কথা কেউই জানতেন না। সেটাই ছিল মহাবিশ্ব। গ্যালিলেওর সময়ে কেউ এমনকি সেটিও জানতেন না। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলো সত্য এমনকি সেগুলো সম্বন্ধে জানার জন্য যদি কেউ সেখানে নাও থাকেন। এবং এমনকি সে দৃশ্যে মানুষের আবির্ভাব হবার আগেও সেগুলো সত্য ছিল। এবং এমনকি আমরা বিলুপ্ত হয়ে যাবার পরও সেগুলো সত্য থাকবে। আর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা অন্যথায় বুদ্ধিমান চিন্তাবিদদেরও যা এড়িয়ে গেছে।

সম্ভাবনা আছে যে, এমনকি আমাদের সম্প্রসারণশীল ১০০ বিলিয়ন ছায়াপথের মহাবিশ্বটি শুধু একটি মাত্র মহাবিশ্ব নয়। খুব সঙ্গত কারণে বহু বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আমাদের মত আরো বহু বিলিয়ন সংখ্যক এমন মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, আমাদের এই মহাবিশ্বটি সেই বহু বিলিয়ন মহাবিশ্ব বা মাল্টিভার্সের শুধু একটি মাত্র। আমরা পরে আবার এই ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করবো।

আমাদের মহাবিশ্বের খুব অতীত ইতিহাসে কী ঘটেছিল সে বিষয়ে পদার্থ বিজ্ঞানীদের আজ বেশ ভালো ধারণা আছে । আর 'খুব অতীত ইতিহাস' মানে আমি মহাবিশ্বের জন্ম হবার প্রথম একটি সেকেন্ডের ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ পরিমান সময় বোঝাতে চেয়েছি। এবং এটি শুধুমাত্র মহাবিশ্বের জন্মের পরেই নয়, সময়ের জন্মের পরেও। আর 'সময়ের জন্ম' শব্দগুলোর সম্ভাব্য কী অর্থ হতে পারে? এর আগে কী ঘটেছিল? পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলেন ঐ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার অনুমতি নেই। এটি অনেকটাই (অথবা তারা যেমন বলেন) উত্তর মেরুর উত্তরে কী আছে সেটি জানতে চাইবার মত। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা হয়তো শুধুমাত্র আমাদের মহাবিশ্বে প্রযোজ্য। আর সেটি হবে যদি আমাদের মহাবিশ্বটি আসলে একটি মাল্টিভার্সের বহু মিলিয়ন মহাবিশ্বের একটি হয়।

ইদানীং ঈশ্বর-পুজারীরা (অন্তত শিক্ষিতরা) একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজতে জীবজগতের উপর হাল ছেড়ে দিয়েছেন। আর এর কারণ হচ্ছে তারা এখন বুঝতে পেরেছেন, জীবজগত সংক্রান্ত সব বিষয়ে ডারউইনীয় বিবর্তন পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছে। এর পরিবর্তে ভিন্ন ধরনের যুক্তি নিয়ে তারা তাদের অবস্থান

পরিবর্তন করেছেন। খানিকটা মরিয়া হয়ে – অন্তত আমার কাছে তেমন মনে হয় - অন্য 'শূন্যস্থানগুলো'র উপর তারা তাদের মনোযোগ দিয়েছেন । বিশেষ করে কসমোলজি এবং সবকিছুর উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর উপর, পদার্থবিদ্যার মৌলিক সূত্র এবং ধ্রুবগুলোর উৎপত্তি যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ।

পদার্থবিদ্যার মৌলিক ধ্রুবগুলো বলতে কী বোঝায় আমার সেটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কিছু সংখ্যা আছে যা আপনি পরিমান করতে পারবেন। যেমন রুপার পরমাণুতে প্রোটোন সংখ্যা। আরো কিছু সংখ্যা আছে আপনি যেগুলোর একটি সম্ভাব্য পরিমাপ (অনুমান) করতে পারবেন। যেমন, একটি পূর্ণ গ্লাসে পানির অণুর সংখ্যা। এবং আরো কিছু সংখ্যা আছে যাদের মান গাণিতিকভাবে অপরিহার্য। যেমন পাই (π), কোনো বৃত্তের পরিধি আর এর ব্যাসার্ধের অনুপাত - আর 'পাই' বিস্ময়কর বহু উপায়ে গণিতে প্রবেশ করে। কিন্তু কিছু সংখ্যা আছে যা পদার্থবিদরা শুধুমাত্র গ্রহন করে নিয়েছেন তাদের মান যা আছে সেটি কেন তেমন সেটি না জেনেই। এই সংখ্যাগুলোকেই বলে পদার্থবিদ্যার মৌলিক ধ্রুব।

একটি উদাহরণ হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণজনিত ধ্রুব, 'G' বর্ণটি হচ্ছে যার প্রতীকী রুপ। আপনি মনে করতে পারবেন, আমরা নিউটনের কাছে থেকে শিখেছিলাম মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু, যেমন, গ্রহ, কামানের গোলা আর পালক, মহাকর্ষীয় বলের কারণে পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হয়। জিনিসগুলো পরস্পর থেকে যত দূরে অবস্থান করবে, সেই আকর্ষণটিও তত দূর্বল হবে (দূরত্বের গুণফলের বিপরীতভাবে সমানুপাতিক)। আর যত বড় হবে সেই দুটি বস্তু, তাদের মধ্যে আকর্ষণও ততটাই শক্তিশালী হবে (দুটি ভরের গুণফলের সমানুপাতিক)। কিন্তু সেই আকর্ষণের আসল শক্তিটি পেতে আপনাকে পরিশেষে আরো একটি সংখ্যা দিয়ে এটিকে গুণ দিতে হবে, সেটি হচ্ছে 'G', মাধ্যাকর্ষণীয় ধ্রুব। পদার্থবিদরা বিশ্বাস করেন, পুরো মহাবিশ্বের যে-কোনো জায়গায় এই 'G' এর পরিমান একই, আর তারা জানেন না এটির মান যা সেটি এমন কেন। একটি বিকল্প মহাবিশ্বের কথা ভাবা সম্ভব যেখানে এই 'G' এর একটি ভিন্ন মান আছে, আর এই 'G' যদি সামান্য ভিন্ন হয়, তাহলে সেই মহাবিশ্ব খুবই ভিন্ন হবে।

যদি 'G' এর মান এটি যেমন তার চেয়ে কম হয়, তাহলে মহাকর্ষীয় বল যথেষ্ট দুর্বল একটি শক্তিতে পরিণত হবে, পদার্থকে একসাথে জড়ো করার জন্য সেটি যথেষ্ট হবে না। কোনো ছায়াপথ, কোনো নক্ষত্র, কোনো রসায়ন, কোনো গ্রহ, কোনো বিবর্তন আর কোনো জীবন থাকবে না। আর যদি 'G' এর মান এখন যা আছে তার চেয়ে খানিকটা বেশি হয়, নক্ষত্রগুলো তাদের অস্তিত্ব আর সেভাবে টিকিয়ে রাখতে পারতো না যেভাবে এখন আমরা তাদের দেখি, এবং এখন

যেভাবে সেগুলো আচরণ করে সেভাবে আচরণ করতো না। নক্ষত্রগুলো নিজেদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ধ্বসে পড়তো এবং কৃষ্ণ গহ্বরে (ব্ল্যাক হোলে) পরিণত হতো। নক্ষত্র থাকতো না, গ্রহ থাকতো না, বিবর্তন হতো না, জীবনের অস্তিত্ব থাকতো না।

ভৌত ধ্রুবকগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে 'G' (মহাকর্ষ ধ্রুবক), অন্য ধ্রুবকগুলোর মধ্যে যেমন আছে 'c' অর্থাৎ আলোর দ্রুতি (শূন্য মাধ্যমে), এবং পরমাণু নিউক্লিয়াসকে একত্রে বেঁধে রাখা 'স্ট্রং ফোর্স' বা সবল নিউক্লিয় বল (মূলত সবল বল নিউট্রন এবং প্রোটনকে একত্রিত করে পারমাণবিক নিউক্লিয়াস তৈরি করে) । এই ধরনের ডজনখানেকেরও বেশি ভৌত ধ্রুবক আছে। যাদের প্রত্যেকটির একটি মান আছে যা আমরা জানি, কিন্তু সেটি (আপাতত) ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। আর সব ক্ষেত্রেই আপনি বলতে পারেন, যদি এই ধ্রুবকগুলোর মান এখন যেমন আছে তার থেকে যে-কোনো দিক বরাবর খানিকটা ভিন্ন হতো, আমাদের জানা এই মহাবিশ্বটির কোনো অস্তিত্ব থাকতো না।

আর এটাই কিছু ঈশ্বরবাদীদের প্ররোচিত করেছে আশাবাদী হতে: এই দৃশ্যের অন্তরালে নিশ্চয়ই কোথাও ঈশ্বর লুকিয়ে আছেন। যেন এই সব মৌলিক ধ্রুবকের মানের প্রত্যেকটি একটি 'নব' (নিয়ন্ত্রক চাবি) ঘুরিয়ে ঠিক করা হয়েছে, পুরোনো মডেলের রেডিওতে যেমন নব ঘুরিয়ে টিউনিং করা হয় তেমনি হয়তো আপনিও নবটি নাড়াচড়া করতে পারেন। আমাদের পরিচিত এ মহাবিশ্বটির অস্তিত্ব এবং সেই সূত্রে আমাদের অস্তিত্বের জন্য প্রতিটি 'নব' সঠিকভাবে 'টিউন' হতে হবে। আর এখানে 'প্রলোভন' হচ্ছে এমন কিছু ভাবা যে, একটি সৃজনশীল সত্তা, এক ধরনের ঈশ্বর, স্বর্গীয় 'নব' নিয়ন্ত্রণকারী সুক্ষ্মভাবে এ ধ্রুবকগুলোর মানগুলো নির্ধারণ (ফাইন টিউনিং) করেছিলেন, যা সবকিছুর অস্তিত্ব সম্ভব করেছে।

আর এ প্রলোভনটিকে খুব কঠোরভাবে প্রতিহত করা উচিত। এর কারণগুলো নিয়ে আমরা আগের অধ্যায়গুলোয় আলোচনা করেছি। ঐসব নবগুলোর সূক্ষ্ম টিউনিং অসম্ভাব্য মনে হতে পারে, কারণ এই সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের নবগুলো বহু ভিন্ন বিকল্প অবস্থানে থাকতে পারে । কিন্তু এই সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের নির্ভূলতা যতই অসম্ভাব্য মনে হোক না কেন, কোনো ঈশ্বর যিনি কিনা এই ধরনের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ নির্ভূলভাবে করতে সক্ষম তিনিও অন্ততপক্ষে ততটাই অসম্ভাব্য। কীভাবেই বা তিনি এগুলো সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে জানবেন? যুক্তি প্রক্রিয়ায় একজন ঈশ্বরকে আমদানী করে সেই কারণে এই সমস্যা সমাধান করা যাবে না। এটি

শুধুমাত্র এটিকে আরেক ধাপ পেছনে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে। এটি সম্পূর্ণভাবে সুস্পষ্ট একটি অ-ব্যাখ্যা।

যে সমস্যাটি ডারউইন সমাধান করেছিলেন, বিশেষত জীবনের সুবিশাল অসম্ভাব্যতার সমস্যাটি, আসলেই খুব বড় একটি সমস্যা ছিল। ডারউইন আসার আগে, বহু পুনরাবৃত্তি করা বাক্যটি ছিল এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে ব্যবহৃত একটি বাক্য – 'আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বের সাথে কথাটি বলছেন না'! এই বাক্যটি তীব্র শক্তিতে আঘাত করতো এমন যে কাউকেই, যিনি জীবনের স্বর্গীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রশ্ন করার সাহস প্রদর্শন করতেন। হয়তো অন্য যে-কোনো জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে জীববিজ্ঞানেই এই আঘাতটি বেশি তীব্র ছিল। সোয়ালো পাখির গতি আর সৌন্দর্য, আলবাট্রস অথবা শুকুনের ওড়ার নিখুঁত ডানা, মস্তিষ্ক অথবা রেটিনার হতভম্ব করে দেয়া সাংগাঠনিক জটিলতা, আর হাতির কোয়াড্রিলয়ন সংখ্যক কোষের প্রতিটির কোষের কথা না হয় বাদই দিলাম, হামিংবার্ড অথবা ময়ুরের দ্যুতিময় সৌন্দর্য ইত্যাদি সব জটিলতাগুলো এসেছে অনির্দেশিত, কারো সহায়তা কিংবা তদারকী ছাড়া শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলোর মাধ্যমে?

পদার্থবিদ্যার সূত্র আর ধ্রুবকগুলো উৎপত্তির মত তুলনামূলকভাবে এত সরল কিছু ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ একটি কাজ হওয়া উচিত। মানতেই হবে, আমরা এখনো সমস্যাটি সমাধান করে উঠতে পারিনি। কিন্তু জীবনের আরো বড় সমস্যা এবং টিকে থাকার প্রয়োজনীয়তার সাথে এটির সূক্ষ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে ডারউইন ও তার উত্তরসূরিদের সফলতা আমাদের সাহস দেয়া উচিত। বিশেষ যখন আমরা ডারউইনের সাথে বিজ্ঞানের আরো বিস্ময়কর সব সফলতাগুলো যোগ করি। আমরা এই ধরনের সফলতার তালিকার সাথে পরিচিত। অ্যান্টিবায়োটিক, ভ্যাক্সিনেশন এবং বৈজ্ঞানিক শল্যচিকিৎসা ছাড়া আমরা অনেকই এতদিনে মারা যেতাম। বৈজ্ঞানিক প্রকৌশল ছাড়া যেখানে আমাদের জন্ম হয়েছে সেখান থেকে অল্প কিছু মাইলের বেশি আমাদের পক্ষে যাতায়াত করা সম্ভব হতো না। বৈজ্ঞানিক কৃষি ছাড়া, আমরা অধিকাংশই আজ অভুক্ত থাকতাম। আমি বিজ্ঞানের একটি বিস্ময়কর অংশ নির্বাচন করে সেটির উপর মনোযোগ দিতে চাই, যা আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট গভীর প্রশ্নগুলোর সাথে যুক্ত - কীভাবে মহাবিশ্ব এর এই রূপটি পেয়েছিল?

পৃথিবীব্যাপী কর্মরত কসমোলজিস্ট বা বিশ্বতাত্ত্বিকরা গঠনমূলকভাবে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে 'বিগ ব্যাঙ্গ'-এর পরে কী ঘটেছিল তার একটি বিস্তারিত তত্ত্ব নির্মাণ করে তুলেছেন। কিন্তু এমন কোনো তত্ত্ব আপনি কীভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন? আপনার সেই 'সূচনা মুহর্তের পরিস্থিতিগুলো'

তৈরি করতে হবে - এর মানে বিগ ব্যাঙ্গের তাৎক্ষণিক পর মুহূর্তে সব কিছু কেমন ছিল বলে আপনি মনে করেন। আপনার তত্ত্বটি যদি সঠিক হয়ে থাকে, তারপর সেই তত্ত্বটি ব্যবহার করে আজ সব কিছুর কীভাবে থাকা উচিত সেই বিষয়টির সমাধান করা। অন্যভাবে বললে, দূরবর্তী অতীত থেকে বর্তমানের সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করতে সেই তত্ত্বটিকে আপনার ব্যবহার করতে হবে। আপনার ভবিষ্যদ্বাণীটি সঠিক কিনা সেটি দেখতে সব কিছু আসলেই যেভাবে আছে সেটি লক্ষ করতে হবে ।

গাণিতিক প্রমাণ ব্যবহার করে আপনার পূর্বধারণায় পৌঁছানোর কথা হয়তো আপনি ভাবতে পারেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিস্তারিত বিষয়গুলো সেটি করার জন্যে অনেক বেশি জটিল। মহাকর্ষীয় বল ছাড়াও সেখানে বহু বিলিয়ন সংখ্যক স্থানীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে, যেমন গ্যাস আর ধুলার ঘুর্ণায়মান মেঘমালা। শুধুমাত্র একটি কম্পিউটার মডেল তৈরি করার মাধ্যমে এই ধরনের জটিলতা সামাল দেয়া সম্ভব হতে পারে এবং তারপর সেটি চালিয়ে কী আসলে ঘটছে সেটি লক্ষ করতে হবে। ক্রেইগ রেনল্ডস আর তার ‘বয়েডস’ মডেলের মত, যা আমরা অধ্যায় ১০ এ আলোচনা করেছি। কিন্তু এটি আরো বেশি বিস্তারিতভাবে জটিল। আর আমি যখন বলছি একটি ‘কম্পিউটারে’, এটি শুধুমাত্র কথার খাতিরে, একটি একক কম্পিউটার, যতই সেটি বড় হোক না কেন, মহাবিশ্বের বিকাশের একটি কল্পদৃশ্য বা সিম্যুলেশন মডেল তৈরি করার জন্য সেটি যথেষ্ট নয়। কারণ হিসাবনিকাশগুলো অতিমাত্রায় বিশাল। সবচেয়ে অগ্রসর সিম্যুলেশন আপাতত যা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে ‘ইলাসট্রিস’, এবং এর জন্যে দরকার পড়েছে একটি নয় বরং সমান্তরালভাবে চলমান ৮১৯২ টি কম্পিউটার প্রসেসর। আর এগুলো সাধারণ কোনো কম্পিউটার নয়, এগুলো হচ্ছে সুপারকম্পিউটার। ইলাসট্রিস সিম্যুলেশনটি ‘বিগ ব্যাঙ্গ’-এ শুরু হয়নি কিন্তু এটি শুরু হয়েছে এর তিনশ হাজার বছর পরে (খুবই কম সময় যদি এর পরবর্তী ১৩.৮ বিলিয়ন বছরের সাথে তুলনা করা হয়) এমন কী ঐসব সুপার কম্পিউটারগুলোর প্রতিটি পরমাণুর একেবারে চূড়ান্ত খুঁটিনাটি অবধি ‘সিম্যুলেট’ করতে পারেনি। কিন্তু তাসত্ত্বেও বর্তমান পূর্বধারণাকৃত এই মহাবিশ্বের সাথে প্রকৃত বাস্তব পরিস্থিতির তুলনা করার বিষয়টি আসলেই বিস্ময়কর।

(ছবির অ্যালবাম অধ্যায়ে) ১৩ নং ছবিটি লক্ষ করে দেখুন, এর মধ্যে এক ধরনের একটি কৌতুক আছে। ছবিটি উপর-নীচ দুটি অংশে ভাগ করা, একটি অংশে সত্যিকারের মহাবিশ্বের চিত্র, বিখ্যাত হাবল ডিপ ফিল্ড আলোকচিত্র, ১৯৯৫ সালে হাবল অরবিটিং টেলিস্কোপ এ ছবিটি তুলেছিল। অন্য অর্ধাংশটি

‘ইসাল্ট্রিস’ সিম্যুলেশন বা দৃশকল্পে ভবিষ্যদ্বাণী করা মহাবিশ্বের চিত্র। আপনি কী বলতে কোনটি আসল আর কোনটি মডেলের করা ভবিষ্যদ্বাণী? আমি পারিনি।

বিজ্ঞান অসাধারণ আর বিস্ময়কর, তাই না? যদি আপনি মনে করেন আমাদের বোঝাপড়ায় আপনি একটি শূন্যস্থান পেয়েছেন, আপনি হয়তো আশা করছেন যে ঈশ্বর হয়তো সেটি পূরণ করবেন, আমার উপদেশ হচ্ছে: ‘ভালো করে ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখুন এবং কখনোই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বাজি ধরবেন না’।

যেমন আমি বলেছিলাম, ইলাসট্রিস সিম্যুলেশনটি শুরু হয়েছে বিগ ব্যাঙ্গের তিনশ হাজার বছর পর থেকে। আসুন এবার এর আরো বেশি অতীতের দিকে যাওয়া যাক, পুরো কসমসের সেই সূচনা মুহূর্তে, সেই মৌলিক ধ্রুবক এবং সূক্ষ্ম ‘টিউনিং’ বা নিয়ন্ত্রণের যুক্তিটিতে - সেই সব বিশেষ নাড়াচড়া যা নবটিকে একদম সঠিক অবস্থানে স্থির করেছে। আরো একবার সমস্যাটিকে নিয়ে আলোচনা করা যাক। আসুন একটি কৌতূহলোদ্দীপক ধারণা, ‘অ্যানথ্রোপিক’ মূলনীতি ব্যবহার করে শুরু করি।

‘অ্যানথ্রোপোস’ হচ্ছে ‘হিউম্যান’ (বা মানুষ) শব্দটির গ্রিক প্রতিশব্দ। সেখান থেকে অ্যানথ্রোপলজি (নৃতত্ত্ব - নৃবিজ্ঞান) শব্দটি এসেছে। আমরা মানুষ, আমাদের অস্তিত্ব আছে। আমরা জানি আমাদের অস্তিত্ব আছে কারণ আমরা এই পৃথিবীতে আছি, এবং আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবছি। সুতরাং যে মহাবিশ্বে আমরা বাস করছি সেটিকে অবশ্যই সেই ধরনের একটি মহাবিশ্ব হতে হবে যা আমাদের মত জীবদের উদ্ভব হবার মত সঠিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। আর যে গ্রহে আমরা বাস করছি, সেটির ঠিক সেই পরিস্থিতি থাকবে যা আমাদের এই পৃথিবীতে উদ্ভবের জন্য সঠিক একটি পরিস্থিতি। আমরা যে সবুজ উদ্ভিদ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছি সেটি কোনো দুর্ঘটনা নয়। কোনো গ্রহ যেখানে সবুজ উদ্ভিদ নেই (অথবা তাদের সমতূল্য) সেটি এমন কোনো সত্তার উদ্ভবে সহায়তা করতে পারে না, যারা কিনা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে পারে। আমাদের সবুজ উদ্ভিদের প্রয়োজন আছে, কারণ এটি আমাদের খাদ্যের মূল উৎস। আমরা যে আমাদের আকাশে নক্ষত্র দেখতে পাই সেটি কোনো দুর্ঘটনা নয়। নক্ষত্র ছাড়া কোনো মহাবিশ্ব এমন একটি মহাবিশ্ব হবে, যেখানে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম ছাড়া আর কোনো ভারী রাসায়নিক মৌল থাকবে না। আর শুধুমাত্র হাইড্রোজন আর হিলিয়ামসহ একটি মহাবিশ্ব জীবনের বিবর্তন সৃষ্টি করার মত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা যথেষ্ট পরিমানে সমৃদ্ধশালী হবে

না। অ্যানথ্রপিক মূলত প্রায় অতিমাত্রায় স্পষ্ট যা বলার অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু এটি তারপরও গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা যে জীবন চিনি সেটি জন্য তরল পানি অপরিহার্য। খুব সংকীর্ণ একটি তাপমাত্রার সীমানায় পানি তরল অবস্থায় থাকতে পারে । খুব বেশি শীতল তাপমাত্রায় এটি কঠিন বরফে রূপান্তরিত হয়। আর খুব উচ্চ তাপমাত্রায়, একটি গ্যাস – জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। আমাদের গ্রহটি ঘটনাক্রমে আমাদের সূর্য থেকে 'ঠিক' সঠিক একটি দূরত্বে অবস্থান করছে, আর সেকারণে পৃথিবীতে পানি তরল হতে পারে। মহাবিশ্বের অধিকাংশ গ্রহই তাদের নক্ষত্র থেকে হয় খুব দূরে (যেমন প্লুটো, হ্যাঁ, আমি জানি প্লুটো আর গ্রহ হিসাবে শ্রেণীবিন্যস্ত হবে না, কিন্তু আমার বক্তব্যটি ঠিক আছে) নয়তো খুব নিকটে (যেমন বুধ বা মার্কারি)। প্রতিটি নক্ষত্রের একটি 'গোল্ডিলক্স জোন' আছে (খুব বেশি উষ্ণ বা খুব বেশি শীতল না, সেই কাহিনীর শিশু ভালুকের পরিজের তাপমাত্রার মত, ঠিক সঠিক মাত্রায়)। পৃথিবী অবস্থান করছে সূর্যের গোল্ডিলক্স জোনে, বুধ আর প্লুটো, এর বিপরীত দুই প্রান্তে, এমন কোনো অবস্থানে নেই। কিন্তু অবশ্যই, অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি বলছে, পৃথিবীকে অবশ্যই গোল্ডিলক্স জোনেই অবস্থিত হতে হবে কারণ এখানেই আমাদের অস্তিত্ব আছে। আমাদের অস্তিত্ব থাকতো না যদি না আমাদের গ্রহটি গোল্ডিলক্স জোনে না থাকতো।

এখন, যা গ্রহগুলোর জন্য প্রযোজ্য, সেটি মহাবিশ্বের জন্যেও প্রযোজ্য। যেমন আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি, সন্দেহ করার জন্যে পদার্থবিদদের খুব ভালো কারণ আছে যে, আমাদের মহাবিশ্বটি আসলে একটি মাল্টিভার্সের বহু মহাবিশ্বের কেবল একটি। মাল্টিভার্সের ধারণাটি এসেছে - অন্ততপক্ষে এর কিছু ব্যাখ্যাকারীর মতে - একটি তত্ত্ব থেকে, যা পরিচিত 'ইনফ্লেশন' নামে, বর্তমানে অধিকাংশ কসমোলজিস্ট যা গ্রহন করে নিয়েছেন যদিও এটি বিজ্ঞানের অন্য যে-কোনো কিছুর চেয়ে আরো বেশি 'আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বের সাথে এটি বলছেন না' প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। আর এমন কিছু মনে করারও কোনো কারণ নেই যে, মাল্টিভার্সের বহু বিলিয়ন মহাবিশ্বগুলোর প্রত্যেকটিতেই একই ধরনের সূত্র আর মৌলিক ধ্রুবকগুলো থাকবে। মহাকর্ষীয় ধ্রুবক 'G' এর মানে সূক্ষ্ম পরিবর্তন এসব মহাবিশ্বগুলোয় বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। হতে পারে শুধুমাত্র অল্প কিছু সংখ্যক মহাবিশ্বে 'G' এর মান সেই 'সুইট স্পট' বা আদর্শ অবস্থানে আছে। শুধুমাত্র অল্প কিছু মহাবিশ্বই 'গোল্ডিলকস মহাবিশ্ব'। যে মহাবিশ্বে সূত্র আর ধ্রুবকগুলো জীবনের বিবর্তন হবার জন্য ঘটনাক্রমে প্রায় 'সঠিক' একটি পর্যায়ে অবস্থান করছে। এবং অবশ্যই (এখানে আবারো অ্যানথ্রোপিক

মূলনীতি), আমাদের সেই সংখ্যালঘিষ্ট কয়েকটি মহাবিশ্বের একটিতে অবশ্যই অবস্থান করতে হবে। আমাদের নিজেদের অস্তিত্বটি নির্ধারণ করেছে যেমন, আমাদের মহাবিশ্বকে অবশ্যই একটি গোল্ডিলকস মহাবিশ্ব হতে হবে। সম্ভবত বহু বিলিয়ন বৈরী সমান্তরাল মহাবিশ্বের মধ্য একটি জীবনবান্ধব গোল্ডিলক মহাবিশ্ব।

আপনি নিশ্চই গুরুত্বের সাথে কথাটি বলছেন না?

'কিন্তু এটি সত্য' বলে এই প্রশ্নটির উত্তর দেবার সময় এখনো আসেনি। এই সমস্যাটি নিয়ে কাজ করার জন্যে পদার্থ বিজ্ঞানীদের আরো অনেকে সময় প্রয়োজন। আমরা যা বলতে পারি সেটি হচ্ছে, গবেষণাগুলো বেশ প্রতিশ্রুতিশীল। এছাড়াও এটি আমার শেষ অধ্যায়টিরও মূল বক্তব্য - সেই সব ভীতিকর শূন্যতা অভিমূখে সাহসী পদক্ষেপ, যা কিছু একসময় অসম্ভাব্য মনে হয়েছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রায়শই সেগুলো সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আমি মনে করি, আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠে, সব ঈশ্বর/দেব-দেবীদের উপর থেকে আমাদের বিশ্বাস প্রত্যাহার করে নেবার সেই সাহসী পদক্ষেপটি নেয়া উচিত। আপনিও কী সেটি মনে করেন না?

ছবির অ্যালবাম

(১) কীভাবে ধর্মগুলোর সূচনা হয়? কিছু খুবই সাম্প্রতিক, আমরা আসলেই সেগুলো সৃষ্টি হতে দেখতে পারি। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে তাননা দ্বীপে প্রিন্স ফিলিপকে (রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী) একজন দেবতা হিসাবে উপাসনা করা হয়। প্রিন্স ফিলিপ ৫০ বছর আগে তিনি এই দ্বীপে একটি সংক্ষিপ্ত সফরে এসেছিলেন। তখন থেকেই দ্বীপের অধিবাসীরা তাকে একজন দেবতা হিসাবে উপাসনা করছেন। এর আরেকটি সমবয়সী ধর্ম হচ্ছে বেশ কিছু প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের কার্গো কাল্ট। যদি নতুন ধর্মগুলো আমাদের

নিজস্ব সময়ের মধ্যেই এত দ্রুত এবং আকস্মিকভাবে জন্ম নিতে পারে, তাহলে পৃথিবীর প্রধানতম ধর্মগুলোর সূচনা হবার পর থেকে বিকৃত কিংবদন্তীগুলোর বহু শতাব্দী জুড়ে মহীরূহ হয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ আর সম্ভাবনাগুলো শুধু একবার কল্পনা করে দেখুন (অধ্যায় তিন দেখুন)

(২) এই প্রাণী দুটির শরীর সর্বত্র যেন ‘দ্রুত’ লেখা আছে। ঈশ্বর কী গ্যাজেলদের ধরতে চিতাদের ডিজাইন করেছিলেন সেই একই সময়ে যখন তিনি পালানোর জন্য গ্যাজেলদেরও ডিজাইন করেছিলেন? (অধ্যায় সাত দেখুন)

(৩) ক্যামেলিয়নের জিহবা হচ্ছে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক হার্পুন। নলাকৃতির জিহবার মধ্যে হাইওয়েড অস্থিটি লক্ষ করুন, যা এই হার্পুনটিকে এর বিস্ফোরক গতি প্রদান করতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। চমৎকার 'ডিজাইন' – আসলেই কী এটি একটি 'ডিজাইন'? (অধ্যায় ৭ দেখুন)

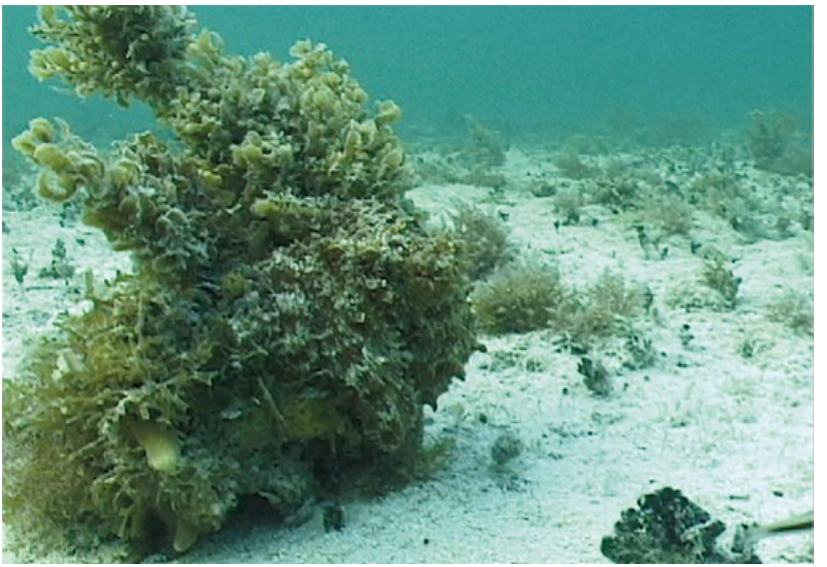

(৪) আপনি কী ছবিতে অক্টোপাসটি দেখতে পাচ্ছেন? ফটোগ্রাফার নিজেও পারেননি।

(৫) তারপর হঠাৎ করেই এটি আবির্ভূত হয়েছি – ভৌতিক শ্বেত বর্ণ নিয়ে।

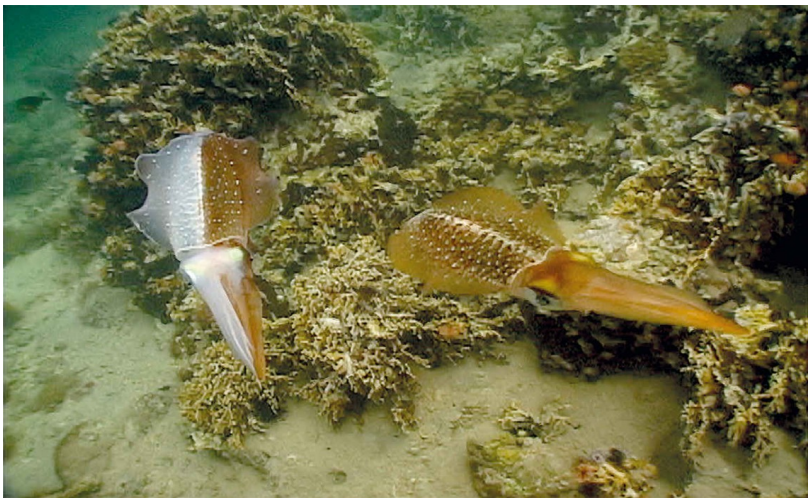

(৬) কীভাবে একটি পুরুষ স্কুইড সাদা বর্ণ ধারণ করে প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিতে এবং একই সাথে বাদামী থাকে একটি স্ত্রী স্কুইডকে আশ্বস্ত করতে – সহজ, দুই বর্ণ ধারণ করে।

(৭) ফ্লাউন্ডার মাছ, ঈশ্বর কী এদের সৃষ্টি করেছেন? বরং সম্ভাবনা বেশি যে এদের ডিজাইন করেছিলেন পিকাসো। বাস্তবিকভাবে, এই মাছগুলোর মাথার এই অদ্ভুত বিকৃতির জন্য তাদের বিবর্তনীয় ইতিহাসই দায়ী। কোনো বুদ্ধিমান ডিজাইনারই ফ্ল্যাট ফিশ তৈরি করতে গিয়ে এমন ধরনের কোনো ডিজাইন করবেন না (অধ্যায় সাত দেখুন)।

(৮) প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্ট কুটবেশ বা ক্যামোফ্লেজ, শেষ খুঁটিনাটি বিষয়টি প্রায় নিখুঁত একটি রূপ গড়ে উঠেছে শিকারী প্রাণীদের তীক্ষ্ম দৃষ্টির দ্বারা। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন এমন কিছু সৃষ্টিতে মানুষ ঈশ্বরের হাত দেখতে প্রলুব্ধ বোধ করে। (অধ্যায় সাত দেখুন)

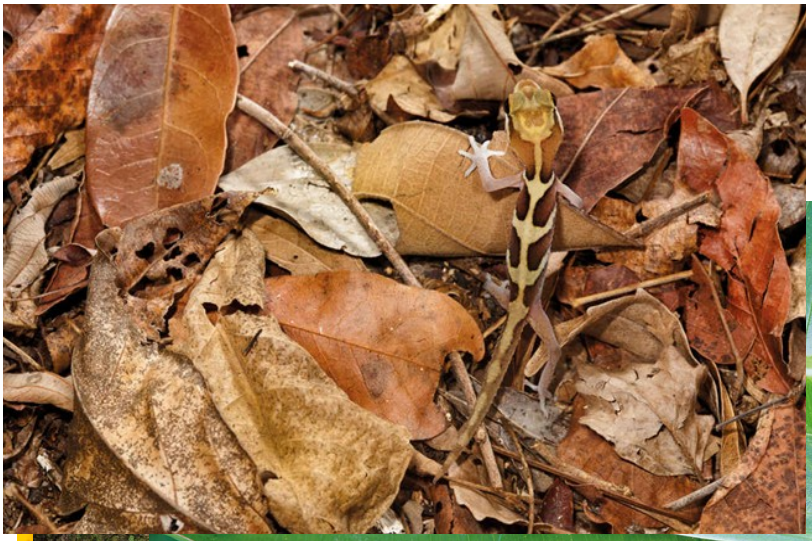

(৯) দেখুন, প্রাকৃতিক নির্বাচন কী করতে পারে। ব্রাসিকা ওলেরাসিয়ার মত একটি বন্য উদ্ভিদকে ব্রাসেল স্প্রাউট, ফুলকপি,বাধাকপি এবং রোমানেস্কো (ব্রকলি, কুঞ্চিত কেল, কোলরাবি ইত্যাদি বাদই দিলাম) ইত্যাদি না রূপে রূপান্তরিত করতে যদি 'কৃত্রিম' বা মানব কৃষক দ্বারা নির্বাচনের ৩০ শতাব্দী সময় লাগে, তাহলে কল্পনা করুন, আমাদের পূর্বসূরিরা যখন মাছ ছিল, সেই সময় থেকে অতিক্রান্ত হওয়া তিন মিলিয়ন শতাব্দীতে 'প্রাকৃতিক' নির্বাচন কী করতে পারে। (অধ্যায় আট দেখুন)

(১০) দুই ধরনের স্থাপত্য। লা সাগরাডা ফামিলিয়া চার্চটির শেষ খুঁটিনাটি বিষয় অবধি পরিকল্পনা করেছিলেন একজন মহান স্থপতি। অস্ট্রেলিয়ায় ফিওনা স্টুয়ার্টের তোলা এই ছবির টারমাইট ক্যাসলটি (উই পোকা ঢিবি) কোনো 'ডিজাইন' থেকে নির্মাণ করা হয়নি। টারমাইটরা, তাদের ডিএনএ কিংবা ঈশ্বর – কেউই এটি 'ডিজাইন' করেনি। (অধ্যায় দশ দেখুন)

(১১) স্টারলিং পাখির ঝাকের পারস্পরিক ত্রুটিহীন সমন্বয় দেখে তাদের যে কোনো মাস্টার নৃত্যপরিচালক নিয়ন্ত্রণ করছেন না এমন কিছু বিশ্বাস করা খুব কঠিন। পাখির পুরো ঝাকটিকে দেখলে মনে হয় যে একক প্রাণী, একটি দানবীয় ভাসমান অ্যামিবা। কিন্তু এখানো কোনো নির্দেশক নেই।

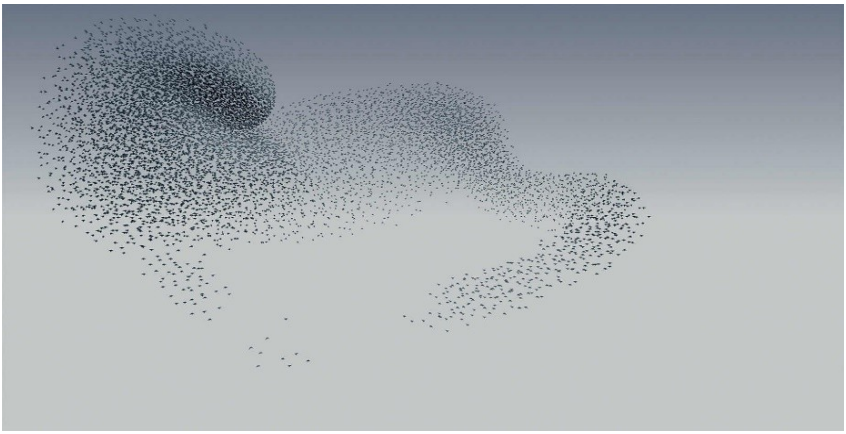

(১২) আর এটি কীভাবে হয় সেটি ব্যাখ্যা করা একটি কম্পিউটার সিম্যুলেশন।(অধ্যায় দশ দেখুন)

(১৩) একটি ছবির ধাঁধা। ছবিটির উপরে অর্ধেক সত্যিকারের ছায়াপথের সত্যিকার একটি আলোকচিত্র। আর নীচের অর্ধেক একটি কম্পিউটার সিম্যুলেশনের মাধ্যমে সৃষ্ট, ইলাসট্রিস, যা বিগ ব্যাঙ্গের প্রায় পরক্ষণ থেকে (মাত্র ৩০০,০০০ বছর পর থেকে) মহাবিশ্ব কীভাবে গড়ে উঠেছে তার সিম্যুলেশন করেছে, আপনি কি পার্থক্য করতে পারছেন? (অধ্যায় বারো দেখুন) ।

সুপ্রজ্ঞা
অনুবাদ উদ্যোগ